উপোসি বাংলা

সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর

উপোসি বাংলা

সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর

সংকলন ও সম্পাদনা
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়



সেরিবান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০০

প্রচ্ছদ : সৌম্যদীপ

ভিতরের ছবি : প্রথম তিনটি চিত্তপ্রসাদ, শেষেরটি জয়নুল আবেদিন-এর।

অলংকরণ : রাজু রায়

গৌতম মিত্র কর্তৃক সেরিবান, বাখরাহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ৭৪৩৩৭৭ থেকে প্রকাশিত।

চলভাষ : ৯৪৩৩৭ ৮৪৫৩১

বর্ণসংস্থাপন : ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রণ : ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা: লি:, কলকাতা ৭০০১৩২

প্রস্তাবনা ১

পঞ্চাশের মন্বন্তর।

কী দিনই না গেছে! উপোসি মানুষের চিৎকার
—ফ্যান দাও, ফ্যান দাও।

রাস্তায় চোখকান বুঁজে মড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে
হাঁটা। ভাবলে আজও বুকের মধ্যে হাঁফ ধরে।

তবু ভুলে গেলে চলবে না।

যেন মনে থাকে। সে ইতিহাসের যেন
পুনরাবৃত্তি না হয়।

নিছক স্মৃতিচারণ নয়। এ-বই যেন ভবিষ্যতেরও
চেতাবনি।

একদা 'কালান্তর'-এর
বার্তা-সম্পাদক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
শুধু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক নন,
সংবাদপত্র বিষয়ক গবেষণাকর্মে নিরলস ব্রতী।

তাঁর লেখা কিছু বই একদিকে যেমন সাংবাদিকতার শিক্ষানবিশিদের
কাছে দিগ্‌দর্শনের
কাজে লাগে, তেমনি ভুলে-যাওয়া অতীতকেও নখদর্পণে
আনে।

আমার মতে, শুধু বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই নয়,
যেকোনো জিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষেই কাশীনাথের
এ বই হাতের কাছে রাখা দরকার।

প্রস্তাবনা ২

শ্রদ্ধেয় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের অগ্রজপ্রতিম বন্ধু। অনাড়ম্বর ও আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপনের জন্য তাঁর সান্নিধ্যে আসা সকল মানুষকেই তিনি আমৃত্যু বেঁধে রেখেছিলেন এক ব্যতিক্রমী আকর্ষণে।

নানা সূত্র থেকে যতদূর জানা যায়, কৈশোরে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিমপর্বের প্রবল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাঁকে নির্যাতন ও কারাবরণ করতে হয়। সদ্যস্বাধীন ভারতবর্ষে ১৯৪৮ সালে যুক্ত হন রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া বা আর সি পি আই-এর সঙ্গে। ওই সময়েও তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং দু বছর বিনাবিচারে প্রথমে দমদম জেল ও পরে বক্সা বন্দী শিবিরে রাখা হয়। ১৯৫৬ সালে যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বা সি পি আই-তে এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বীরভূম জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক দুর্গা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বীরভূমের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে বেহালার এক কারখানায় শ্রমিকের কর্মজীবন গ্রহণ করে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজেও প্রয়াসী হন। ১৯৬৭ সালে যুক্ত হন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *কালান্তর*-এ। ১৯৭১ সালে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টের আই ও জে থেকে সাংবাদিকতার পাঠ নেন ও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে এসে *কালান্তর*-এর বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্যস্ত কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকেই রচনা বা সংকলন করেন *লেনিন ও সাংবাদিকতা*; *সাংবাদিক হতে গেলে*; *মোসলেম পত্রপত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি* ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ—যেগুলি পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। *এবং এই সময়* পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'উপোসি বাংলা : সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর ' নামক সংকলনটিও পাঠক ও গবেষক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমান গ্রন্থ সেই সংকলনেরই পরিমার্জিত রূপ। দুর্ভাগ্য, এ গ্রন্থ প্রকাশের অনেক আগেই ২০০৫ সালের ৫ অগস্ট ৭৬ বছর বয়সে কাশীনাথদার জীবনাবসান ঘটে। তখনও পর্যন্ত এ গ্রন্থের কোনো প্রকাশক নির্দিষ্ট হয়নি। কোনো একদিন প্রকাশ পাবে এমন ভরসায় অনির্দিষ্ট এক প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি সেই সংকলন গ্রন্থের একটি প্রসঙ্গ কথাও লিখে রেখে যান; এমনকী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে একটি ছোট্ট প্রস্তাবনাও। মৃত্যুর কয়েকমাস পর কাশীনাথদার নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে আমি অনুরুদ্ধ হই এ গ্রন্থের এক উপযুক্ত প্রকাশক খুঁজে দেওয়ার জন্য। বন্ধু প্রকাশন-সংস্থা সেরিবান-এর ওপর আমার আস্থা ছিল—যে আস্থাকে তাঁরা মর্যাদা দিয়েছেন। এর জন্য কোনো কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানানোর সম্পর্ক আমাদের নয়, কিন্তু বলা দরকার, পাল্টা এক অনুরোধ করে তাঁরা আমাকে বিড়ম্বিত করেছেন। গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশের জন্য আনুষঙ্গিক সম্পাদনা অর্থাৎ প্রকাশিত সংকলনের স্পষ্ট বোধগম্য অসঙ্গতিগুলিকে দূর করা, সাময়িকপত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, স্ব স্ব বানান ও বাক্যগঠন রীতি, বর্তমান প্রস্তাবনা,

নির্দেশিকা ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট করার দায়িত্ব তাঁরা আমার ওপর ছেড়ে কেন—যে কাজে নিজের যোগ্যতা ও অবকাশ সম্পর্কে আমি খুব নিঃসংশয়ী ছিলাম না। তবু বন্ধুকৃত্য না করার অপরাধের চেয়ে সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার অপরাধ লঘুতর—এই বিবেচনায় সে দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। যেহেতু গ্রহণ করেছি, তাই এ গ্রন্থে যদি কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকে তার দায় আমার ওপরও বর্তায় এবং সে জন্য আমি পাঠকের কাছে অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী।

যেহেতু জেরক্স, মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা কাশীনাথদা তখন পাননি তাই মূল সাময়িকপত্রগুলি থেকে লিখে লিখে তিনি তৈরি করেছিলেন তাঁর পাণ্ডুলিপি। সে পাণ্ডুলিপিও আমাদের হাতে আসেনি। পরিবর্তে *এবং এই সময়* পত্রিকার চারটি সংখ্যা (বর্ষা সংখ্যা ১৪১১; শীত সংখ্যা ১৪১৩; বর্ষা সংখ্যা ১৪১২; শীত সংখ্যা ১৪১২) থেকেই আমাদের কাজ করতে হয়েছে। অভিজ্ঞেরা জানেন, মূল পাঠ থেকে হাতে লিখে কপি করা, সেই কপি থেকে মুদ্রণ, সেই মুদ্রণের পুনর্মুদ্রণ ইত্যাদি ধাপ পেরোতে পেরোতে মূল পাঠের অনেকখানি স্বাভাবিক বিচ্যুতি ঘটে যায়। ঝোঁক পড়ে অধুনা অপ্রচলিত বানানগুলিকে সংস্কার করে আধুনিক বানানে রূপান্তরিত করে নেবার, বা অসম্পূর্ণ বাক্য যদি কিছু থেকে থাকে সেগুলিকে নিজেদের মতো করে সম্পূর্ণ করে দেবার। কিন্তু সাময়িকপত্রের কোনো বিষয়ভিত্তিক (এক্ষেত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর) সংকলনে বিষয় যদিও মূল উপজীব্য তবু অনুষঙ্গে তার উপস্থাপন রীতি, প্রকাশনার পেশাদারিত্ব-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়েও কেউ কেউ সমান আগ্রহী হতে পারেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি তথ্যের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ও মূল্যবান প্রকাশনা *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১৯০০-১৯১৪)*-র ৩৫৪ সংলেখে *ভারতবর্ষ*-র পরিচিতিতে ওই সাময়িকপত্রের লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পাদকীয় ঘোষণা থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে—"আমরা আশা করি যে এই রাজপুরুষগণ যাঁহারা **বাংলো** ভাষা পড়েন না, তাঁহাদিগকে এই **বাঙ্গলাভাষা** সাহিত্য পড়াইব এবং প্রাচ্য ভাব সম্পদে প্রতীচ্যকে সম্পদশালী করিব।" (মোটা হরফ আমাদের)। লক্ষ্যণীয় একই বাক্যে একই শব্দের ভিন্ন বানান ব্যবহার। সংশ্লিষ্ট গবেষকরা বানানের এই ভিন্নতার কারণ ও তার বিবর্তন প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, আমাদের কাজ শুধু এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথাযথ রক্ষা করে যাওয়া। বর্তমান সংকলনেও এই বৈশিষ্ট্য আমরা বহুবার লক্ষ্য করব। কাশীনাথদার মতো দক্ষ ও অভিজ্ঞ সংকলক-সম্পাদকের হাতে সে বৈশিষ্ট্য অনেকটাই রক্ষা পেয়েছে তবু এ গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তুতিকালে তাঁর অভাব আমরা গভীরভাবে অনুভব করেছি। তাঁর কাজের পরীক্ষক হিসেবে নয়, একজন সাধারণ জিজ্ঞাসু পাঠক হিসেবেই প্রয়োজন হয়েছিল কয়েকটি সাময়িকপত্রের কিছু সংখ্যাকে মিলিয়ে দেখে নেবার, যে কারণে *উদ্বোধন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, শনিবারের চিঠি, দেশ* ইত্যাদি পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই সংখ্যাগুলি দেখার সুযোগ করে দিয়ে আমার পূর্বতন কর্মক্ষেত্র সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা ; রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ; এবং আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে ঐতিহাসিক ড. রুদ্রাংশু মুখার্জী এবং গ্রন্থাগারিক শ্রী শক্তিপদ রায়-এর সহযোগিতার জন্যও আমি ঋণী। কয়েকটি পত্রিকা, বিশেষ করে *অরণি* এবং *জনযুদ্ধ* দেখার প্রয়োজন অনুভব করলেও তা আমরা পারিনি। সেক্ষেত্রে *এবং এই সময়* পত্রিকায় মুদ্রিত রূপকেই যথাসম্ভব অনুসরণ করেছি। চেষ্টা করেছি সংকলনটিকে টীকা কণ্টকিত না করার, শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনী [] এবং পাদটীকায় সংক্ষিপ্ত

তথ্যটুকুকে তুলে ধরা হয়েছে। আবারও বলছি, সুসম্পূর্ণভাবে কোনো গ্রন্থ সম্পাদনার যোগ্যতা আমার আয়ত্তাতীত ; কোনো গবেষকও আমি নই। শুধুমাত্র দীর্ঘ বৃত্তিজীবনে গ্রন্থাগারিকতা ও গবেষণায় তথ্য-সহায়তা দানের সূত্রে গ্রন্থ-সম্পাদনার যে দিকগুলির সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগের অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটুকুকেই সম্বল করে চেষ্টা করেছি কাশীনাথদার অভাবটুকুকে কিঞ্চিত পূরণ করার।

দুই

সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষ নিয়ে এবং বিশেষভাবে বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক লেখালেখিই প্রকাশিত হয়েছে। অমর্ত্য সেন থেকে পল গ্রীনো (Paul Greenough)—দেশিবিদেশি অনেক গবেষকেরই প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জি থেকে তার হদিশ আমরা পাই। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের সমকালে প্রকাশিত বই বা পুস্তিকাগুলির কথা—যেমন, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ-কৃত দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত সমীক্ষা রিপোর্ট, *স্টেটসম্যান* পত্রিকার সচিত্র পুস্তিকা *Mal-administration in Bengal*, বিমলচন্দ্র সিংহ ও হরিচরণ ঘোষ প্রণীত *বাংলায় খাদ্যসমস্যা*, গোপালচন্দ্র নিয়োগী-র *বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ ১৩৫০* বা কালীচরণ ঘোষ-এর *Famines in Bengal 1770-1943* ইত্যাদি। এগুলির প্রসঙ্গ আমরা সংকলিত তৎকালীন সাময়িকপত্রগুলিতে পাব।

১৯৮০ সালে কালীচরণ ঘোষ-এর গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাককথনে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চ ও স্পষ্ট এবং বিচার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ("His voice has been loud and clear and his judgement far reaching.")। এই বৈশিষ্ট্যকে সঙ্গত আখ্যা দিয়ে তাঁর অভিমত ছিল, এ-বই নিছকই কোনো ইতিহাস-বিবরণ নয় বরং ইতিহাসেরই অঙ্গ। এটি পড়তে হবে শুধু কী বলা হয়েছে তা জানার জন্যেই নয়, উপরন্তু এটি কী তা জানার জন্যেও ("...this book is not merely an account of history; it is a part of it. ...As a part of the history of that period, it has to be read both for what it says and for what it is.")। বর্তমান সংকলন সম্পর্কেও, মনে হয়, এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

মনে রাখা দরকার, দুর্ভিক্ষের সমকালে দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রকাশে কঠোর বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছিল। কেননা—" 'দুর্ভিক্ষ' এই কথাটা এ দেশের শাসকবর্গের পক্ষে চিরদিনই শ্রুতিকটু। তাঁহারা কোন অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিতে চাহেন না। তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা এই যে, দেশের লোকের ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা এত বেশি এবং ঘাস পাতা প্রভৃতির দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার দক্ষতা এমনই স্বাভাবিক যে, এদেশের শব্দকোষে 'দুর্ভিক্ষ' কথাটির প্রয়োগ একরূপ অবান্তর।" (*দেশ*, ১৮ আষাঢ় ১৩৫০)। এইরকম এক পরিস্থিতিতে দুর্ভিক্ষ নিয়ে এই সমস্ত বলিষ্ঠ ও মর্মস্পর্শী সংবাদ বা নিবন্ধ প্রকাশ অন্য এক ব্যঞ্জনা তুলে ধরে। ইতিহাসের একটি সত্তার হাত ধরে নিয়ে আসে আরেক সত্তা—যে সত্তার সম্যক পরিচয় এখনও আমাদের জানা নেই।

দুঃখের বিষয় যে বাংলা সংবাদ-বা সাময়িকপত্রের তেমন কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি! লঙ সাহেবের Bengal Library Catalogue, কেদারনাথ মজুমদারের *বাংলা সাময়িক সাহিত্য*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'খণ্ডে *বাংলা সাময়িক-পত্র*, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত গীতা চট্টোপাধ্যাযের তিন খণ্ডে *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* বা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত মুনতাসীর মামুন-এর *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)* ইত্যাদি গ্রন্থগুলিই

এখনও পর্যন্ত এই অভাবকে পূরণ করে চলেছে। কিন্তু এর সবকটিই মূলত পঞ্জিধর্মী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে *সোমপ্রকাশ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ* ইত্যাদি পত্রিকার অবদান নিয়েও কয়েকটি গ্রন্থ বা বিক্ষিপ্ত লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তার সন্ধান আমরা পাইনি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* বা বিনয় ঘোষের *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*—বহুচর্চিত এই গ্রন্থগুলিও আসলে সংবাদ-বা সাময়িকপত্রের সংকলন, যে ধারায় পরবর্তীকালে *চতুরঙ্গ, শনিবারের চিঠি, জনযুদ্ধ, সমকালীন* ইত্যাদি আরও অনেক পত্রপত্রিকার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বা বিনয় ঘোষ-দের সংকলন ছিল বিষয়ভিত্তিক অর্থাৎ সেগুলিতে একটা নির্দিষ্ট কালের কথা বা সমাজচিত্রের অবয়ব ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে—শুধুই সংবাদ- বা সাময়িকপত্রের সংকলন নয়। সেই অর্থে কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বর্তমান সংকলনও সেগুলিরই অনুগামী—যেখানে মূল উপজীব্য বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর। সাময়িকপত্রগুলি এখানে তাদের একটা নির্দিষ্ট রূপ বা সংকলকের এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় হাজির।

সংবাদ বা লেখা নির্বাচনে কাশীনাথদা কোন নীতি অনুসরণ করেছেন—অর্থাৎ যেগুলি নির্বাচন করেছেন, কেন করেছেন এবং যেগুলি করেননি, কেন করেননি—সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। তবে পুরনো পত্রিকাগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনে হয়েছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, যে লেখা বা সংবাদে দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষ বা প্রধান বিষয় সেগুলি তিনি নিয়েছেন, যেখানে অপ্রত্যক্ষ বা অপ্রধান সেগুলি নেননি। এমনকী কবে কোথায় কত লোক দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছেন বা হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছেন—এই খুঁটিনাটি সংবাদও তাঁর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা এত বছর পরে আজকের দিনে আপাতদৃষ্টিতে বাহুল্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই আনুপুঙ্খিকতা সংকলনের অন্য এক মূল্য আনে। স্থানিক ইতিহাস চর্চার উপাদান হিসেবে এই সংক্ষিপ্ত সংবাদগুলিই অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য হিসেবে কাজ করে।

আমার মতে, এই সংকলনের সবচেয়ে বড় এবং দুর্লভ বৈশিষ্ট্য হল এর ব্যাপ্তি। একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত *উদ্বোধন* দিয়ে শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *জনযুদ্ধ*-তে এসে শেষ। মধ্যে *দীপালী*-র মতো চলচ্চিত্র ও বিনোদনমূলক পত্রিকা এবং তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য *মৌচাক বা শিশুসাথী*-র মতো শিশু-কিশোর পত্রিকা। দুর্ভিক্ষের প্রবল অভিঘাত যে প্রত্যক্ষ ভাবে শিকার হয়নি এমন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিনোদন জগত বা শিশু-কিশোর মনেও দাগ কেটেছিল, এই সংকলন তা তুলে ধরে। তুলে ধরে পত্রিকাগুলির স্বকীয় অবস্থানকে, আবার অবস্থান হারানোর দৃষ্টান্তকেও। *উদ্বোধন* লেখে—বরিশালে "ব্রাহ্মণ বিধবাও অপরের উচ্ছিষ্ট চাহিয়া আহার করিতেছে।" আবার, "এইরূপ নিদারুণ দৈন্যদুঃখ-পীড়িত অজ্ঞ নরনারীগণকেও ঠকাইয়া দুনিয়াদারীতে বিশেষজ্ঞ নানা শ্রেণীর লোক তাহাদের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে দ্বিধা করে না।" (কার্তিক ১৩৫০)। *জনযুদ্ধ* তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মূল্যায়ন ও কর্মনীতির প্রণোদনায় আবেদন করে—"নাজিমুদ্দীন, শ্যামাপ্রসাদ ও কংগ্রেস নেতাদের বাংলার বুভুক্ষ নরনারী জিজ্ঞাসা করে বাংলার এত বড় দুর্যোগেও আপনারা মিলিবেন না?" (২০ পৌষ ১৩৫০)। *অরণি* প্রত্যাশা করে—"লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুরকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে গান্ধিজী ও কংগ্রেসকে ডাকিয়া আনিতে হইবে। জওহরলাল কম্বু কণ্ঠে আহ্বান করিলে মুনাফালোভী মহলে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইবে, সশস্ত্র সিভিলিয়ানতন্ত্রের অস্ত্রঝঙ্কারেও তাহা হইবার নহে।" (২৭ শ্রাবণ ১৩৫০)। এমন দৃষ্টান্ত অজস্র।

বিশেষায়ণের পাশাপাশি আন্তঃবিষয় চর্চাও আজকের দিনের গবেষণার একটা বড় বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, সাহিত্যের মধ্যে মিশে থাকা ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে মিশে থাকা সমাজ-ইতিহাস, সমাজ-ইতিহাসের মধ্যে অর্থনীতি, অর্থনীতির মধ্যে রাজনীতি ইত্যাদি। যে কারণে আজকের দিনের গবেষকদের তথ্য অনুসন্ধানকে আরও ব্যাপক হতে হচ্ছে, শুধু নিজস্ব বিষয়কেন্দ্রিক থাকছে না। সে বিচারেও এই সংকলনের মূল্য অপরিসীম। একটা ভয়ঙ্কর সময় প্রথানিষ্ঠ সামাজিক সংস্কৃতিগুলোকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে—পতিতাবৃত্তি ও যৌন ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে, উন্মুক্ত হাটে ছেলেমেয়ে বেচাকেনা চলছে, ক্ষুধার তাড়নায় স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, আবার একই সঙ্গে একই সমাজের বুকে ঘটে চলেছে বৈভবের কুৎসিত আত্মজাহির ; উৎসব-অনুষ্ঠানে ভূরিভোজ, দোকানে থরে থরে সাজানো দুর্মূল্য খাদ্যদ্রব্য। এ সবই হয়তো আমাদের জানা বা বহুআলোচিত, কিন্তু এ সংকলনে ধরা রইল তার অনুপুঙ্খ তথা সবিস্তার বিবরণ। স্বাভাবিকভাবেই দুর্ভিক্ষের রাজনীতি-অর্থনীতি ও প্রশাসনিকতা এ সংকলনের মূল উপজীব্য, তবু তৎকালীন সমাজচিত্রের প্রাণবন্ত উপস্থিতিটাও এক বিরাট প্রাপ্তি।

পল গ্রীনো তাঁর মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-1944* (OUP, 1982) -এর মুখবন্ধে বর্ণনা দিয়েছিলেন ১৯৭৯ সালে বাংলায় এসে পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রত্যক্ষ করেছেন এমন মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় তাঁর একান্ত উপলব্ধির কথা। তিনি লিখেছিলেন—"আমরা দেখেছিলাম বহু বৃদ্ধ বাঙালি বিশদভাবে স্মরণ করতে পারলেন, ১৯৪৩ সালে কী অবস্থার মধ্যে তাঁরা পড়েছিলেন, তাঁরা কী খেতেন এবং কোথায় গিয়েছিলেন। কখনো কখনো আমাদের মনে হত, তাঁরা যেন বহু বছর ধরে আমাদের অপেক্ষায় বসে ছিলেন।" (বাংলা অনুবাদ : *আধুনিক বাংলা সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য: দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-৪৪*, কলকাতা ১৯৯৭)।

হয়তো কিছুটা রুচিবিরুদ্ধ আত্মপ্রকাশ হয়ে যাবে, তবু জানানোর লোভ হয় যে শুধু কৈশোরের সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ও অতিক্রম করে আসা একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে নয়, একজন সাধারণ পাঠক হিসেবেও এমন এক সংকলনের জন্যেও আমি যেন বহু বছর ধরে অপেক্ষায় বসে ছিলাম। কাশীনাথদার কাছে সে জন্য আমার ঋণ রইল।

পরিশেষে একটি অক্ষমতার কথা স্বীকার করা দরকার। ইচ্ছা ছিল সাময়িকপত্র পরিচিতিতে দুর্ভিক্ষের সমকালে পত্রিকাগুলির সম্পাদক কারা ছিলেন তা উল্লেখের। কিন্তু যেহেতু সব সাময়িকপত্র দেখা সম্ভব হয়নি তাই অসম্পূর্ণ উল্লেখ থেকে বিরত থেকেছি।

অগস্ট ২০০৭ — অরুণ ঘোষ

সংকলকের প্রতিবেদন

এই প্রজন্মের বেশ কিছু লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে—যেমন আমার মেয়ে আকুলিনা ও জামাই পার্থদেবের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, তারা পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। দু-চারজন উপন্যাস, কবিতা, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে এই মন্বন্তরের কথা জেনেছে। কিন্তু তা যে কী ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ ছিল তা তারা কল্পনাও করতে পারে না, হয়তো পারা সম্ভবও নয় । এদেরই তাগিদে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজে নেমে পড়ি। এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাকে প্রেরণা দেন।

আমি ১৩৫০-এর মন্বন্তর দেখেছি। দেখেছি শুধু নয়, তার যন্ত্রণা বারো-তেরো বছর বয়সেই ভোগ করেছি। দুবেলা পেটে ভাত দেবার জন্য ছোট বোন ও ভাগ্নী এবং পাড়ার কয়েকজন সমবয়সীদের নিয়ে বেহালা থেকে রাত থাকতে বেরিয়ে চেতলা, মোমিনপুর, খিদিরপুর কন্ট্রোলে লাইন দিয়েছি। কোনোদিন চাল পেয়েছি, আবার কোনোদিন শূন্য হাতে ফিরেছি। ডায়মন্ডহারবার রোড, মাঝেরহাট, খিদিরপুর ও দুর্গাপুর ব্রিজের ওপর কতদিন মরা মানুষের মুখ দেখেছি শুধু নয়, তা ডিঙিয়ে যেতে হয়েছে। সূর্য ওঠার আগেই দরজায় দরজায় 'একটু ফ্যান দেবে গো' বলে যে চিৎকার শুনেছি তা আজও কানে বাজে। পরে বুঝেছি সেটা চিৎকার অথবা কান্না ছিল না, ছিল বাঁচার জন্য দুয়ারে দুয়ারে আর্তনাদ—উপোসী মানুষের মরণকালীন শেষ আবেদন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু। ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত— পরাধীন দেশ। ১৯৪২ সালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আগস্ট আন্দোলন। বাংলার মেদিনীপুরে স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার। অধিকাংশ নেতা ও কর্মী জেলে।

এদিকে যুদ্ধের প্রসার, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপান তরতর করে এগুচ্ছে। সিঙ্গাপুরও তাদের দখলে। অবিভক্ত বাংলায় তখনই ঘনিয়ে এল কালো ঘন মেঘ। ব্রিটিশ সেনাদের খাদ্য যোগানোর জন্য শুরু হল গ্রাম বাংলা উজাড় করে ধান-চাল সংগ্রহ। আর এর সুযোগ নিল বাংলার রাঘববোয়াল মজুতদার, চোরাকারবারি ও আড়তদাররা। ইস্পাহানীর মতো মজুতদারকে চাল সংগ্রহের এজেন্ট নিয়োগ করা হল। রাতারাতি বাজার থেকে ধান চাল উধাও হয়ে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে চালের দাম হু-হু করে বেড়ে চলল এবং তা গ্রামের মানুষের—বিশেষ করে ক্ষেতমজুর, ভাগচাষি, প্রান্তিক চাষি, কুটির শিল্পী ও জেলেদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। অবিভক্ত বাংলার গ্রামে গ্রামে শুরু হল হাহাকার। হাড় জিরজিরে, কঙ্কালসার নরনারীর মিছিলে কলকাতা ভরে গেল। কিন্তু শহরেই বা চাল কোথায়! যা আছে তাতো বিত্তবানদের জন্যে। শুরু হল ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে ভাগ করে উচ্ছিষ্ট খাওয়ার প্রতিযোগিতা। আর মায়ের কোলে মাথা রেখে সন্তান ও মা-র মৃত্যু অথবা মা-র বুকের দুধ পাবার জন্যে শিশু তার মাই-এর বোঁটা চুষে চলেছে, কিন্তু সে জানে না তার মা অনেকক্ষণ আগেই চিরকালের জন্য খিদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এই ধরনের কত মর্মান্তিক

দৃশ্য সেদিন চোখে দেখেছি। দেখেছি খাবারের দোকানে খাবার সাজানো আর দোকানের সামনেই অভুক্তর মরদেহ। আমার বন্ধু প্রয়াত নীরেন দাশগুপ্ত তাঁর অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে যা বলল তা শুনলে এখনও গা শিউরে উঠে। সে দেখেছে, বাগবাজারের রাস্তায় একটি শিশু বমি করতে করতে মারা যাওয়ার পর তার মা সেই বমি থেকে ডাল বা ছোলাজাতীয় খাবার তুলে নিয়ে নিজে খাচ্ছে। সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শীরা আজও যাঁরা আমার মতো বেঁচে আছেন তাঁদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা প্রায় এক।

২০০১-এর নভেম্বরে জলপাইগুড়িতে জেলার জনপ্রিয় পত্রিকা *জনমত*-এর সম্পাদক মুকুলেশ সান্ন্যাল পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রসঙ্গে বললেন, "রাত বাড়ছে, বুভুক্ষুদের মিছিলও বাড়ছে। মাঝে-মধ্যে দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ ও চিৎকার 'একটু ফ্যান দেবে গো, একটু ফ্যান দাও'। সেই কান্না আজও আমায় বিচলিত করে।"

অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক দেবীদাস বসু তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বললেন, "দরজায় দরজায় কঙ্কালসার মানুষেরা ফ্যান চাইছে, আর তা না পেলে ডাস্টবিন থেকে কুকুরের সঙ্গে একত্রে উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে। সে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

এই মন্বন্তরে অবিভক্ত বাংলার ৩৫ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মরে গেছে। অধ্যাপক প্রয়াত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত বেসরকারি কমিশনের হিসেবে এই মৃত্যু সংখ্যাটাই পাওয়া গেছে। যদিও ব্রিটিশ সরকারের গঠিত স্যার জন এ উডহেডের নেতৃত্বে ফেমিন এনকোয়ারি কমিশনের হিসেব অনুযায়ী মৃত্যু সংখ্যা ১৫ লক্ষ। কমিশনের অপর সদস্য ড. ভি আর অ্যাক্রয়েড তাঁর *Conquest of Famine বই*তে লিখেছেন, দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ১৫ লক্ষের বেশি ছিল। অপর এক সদস্য মণিলাল নানাবতীর পর্যবেক্ষণ কমিশনের নোটে স্থান পায়নি। কারণ তিনি বহু বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু নিছক দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু নয়—এ ছিল এক ধরনের গণহত্যা। তারই সাক্ষ্য মিলবে পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

অবিভক্ত বাংলার ৩৫ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মরে আর তার বিনিময়ে ইস্পাহানী শুধু চালের চোরাকারবার করে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মুনাফা করল। এছাড়া এইচ দত্ত, হনুমান বক্স, হোসেন করিম দাদা প্রমুখ ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে সেই সময় গ্রাম বাংলার মানুষকে না খেতে দিয়ে মেরেছে। ফেমিন এনকোয়ারি কমিশনের হিসেবেই কিছু ব্যবসায়ীর মৃত্যু পিছু লাভ হয়েছিল এক হাজার টাকা। পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারও মানুষের প্রাণের বিনিময়ে তার সেনাদের এবং সেনাবাহিনীর কাজে ব্যবহৃত পশুদের জন্য চাল সংগ্রহে দেশীয় লোভাতুর মজুতদারদেরই মদত দিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার নারী জাতির জীবনে নেমে এল চরমতম লজ্জার দিন। এক মুঠো ভাতের জন্য স্বামীপুত্রকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজে বাঁচার জন্য পতিতাবৃত্তির পথ গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেনি। যুদ্ধের আগে ১৯৩৮ সালে কলকাতায় পতিতালয়ে পতিতার সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। আর দুর্ভিক্ষের পরের বছরে ১৯৪৪-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে হল ৪৫ হাজার। নারী জাতির এই চরম লজ্জা, যা আজও ভাবলে শুধু নারীরা নয়, যে কোনো মানুষই শিউরে উঠবে।

ব্রিটেনের কমন্স সভায় বাংলার এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি নিয়ে সরকারকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দেশ-বিদেশের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ব্রিটিশ ও মুসলিম লিগ সরকারের সমালোচনা করেছিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় অনেকেই দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে সরেজমিনে সব প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রিটিশ সরকার তার যুদ্ধের প্রয়োজনে মুসলিম লিগ ও মজুতদারদের সহায়তায় বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। দুর্ভিক্ষের প্রকৃত তথ্যসমূহকে চাপা দেবার জন্য সরকার সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা

জারি করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। তবে ব্রিটিশ পত্রিকা *দ্য স্টেটসম্যান* ওই সময় বাংলার বুভুক্ষু মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সরকার বিরোধী যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা তখনকার এই পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটালেই তাদের অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যাবে না। এক্ষেত্রে *দ্য স্টেটসম্যান*-এর সম্পাদকীয় ছিল অসাধারণ। বাংলা পত্রপত্রিকা থেকে সংকলন বলেই কোনো ইংরেজি পত্রিকার আশ্রয় নিইনি।

যে যুক্তি বারবার উঠেছিল বা এখনও ওঠে, তা হল দেশে খাদ্যশস্যের অভাবজনিত কারণেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই যুক্তি ধোপে টেকে না, কারণ ১৩৫০ সালেও যে পরিমাণ চাল, গম বাংলায় ছিল তা যদি পরিকল্পিতভাবে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে তার দাম সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে যেত না, এত মানুষ মরত না।

নোবেলজয়ী ড. অমর্ত্য সেন-এর মতে ১৯৪৩ সালের (১৩৫০) দুর্ভিক্ষ খাদ্যাভাবের ফলে হয়নি। খাদ্য ছিল কিন্তু সে খাদ্যে বহু মানুষের স্বত্বাধিকার ছিল না (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩ জানুয়ারি ২০০১)। তাছাড়া তিনি এটাও বলেছেন, অনেক কারণের মধ্যে দারিদ্র্য একটা বড় কারণ, যার জন্য ওই সময় খাদ্যশস্য থাকা সত্ত্বেও তা কেনার মতো ক্রয়ক্ষমতা গ্রামীন শ্রমজীবী মানুষ এবং প্রান্তিকচাষি, ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরের ছিল না। পঞ্চাশের মন্বন্তরে এরাই নীরবে, নিঃশব্দে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।

বুভুক্ষু, অভুক্ত মানুষদের বাঁচানোর জন্যে নানা রাজনৈতিক দল এবং সমাজসেবামূলক সংগঠন ত্রাণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মজুতদারদের অথবা সরকারি মজুত ভাণ্ডার থেকে খাদ্যশস্য উদ্ধার করে তা বণ্টন করার কোনো কার্যকারী পরিকল্পনা ছিল না। অহিংসার এত বড় নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত নেই।

আমার লেখা *সাংবাদিক হতে গেলে* বইটির নামকরণ করে দিয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটি একটি করে নতুন সংস্করণ বেরুতে বেরুতে যখন তা চতুর্থ সংস্করণে পড়ল, তখন স্ত্রী গায়ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গুটিগুটি পায়ে সুভাষদার বাড়ি গেলাম। বাইরের ঘরে বসে যখন এদিক ওদিক তাকাচ্ছি তখনই হাফ প্যান্ট পরে, ফতুয়া গায়ে, মাথায় ঝাকড়া চুল নিয়ে সুভাষদা এসে বসলেন। প্রথমে চিনতে পারেননি। পরে চিনতে পেরেই এক গাল হেসে আমার হাত দুটো টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। গায়ত্রীকে বললেন, কেমন আছ। তারপর শুরু হল লিখে লিখে বলা, লেখা পড়ে কথা কওয়া। তিনি বলতে পারেন, কিন্তু শুনতে পান না। পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করলেন। আজই আমার বইটির চতুর্থ সংস্করণটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললুম, বইটির নাম আপনিই আমার ঘরে বসে লিখে দিয়েছিলেন। *মোসলেম পত্র-পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি* শীর্ষক সংকলনটির কথা শুনে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করাতে বইটি তাঁকে দেব বলে আসি। সপ্তাহখানেক পরে বইটি নিয়ে তাঁর বাড়ি গিয়ে বইটি তাঁকে দিই। বইটি উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, এটা মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় কাজ হয়েছে। আর কোনো কাজ করছি কিনা জানতে চাইলে আমি আমার *উপোসি বাংলা* নামের পরিকল্পিত সংকলনটির কথা বলি এবং তিনি যদি একটা মুখবন্ধ লিখে দেন তার জন্য অনুরোধ করে সংকলনটির বিষয়বস্তু সম্বলিত সূচিপত্রটি তাঁকে দিই। তিনি সপ্তাহখানেক পরে খবর নিতে বলেন, ওটা আমায় লিখে নিতে হবে বলে জানান। এক সপ্তাহ পরে তাঁকে ফোন করতে গীতাদি বলেন, চলে আসুন। সেই দিনই তাঁর বাড়িতে যাই গীতাদি বলেন সুভাষ খুব অসুস্থ। তিনি আপনার জন্যে এটা রেখেছেন। আমি বাইরে থেকে উঁকি মেরে সুভাষদাকে দেখে বাইরের ঘরে চেয়ারে বসে খামটা খুলে দেখি, তিনি নিজে হাতে মুখবন্ধ

লিখে রেখেছেন। ২০০৩-এর ২৬ মে তিনি এটা লিখেছেন। আর এবছরের ৮ জুলাই তিনি চলে গেলেন। পদাতিকের পথ চলা শেষ হল। মনে হল তাঁর শেষ গদ্য যেন তিনি আমায় দিয়ে গেলেন। দুঃখ রয়ে গেল, তিনি বইটি দেখে যেতে পারলেন না। তবে তিনি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

পরিকল্পিত সংকলনটির প্রকাশনা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন, কেননা অর্থের বিনিময় ছাড়া এখন আর সহজে কোনো বই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু আমাদের মতো অনামী অজানা বিত্তহীন লেখকদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোনো বড় মাপের কাজ করতে গেলে কয়েকবার ভাবতে হবে। তবে এক্ষেত্রে আমি ভাগ্যবান। পরিকল্পিত সংকলনটির বিষয়বস্তু শুনে *এবং এই সময়* পত্রিকার সম্পাদক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জনপ্রিয় পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপাতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে এলেন এবং ছাপাতেও শুরু করলেন। আমাকে তিনি যেভাবে প্রশ্রয় দিলেন তাতে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আমি তাঁর কাছে ঋণী।

লেখক, গবেষক, ভূতাত্ত্বিক সুনীল সেনশর্মা আজ আর নেই। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে সহাযোগিতা করে গেছেন। তাঁকে জানাই আমার শ্রদ্ধা।

আমার অগ্রজ সাহিত্যিক বন্ধু কার্তিক লাহিড়ি এবং কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, সব সময় আমায় সাহায্য করেছেন এবং এই সংকলনটির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই বন্ধুপ্রীতিতে আমি গর্বিত।

জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরি, বাগবাজার ফ্রি রিডিং লাইব্রেরি, রামমোহন লাইব্রেরি এবং মুজফফর আহমদ পাঠাগার থেকেই সংকলনটির উপাদান সংগ্রহ করেছি এবং প্রতিটি লাইব্রেরির কর্মীদের কাছ থেকে পেয়েছি অকুণ্ঠ সহযোগিতা। তাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ।

সর্বশেষে বইটির প্রকাশকের কাছে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

সূচি

লুকানো চাউল বাহির করিবার দায়িত্ব। রেলওয়ে বিভাগের অব্যবস্থা। বাংলার দুর্ভিক্ষে অপর প্রদেশের সাহায্য। বাংলার বাহিরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতি বন্ধ। সরকারী আশ্রয়-কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব। কেন্দ্রীয় বিলিফ ফণ্ড । দুর্ভিক্ষে কাঁথির অবস্থা। বর্তমান দুর্ভিক্ষে নারী রক্ষার প্রয়োজন। বরিশাল হিতৈষীর নিকট জামানত দাবি। বাংলা-সরকারের চাউল ক্রয়। বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ডাঃ দেশমুখের বিবৃতি। মিঃ সুরাবর্দ্দির বিবৃতি। ইস্পাহানী কোম্পানীকে সাড়ে চার কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে কি না। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন কোন সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ । দৈনিক ২৭ হাজাব মণ গম যায় কোথায়। বাংলা-সরকার ও মজুতদার। আহার্যের সরকারী পরিমাণ। সরকারী বিতরণ কেন্দ্রের খিচুড়ী। সেবাকার্য্যে বাধাদান। লর্ড ওয়াভেলের বাংলায় আগমন। দুর্ভিক্ষের প্রকৃত প্রতিকার। "রেলওয়ে বিভাগের অব্যবস্থা"। "লিনলিথগোর বিচার হউক"— সেমুব কক্স, সিলভারম্যান ও কোব। কমন্স সভার বিতর্কে চার্চ্চিলের অনুপস্থিতি । ভাইকাউণ্ট ওয়াভেলের বক্তৃতা। দুর্ভিক্ষের পর নারী সমস্যা। বাংলার গভর্ণরেব বক্তৃতা। দুর্ভিক্ষের পর বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ। দুর্ভিক্ষোত্তর সমস্যা ও বাংলা সরকার। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন। দুর্ভিক্ষে প্রজার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব। দুর্ভিক্ষে সাহায্য। দুর্ভিক্ষের জের।

ভারতবর্ষ ৮৯-১০৫

খাদ্য সমস্যা। খাদ্য সমস্যায় গভর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য। মজুত খাদ্য সন্ধানেব উদ্দেশ্যে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের আবেদন। কলিকাতার অবস্থা। শেষ কোথায়। বাহিরের সহানুভূতি । বাঙ্গালার দুঃখ জ্ঞাপন। কলিকাতায় মৃত্যুর হার বৃদ্ধি। বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষ-কথার প্রচার বন্ধ। দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান। অনাথ শিশুদের রক্ষা। আশ্রয় ব্যবস্থা। পণ্ডিত মালব্যের আবেদন। বোম্বাইয়ের সাহায্য। পাটনার সাহায্য। হুগলী জেলায় সাহায্য দান। পাঞ্জাব ধনীর সাহায্য। যুক্তপ্রদেশের সাহায্য। কুমার গোকুলচন্দ্র লাহা। পাইক পাড়া রাজবাটী। বিরলা শিক্ষা ট্রাষ্ট। দিল্লীতে কমিটী গঠিত। বাজারের অবস্থা। কলিকাতায় মৃত্যু। মফঃস্বলে চাউলেব অভাব। কলিকাতায় জনসভা। শ্রীমতী নাইডুর আবেদন। দুর্ভিক্ষে মৃত্যু সংখ্যা। বাঙ্গালায় মৃত্যুর হিসাব। সংবাদ সরবরাহ বন্ধের প্রতিবাদ। শ্রীমতী পণ্ডিতের বিবৃতি। নারায়ণগঞ্জের অবস্থা। পণ্ডিত কুঞ্জরুর অভিমত। রয়াল কমিশন নিয়োগ দাবি। ত্রিপুরা জেলায় মৃত্যু। মৈমনসিংহ জেলার অবস্থা। রয়াল কমিশন নিয়োগ দাবি। সরকারের কর্ত্তব্য কি। ভারতেব দুর্ভিক্ষে পার্ল বাক। প্রতি সপ্তাহে লক্ষ লোকের মৃত্যু। চট্টগ্রামে মৃত্যুর হিসাব। স্টেটসম্যানের দুর্ভিক্ষ পুস্তিকা।

মৌচাক ১০৭-১১০

কিশোর আহ্বান। এ মাসের প্রার্থনা। ত্যাগ করো। এ মাসের প্রার্থনা। তোমরাও পার। এ মাসের প্রার্থনা।

মাসিক বসুমতী ১১১-১৩৯

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ। শুধুই কি গর্জ্জন। খাদ্য সমস্যা। খাদ্য-সমস্যা'। বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ। সরকারী কন্‌ট্রোলের দোকান। অনাহারে মৃত্যু। কলিকাতায় বুভুক্ষুদিগের মৃত্যু। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে। দুর্গত দূরীকরণ। বাংলার খাদ্য-সমস্যা। বলপ্রয়োগ। আবার আশঙ্কা। দুর্ভিক্ষে মৃত্যু। লজ্জার বিষয়। দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব।

শিশুসাথী ১৪১-১৪২

সম্পাদকীয়।

শনিবারের চিঠি ১৪৩-১৫১

সংবাদ সাহিত্য।

দীপালী ১৫৩-১৫৯

বণ্টন প্রহসন। খাদ্যাভাবের দুর্গতি। খাদ্য সংকটে বাংলা সরকার। মহানগরী। মন্বন্তর। আলোচনী।

দেশ ১৬১-২২০

খাদ্য সমস্যার তীব্রতা। দেশের অন্ন সমস্যা। অন্নসমস্যার উদ্বেগ। ধান চাউলের প্রাচুর্য। বাঁচিয়া থাকার সমস্যা। বাঙলার খাদ্যসমস্যা। বাঙলার খাদ্যসমস্যা। খাদ্য সমস্যা ও মন্ত্রিমণ্ডল। মজুত বিরোধী অভিযান। খাদ্য সম্মেলন। সমাধানের উপায়। খাদ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত। খাদ্য সঙ্কটে ভারত সচিব। ভিক্ষুকের দেশ। দেশের দুর্দশা। দুর্দশার প্রতিকার। ঔদাসীন্যের ফল। কলিকাতার রাস্তায় মৃতদেহ। দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে। প্রতিকার কোথায়। শহর হইতে লোকাপসরণ। ছাত্র সমাজের জাগরণ। বাঙলার অবস্থা। কার্যকর ব্যবস্থার পথ। পূজার আয়োজন। দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে। বিজয়ার সম্ভাষণ। বাঙলার সমস্যা। অন্নসমস্যায় মহাত্মা

উপোসি বাংলা

সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর

উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মিশন

দুঃস্থদের সাহায্যকল্পে আবেদন

যুদ্ধের পরিস্থিতির ফলে দেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের—বিশেষ ভাবে চাউলের অভাব হইয়াছে। চাউল যাহা পাওয়া যায় উহাও অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। এজন্য দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। প্রত্যেক জেলায় হাজার হাজার বুভুক্ষু নরনারী একমুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন।

দুঃস্থ পরিবারবর্গকে অবিলম্বে সাহায্য করিবার জন্য আমাদের নিকট বহু আবেদন আসিতেছে, কিন্তু গত অক্টোবর মাস হইতে আমরা মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলায় বাত্যাবিধ্বস্ত জনগণের সেবায় নিযুক্ত আছি এবং আমাদের তহবিলে অতি সামান্যই অর্থ আছে, এই কারণে আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর কষ্ট নিবারণকল্পে আমরা বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। এই সামান্য অর্থ দ্বারা মফঃস্বল শহরে ও গ্রামে আমাদের কয়েকটি শাখা কেন্দ্র (দিনাজপুর, সোনারগাঁ, টাকী) হইতে সাহায্য দান করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুর্দ্দশাপন্ন পরিবারবর্গকে তাহাদের অবস্থানুযায়ী বিনামূল্যে চাউল বিতরণ কিংবা আর্থিক সাহায্য করা হইতেছে। কারণ অবস্থা মন্দের দিকেই দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। চাউলের মূল্য বিশেষভাবে কমিলে নূতন ফসল না পাওয়া পর্যন্ত এই সেবাকার্য্য চালাইতে হইবে।

আমরা দুর্গত নরনারী দিগের অন্নকষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট এই আবেদন করিতেছি। তাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করুন। দান যতই সামান্য হউক না কেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে উহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং উহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

১। সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়মঠ, জিলা-হাওড়া। ২। ম্যানেজার, উদ্বোধন অফিস, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। ৩। ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

৫. ৬. ৪৩

স্বামী মাধবানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

(আষাঢ় ১৩৫০)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নিরন্ন নারায়ণ সেবা

আজ বাঙ্গালা দেশের বড় দুর্দিন। দেশের সর্বত্র অন্নের জন্য হাহাকার, বুভুক্ষু নরনারীর করুণ আর্তনাদ! এই কলিকাতায় সহস্র সহস্র নরনারী, শিশু, বালক, বালিকা এক মুষ্টি অন্নের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অনশনে, অর্ধাশনে, অখাদ্য আহারে রোগগ্রস্ত হইয়া শত শত লোক প্রত্যহ প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। তাহাদের উন্মুক্ত আকাশতল ব্যতীত কোন আশ্রয় স্থান নাই। পল্লীগ্রামে এবং মফঃস্বল শহরে সর্বত্র একই অবস্থা। সুখের বিষয়, এই দুর্দিনে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সহানুভূতি পাওয়া যাইতেছে এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান অন্নসত্র খুলিয়া, কিংবা দুঃস্থদিগকে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিয়া সাহায্য করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন হইতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে নিরন্ন নারায়ণের সেবাকার্য চলিতেছে:

অন্নসত্র—বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ এবং ঢাকা জেলার বালিয়াটি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে চাউল বিতরণ—২৪ পরগণা জেলার টাকী এবং সরিষা আশ্রম; ঢাকা জেলার সোনার গাঁ এবং কলমা ; বাঁকুড়া, বরিশাল, দিনাজপুর ; খুলনা জেলার বাগের হাট ; বহরমপুর, মেদিনীপুর এবং মালদহ। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় এবং আরও কয়েক স্থানে চাউল বিতরণের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ এখনও আমরা পাই নাই। আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা এবং বর্ধমান জেলার ব্যাত্যা এবং বন্যাপীড়িত স্থানে প্রায় ৬৬ হাজার নিরন্ন লোককে বিনামূল্যে চাউল বিতরণ করা হইতেছে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

বাঙলায় অন্নসংকট (সম্পাদকীয়)

কয়েক মাস যাবৎ বাঙলা দেশে ভীষণ অন্নসংকট উপস্থিত হইয়াছে। শহর বন্দর ও পল্লীসমূহে সর্বহারা বুভুক্ষু নরনারী দলে দলে একমুষ্টি অন্নের সন্ধানে আকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পথে ঘাটে হাটে মাঠে শত ছিন্ন মলিন বসনজড়িত রোগজীর্ণ কংকালসার ভিক্ষুকদের সংখ্যা ক্রমেই বেশী দেখা যাইতেছে। বাঙালীর জীবনধারণের প্রধান উপাদান চালের মূল্য কল্পনাতীত বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণ দলে দলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। জীবন রক্ষার উপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অতি শীঘ্র না কমিলে বাঙলার বহু পরিবার যে অদূর ভবিষ্যতে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া বাহির হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কলিকাতার রাস্তাঘাটগুলি নগ্নপ্রায় নিরন্ন স্ত্রী-পুরুষে ক্রমেই অধিক মাত্রায় পূর্ণ হইতেছে। এই হতভাগ্যদের মধ্যে অধিকাংশ কলিকাতার নিকটবর্তী পল্লীসমূহের অধিবাসী। অতি জঘন্য দারিদ্রের পংকিল পংকে ইহাদের জন্ম। ইহারা নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাহা উপার্জন করিত, উহা দ্বারা অতি কষ্টে কোনরকমে জীবনধারণ করিত। অনশন ও অর্ধাশন এই অভিশপ্ত নরনারীকুলের নিত্য সহচর। মর্মন্তুদ অভাবের জন্য ইহাদের ভগ্ন পর্ণকুটির সংস্কৃত

হইত না এবং পেটের অন্ন ও পরনের কাপড় জুটিত না। অজ্ঞতার জন্য ইহারা আবর্জনা স্তূপে আবৃত থাকিত। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপের সময় প্রধানতঃ এই শ্রেণীর নরনারীই আক্রান্ত হইয়া ঔষধ পথ্য ও সেবাশুশ্রূষার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এইরূপ নিদারুণ দৈন্যদুঃখ-পীড়িত অজ্ঞ নরনরীগণকেও ঠকাইয়া দুনিয়াদারীতে বিশেষজ্ঞ নানা শ্রেণীর লোক তাহাদের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে দ্বিধা করে না। যখন চালের মন ছয় টাকা ছিল, তখনও এই পশু প্রায় নরনারীগণ দারিদ্র্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। বর্তমানে চালের মন উহার সহিত আটগুণ বৃদ্ধি হওয়ায় ইহাদের অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে।

এইরূপে জীবনমরণ সমস্যায় পতিত হইয়াও এই দরিদ্রগণ সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। চাল ক্রমেই অগ্নিমূল্য হইতে আরম্ভ করিলে ইহাদের মধ্যে অনেকে পল্লী হইতে হাঁটিয়া এবং অনেকে লোকাল ট্রেনের কামরাগুলির দুইপাশে ঝুলিয়া কলিকাতায় আসিয়া কন্ট্রোলের দোকান হইতে কম দামে এক এক সের চাউল লইয়া যাইত। একদিন অপরাহ্নে আসিত এবং সারারাত ফুটপাথে লাইনে দাঁড়াইয়া শুইয়া বসিয়া কাটাইয়া পরদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যে চাল পাইত। লাইনচ্যুত হইবার ভয়ে শৌচাদি ফুটপাথেই নির্বাহ করিত! যাহারা ভাগ্যদোষে লাইনের পিছনে পড়িত, তাহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও প্রায়ই চাল পাইত না। এইরূপে কয়েকমাস অতীত হইলে এই অসহায় নরনারীকূল যখন তিক্ত অভিজ্ঞতামূলে দেখিল যে, কলিকাতায় যাইয়া কন্ট্রোলের দোকান হইতে এক সের চাল আনিলে তাহাদের চালের মূল্য উপার্জনের সময় থাকে না এবং এই দুর্দিনে অর্থোপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তখন তাহারা প্রথমতঃ গ্রামেই ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গ্রামে ভিক্ষা ক্রমেই অত্যন্ত দুর্লভ হওয়ায় কিছুদিন তাহারা অর্ধাশনে-অনশনে থাকিয়া এবং অখাদ্য খাইয়া অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিল। ইহার ফলে এই হতভাগ্যগণ কংকাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রোগগ্রস্ত হইতে লাগিল। অবশেষে জীবনরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ইহারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ভিক্ষাপাত্র লইয়া দলে দলে কলিকাতায় আগমন করিল। আজও যে সকল পল্লীবাসী দরিদ্র নরনারী অশেষ ধৈর্যসহকারে কলিকাতায় আসিয়া কন্ট্রোলের দোকান হইতে চাল লইয়া যাইতেছে, কিছুদিন পর ইহারাও উপায়ান্তর না দেখিয়া ভিক্ষুকদের দল পুষ্ট করিবে। পল্লীর প্রায় সকলেরই অন্নসমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে কাজ পাওয়া ক্রমেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপে কাজের অভাবে কত গ্রামের কত দরিদ্র পরিবার যে ভিক্ষুকে পরিণত হইবে, তাহা ভাবিলেও মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

কলিকাতায় যে সকল নিরন্ন নরনারী আসিয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই সঙ্গেই স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী আসিয়াছে। খাদ্যের জন্য ইহাদিগকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। ইহারা গৃহস্থের দরজায় যাইয়া "মাগো, ও মা, ভাত দাও" বলিয়া করুণ কণ্ঠে চিৎকার করে। ওঃ কি হৃদয়ভেদী কাতর কণ্ঠস্বর! এ স্বর কানের ভিতর দিয়া যথার্থই মরমে যাইয়া আঘাত করে। এ স্বর শুনিয়া পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়। বর্তমানে কলিকাতা নগরীর বহু স্থানে সহৃদয় ধনবানগণ এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধ্যানুসারে এই বুভুক্ষু নরনারীগণকে অন্ন দিতেছেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যার তুলনায় এই অন্নদানকেন্দ্রগুলি নিতান্ত অপর্যাপ্ত হইলেও বহু সংখ্যক ভিক্ষুক এইগুলি হইতে একবেলা আহার পাইয়া জীবনরক্ষা করিতেছে। অনেকে

ডাষ্টবিন ও নৰ্দ্দমা হইতে পরিত্যক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া খাইতেছে। অনেকে কুকুর বিড়ালের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আঁস্তাকুড় হইতে খাদ্য যোগাড় করিতেছে। অনেকে অর্ধাশনে ও অনশনে কাল কাটাইতেছে। ফুটপাথ ও রোয়াকে ইহারা রাত্রি যাপন করিতেছে। রৌদ্র ঝড় বৃষ্টি এই আশ্রয়হীন নরনারীর মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে! এই মানবদেহধারী জীবগণ গৃহপালিত পশু অপেক্ষাও হীনতম অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে! দিনের পর দিন মাসের পর মাস এইরূপ ভীষণ দুরবস্থায় থাকিয়া ইহাদের মধ্যে অনেকেই নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে ফুটপাথেই মরিয়া যাইতেছে। খাদ্যাভাবে মৃতকল্প অতি অল্পসংখ্যক ভিক্ষুক ফুটপাথ হইতে হাসপাতালে প্রেরিত হইতেছে। গত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিবরণে প্রকাশ যে, একমাত্র কলকাতায়ই গত আগস্ট মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে ৫৪৮ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে ৮০২ জন অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কলিকাতা শহরেই যখন এইরূপ অবস্থা, তখন মফঃস্বলে যে আরও বেশী লোক এই সময়ে অন্নাভাবে পরলোক গমন করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সংবাদপত্রে প্রতিদিন বাঙলার শহর ও পল্লীগ্রামের বহু লোকের অনশন-মৃত্যুর বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। খাদ্যভাবে মায়ের কোলে সন্তান মরিতেছে এবং সন্তানের কোলে মাথা রেখে মা দেহত্যাগ করিতেছে। অন্নাভাবে স্বামীর সম্মুখে স্ত্রী মরিতেছে এবং স্ত্রীর সম্মুখে স্বামী পরলোক গমন করিতেছে। হাজার হাজার বালক-বালিকা মাতৃ পিতৃহীন হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিতেছে। এইরূপ দুই দল অনাথ বালককে ইতোমধ্যেই পাঞ্জাবে এবং এক দলকে সিন্ধু দেশে পাঠান হইয়াছে। আরও যে কত অনাথ বালক-বালিকা নিতান্ত নিরাশ্রয়ভাবে অভিভাবকহীন হইয়া এই কলিকাতা নগরে বিচরণ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ।

মফঃস্বলের শহর ও পল্লীসমূহের অবস্থা আরও শোচনীয়। কলিকাতায় অনেক বদান্য ধনবান আছেন এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও আছে। এই সকল সহৃদয় ব্যক্তি ও জনকল্যাণকব প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী পল্লীগুলির দুস্থিত জনগণকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছে। কিন্তু মফঃস্বলের শহরে ও পল্লীতে এতদুভয়েরই অত্যন্ত অভাব। অথচ অন্নক্লিষ্ট দরিদ্র নরনারীর সংখ্যা মফঃস্বলেই অত্যন্ত বেশী। তথাকার ভিক্ষুকগণ ভিক্ষাও পাইতেছে না। কারণ, তথায় অতি অল্প সংখ্যক ভাগ্যবান ভিন্ন সকলেই অনাহারে ও অর্ধাহারে জীবন যাপন করিতেছে। বাঙলা দেশে এখন এরূপ শহর বা পল্লী একটিও নাই যেখানকার অধিকাংশ লোক দুই বেলা খাইতে পাইতেছে। বর্তমানে বাঙলা দেশের সর্বত্র ভিক্ষাদাতা অপেক্ষা ভিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক গুণে বেশী হইয়াছে। এই সকল কারণে বাঙলার পল্লীসমূহের দরিদ্র ভিক্ষুকগণ ভিক্ষার অভাবে উপবাস থাকিয়া এবং অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া দলে দলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্য-পরিস্থিতির আলোচনা প্রসংগে কতিপয় সদস্য বলিয়াছেন: "কলিকাতায় বুভুক্ষুদের দৃশ্য হৃদয়বিদারক সত্য, কিন্তু মফঃস্বলে সুদুর শহর ও পল্লী অঞ্চলে যে অবস্থা দেখা দিয়াছে, উহার তুলনায় কলিকাতার দৃশ্য কিছুই নহে। একদিকে সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর ভূমিহীন গৃহহারা ও সহায়হীন নরনারীর দুঃখ দুর্দ্দশা যেমন অবর্ণনীয় হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে তেমন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি—যাহাদের আয় নির্দ্দিষ্ট অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে—তাহারা আজ কোনরকমে জীবন ধারণ করিতেছে এবং ধীরে ধীরে একেবারে নিশ্চি হ্ন

হইয়া যাইবার মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে আত্মহত্যা, পরিবার ও সন্তান সন্ততি ত্যাগ ও পথিপার্শ্বে অনশনজনিত উপেক্ষিত মৃতদেহ পড়িয়া থাকার বহু সংবাদ প্রতিনিয়ত পাওয়া যাইতেছে। কাঁথিতে শৃগালে কুকুরে প্রকাশ্যভাবে নর-নারীর মৃতদেহ খাইতেছে এবং এই সকল জীবকে গুলি করিয়া মারিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।" ✡ ✡ ✡ "বরিশালে দিন দশেক পূর্ব্বে কালেক্টরীর সামান্য কিছুদূরে একজন মানুষের মৃতদেহ কুকুরে খাইতেছে দেখা যায়। ভোলা ও নোয়াখালিতে অসহায় নরনারী পেটের জ্বালায় নিজেদের ছেলে মেয়ে বিক্রয় করিবার জন্য চালান দিতেছে।" ✡ ✡ ✡ "যাহারা ধান চাউল বিক্রয় করিয়া বা দালালী করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছে, তাহারাই এইসব ছেলেমেয়ে কিনিতেছে। বরিশালে প্রকাশ্য বাজারে এইসব ছেলেমেয়ে বিক্রয় হইতেছে ৫/১০ টাকায়।" ✡ ✡ ✡ "এই সকল ছেলে মেয়ের শতকরা ৯৮ জন মুসলমান এবং বাকী ২ জন নিম্নস্তরের হিন্দু। ব্রাহ্মণ বিধবাও অপরের উচ্ছিষ্ট চাহিয়া আহার করিতেছে। নিরন্নের দল যাহারা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের গৃহস্থের দরজায় যাইয়া 'দুটি ভাত' চাহিবার সাহস পর্যন্ত নাই ;তাহারা 'ফেন' চাহিতেছে। যাহাকে এখনও লোকে বাঙলার 'গোলাঘর' বলে, সেই বরিশালের যখন এই অবস্থা, তখন অন্যান্য স্থানের অবস্থা যে ভয়াবহ, তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ এই অবস্থায়ও বরিশাল হইতে হাজার হাজার মণ চাউল বাহিরে চালান হইতেছে। বাঁকুড়ায় শৃগাল কুকুরে নরমাংস খাইতেছে।"

মেদিনীপুরের যে অঞ্চল বন্যা ও বাত্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে, ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদের অবস্থা বর্তমানে মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ গৃহস্থই সর্বস্বান্ত হইয়াছে। সেবা প্রতিষ্ঠান সমুহ রিলিফ-কার্য পরিচালনা করিয়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ কোন রকমে এই দুঃস্থ নরনারীগণকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে এই সকল স্থানে সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া ও উদরাময় রোগের আক্রমণে হাজার হাজার লোক জীবনত্যাগ করিতেছে। দীর্ঘকাল অর্ধাহারে ও নিরাহারে থাকিয়া ইহাদের জীবনীশক্তি এরূপভাবে হ্রাস পাইয়াছে যে, যে রোগাক্রান্ত হইতেছে, সেই মরিয়া যাইতেছে। একে তো প্লাবনের ফলে এই অঞ্চলের জমিগুলি লবণাক্ত হইয়া চাষের অযোগ্য হইয়াছে এবং চাষের জন্য মহিষ ও বীজেরও অত্যন্ত অভাব হইয়াছে, ইহার উপর রোগের আক্রমণে এই অঞ্চলের ক্রিশ্যমান অধিবাসীগণ ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। কিছুদিন হয় দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্ধমান জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছে। এই ভীষণ অন্ন-সংকটের দিনে এখানকার দুর্গত অধিবাসীদের দুরবস্থা চিন্তা করিলেও আতঙ্কগ্রস্ত হইতে হয়।

জীবনধারনের উপযোগী অন্নবস্ত্র ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কল্পনাতীত দুর্মূল্য ও দুস্প্রাপ্য হওয়ায় শহর ও পল্লীর মধ্যবিত্তদের অবস্থা দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ—যাহারা সরকারী সামরিক ও অসামরিক নানাবিভাগে চাকরি করেন, তাঁহাদের অনেকে মোটা মাহিনা, ডিয়ারনেস এলাউন্স ও রেসন কার্ড পাইয়া এই দুর্দ্দিনেও পরিবারবর্গ পোষণ করিতেছেন। যাঁহাদের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী জমিজমা বা ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, তাঁহাদেরও অন্নসংকট উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু শহরের বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের আয় বৃদ্ধি হয় নাই অথচ ব্যয় বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর সংখ্যা নগণ্য নয়। খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়ায় ইঁহারা পরিবারবর্গসহ অর্ধাশনে ও অনশনে জীবন যাপন করিতেছে।

চাল আটা চিনি কয়লা কাপড় ও কেরোসিনের কন্ট্রোলের দোকানে এই শ্রেণীর নরনারীই ভিড় জমাইতেছেন। পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পল্লীতে ইঁহারা সামান্য জমিজমা, নানাপ্রকার বৃত্তি, শিল্পকার্য, অল্প মূলধনে ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানদারি ও সামান্য মাহিনার চাকরির আয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। ইঁহাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ইঁহারা অর্ধাহারে ও নিরাহারে থাকিয়া রোগে জীবনীশক্তিহীন হইয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বর্তমানে বাঙলার বর্ধিষ্ণু পল্লীসমুহের দরিদ্র পরিবার দূরের কথা মধ্যবিত্ত অধিকাংশ ভদ্র পরিবারও দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। বস্ত্রের একান্ত অভাবে অনেক ভদ্রলোকের পক্ষে ঘরের বাহির হওয়া দুস্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শ্রেণীর অনেকে অভাবের তাড়নায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেকে অন্নবস্ত্রের সমস্যা মিটাইবার জন্য সোনারূপা অনেক পূর্বেই বিক্রয় করিয়াছেন। ইদানীং এই শ্রেণীর ভদ্রলোক তামা, কাঁসা ও পিতলের জিনিসপত্র—এমন কি বাসগৃহের চালের টিনও বিক্রয় করিতেছেন। ক্রেতাগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই সকল জিনিসপত্র অল্পমূল্যে কিনিয়া শহরে চালান দিতেছে। এজন্য বহু স্থানে হাটে বাজারে দোকান বসিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ অনশনে থাকিলেও সাধারণতঃ সম্মানের দায়ে ভিক্ষায় বাহির হইতেন না। বর্তমানে ইহাদের মধ্যে অনেকে সর্বস্বান্ত হইয়া পেটের তাড়নায় প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। চালের মূল্য আরও দীর্ঘদিন অস্বাভাবিক থাকিলে এই ক্লিশিত শ্রেণীরও অধিকাংশ লোকই ভিক্ষুকে পরিণত হইবেন। সম্প্রতি আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাইয়াছি যে, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ধান চালের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার পর হইতে বাঙলার বহু স্থানে অস্বাভাবিক মূল্য দিয়াও ধান চাল একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। ইহার পরিণতি যে অত্যন্ত ভয়ানক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বর্তমানে বাঙলা দেশের অতি অল্প সংখ্যক ধনবান ও ভাগ্যবান মধ্যবিত্ত ভিন্ন অন্যান্য সকলেই ভীষণ অন্নসংকট সমস্যায় পতিত হইয়াছে। বাঙলার জনসাধারণ যথার্থই জীবন মরণ সমস্যার সম্মুখীন। ইহা কবির কল্পনা নয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য—বাস্তব। বাঙলা দেশে সত্য সত্যই সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায়ও বাঙলা দেশ যদি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বলিয়া পরিগণিত না হয়, তাহা হইলে 'দুর্ভিক্ষ' শব্দের প্রচলিত অর্থ অন্যরূপ করিতে হইবে। বাঙলায় এরূপ সর্বনাশকর বিপদ আর আসে নাই। বাঙালী জাতি অন্নবস্ত্রের ঐকান্তিক অভাবে এরূপ অসহায়ভাবে ধ্বংসোম্মুখ আর হয় নাই। বাঙলার বক্ষের উপর দিয়া বারংবার রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়েছে, কিন্তু সে সকল বর্তমান বিপ্লবের নিকট সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ সদৃশ। বাঙলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরও এত সাংঘাতিক—এত ব্যাপক ছিল না। উহা ছিল প্রাকৃতিক কিন্তু বর্তমান মন্বন্তর মানুষের তৈরি। অতিবিক্তভাবে বাঙলার খাদ্যদ্রব্য ক্রয়, আমদানী রপ্তানী ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ, সকল স্থানে সমভাবে বণ্টনের অভাব, লাভের অতিলোভ প্রভৃতি দেশব্যাপী অন্নসংকটের মূলে বিদ্যমান। এই সকল কারণে কোন ব্যক্তি বা সংঘের প্রচেষ্টায় বর্তমান খাদ্য সংকটের প্রতিকার সম্ভব নয়। একমাত্র গবর্ণমেন্টই দেশব্যাপী এই ভীষণ বিপত্তি হইতে বাঙালী জাতিকে রক্ষা করিতে পারেন।

ইতোমধ্যে বাঙলা গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে বুভুক্ষুগণকে 'গ্রুয়েল' নামধেয় একপ্রকার পাতলা খিচুড়ি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চাল, ডাল, বাজরা ও জোয়ার এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া এই খাদ্য

বিতরণ করা হইতেছে। আমাদের মতে এইরূপ খাদ্য খাইয়া কোন মানুষের পক্ষে দীর্ঘদিন জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই প্রকার খাদ্য দানের পরিবর্তে গবর্ণমেণ্ট যদি ক্ষুধিতগণকে কেবল চাল দিতেন, তাহা হইলে বহু লোকের জীবন রক্ষা হইত। গবর্ণমেণ্টের এই খাদ্য দানের ব্যবস্থা ব্যতীত বহু স্থানে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দানশীল ধনবান ব্যক্তিগণ খাদ্যাদি দান করিয়া লক্ষ লক্ষ অনাহারক্লিষ্ট নরনারীকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতেছেন। বাঙলাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে সকল শাখা আছে, উহাদের প্রায় প্রত্যেকটি কেন্দ্র হইতেই কোন না কোন আকারে অন্ন সংকট সেবাকার্য পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন বহু সেবা প্রতিষ্ঠান বুভুক্ষু নরনারীকে যথাসম্ভব খাদ্যাদি দিতেছেন এবং নানাভাবে তাহাদের সেবা করিতেছেন। কিন্তু কেবল এই প্রকার দানের দ্বারা দেশের শতাংশের একাংশের প্রয়োজনও পূর্ণ হইতেছে না। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে, অন্ন বস্ত্র ও ঔষধ দান করিয়া কোন দেশের কোন জাতিকে দীর্ঘদিন বাঁচান সম্ভব নয়। বাঙলা দেশে যেরূপ ব্যাপক অভাব ঘটিয়াছে, এই অবস্থায় অন্ন বস্ত্র ও ঔষধ দান করিয়া কতক লোককে কিছুদিনের জন্য বাঁচান সম্ভব হইলেও দেশশুদ্ধ অগণন ক্লিশিত জনসাধারণকে দীর্ঘদিন বাঁচান সম্ভব হইবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি সত্যসত্যই বাঙলার ক্ষুধার্ত জনগণকে আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে যে নীতি অনুসরণের ফলে সমগ্র দেশময় ভীষণ অন্নসংকট উপস্থিত হইয়াছে, উহার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। অন্য কোন উপায়ে এই জটিল সমস্যার সম্যক সমাধান হইবে না।

পরিশেষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলার এই সাংঘাতিক অন্নাভাব সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদিগকে— বাঙলার হিন্দু-মুসলমান দলাদলি ভুলিয়া দেশের অশন বসন ও রোগক্লিষ্ট নরনারীকে অন্নবস্ত্র ও ঔষধ দিয়া বাঁচাইতে হইবে। বাঙলা দেশকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ বাঙালীর। অবশ্য আমাদিগকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহায্য লইতে হইবে। সুখের বিষয় যে, সকল প্রদেশ হইতেই এজন্য আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইতেছি। এই ভীষণ সংকটকালে ভারতের সব প্রদেশেরই দানশীল ধনবান ও স্বদেশভক্তগণ নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন এবং সহানুভূতি দেখাইতেছেন। বাঙলার এই জীবন-মরণ সমস্যা দূর করিতে ধনবান বাঙালী মাত্রকেই মুক্ত হস্ত হইতে হইবে। দেশব্যাপী অন্নসংকটের অবসান ঘটাইতে যে অর্থের প্রয়োজন উহা প্রধানতঃ তাঁহাদিগের নিকট হইতেই আমরা পাইবার আশা করি। দেশ যদি উচ্ছন্ন হইয়া যায়, জাতি যদি ধ্বংস হয়, তাহা হইলে ধনের স্তূপের উপর থাকিয়াও তাঁহারা শান্তি পাইবেন না। এই সর্বনাশকর সংকটকালে কেবল বাঙলার বদান্য ধনবান নহেন, পরন্তু স্বদেশপ্রেমিক যুবকগণকেও স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্য ত্যাগ ও সেবায় অনুপ্রাণিত হইয়া অক্লান্ত কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। তাহাদিগকে দেশের সর্বত্র সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া ধনবানদের অর্থ সাহায্যে অন্নবস্ত্রহীন ও রোগগ্রস্ত নরনারীগণকে অন্নবস্ত্র ও ঔষধ দান এবং সেবাশুশ্রূষা করিতে হইবে। তাঁহারা এতদিন যে স্বদেশ ও স্বজাতি বাৎসল্যের গর্ব করিয়াছে, এখন কার্যতঃ তাহা দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, বাঙলার দেশভক্ত তরুণগণ তাঁহাদের স্বদেশবাসী ক্লিশ্যমান জনগণকে আত্মত্যাগপূর্ণ সেবা দ্বারা আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন।

(কার্তিক ১৩৫০)

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা আগত বুভুক্ষুদের সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রাথমিক বিবরণী— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ (Department of Anthropology) হইতে কলিকাতায় আগত বুভুক্ষু নরনারীদের একটি প্রাথমিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও বদান্য ব্যক্তি এই নিরন্ন জনগণের সেবাকার্য করিতেছেন, তাঁহারা এই বিবরণ হইতে কোন্ শ্রেণীর নরনারী কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং তাহাদিগকে কতদিন কিরূপভাবে সাহায্য করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিয়া কার্য পরিচালনের সুযোগ পাইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার, নিমতলা, শিয়ালদহ, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হাওড়াপুল ও বেলেঘাটা অঞ্চলে আগত বুভুক্ষুগণের ৫০৪টি পরিবারের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছেন যে, ইহারা বাঙ্লার বিভিন্ন জেলা হইতে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে [শতকরা হিসাবে]২৪ পরগণার ৭৯.১ জন, মেদিনীপুরের ৯.৫ জন, নদীয়ার ৩.৭ জন, হুগলীর ২.৫ জন, হাওড়ার ২.৪ জন, বর্ধমানের ১.৯ জন এবং অন্যান্য জেলার মোট ১ জন।

পূর্বোক্ত ৫০৪ পরিবারের লোকসংখ্যা ১৫৬৬ জন। প্রতি পরিবারে গড়ে ৩.১ জন। ১৫৬৬ জনের মধ্যে শতকরা ৫৫.৭ জন স্ত্রীলোক ও ৪৪.৩ জন পুরুষ। ইহাদের মধ্যে শতকরা বয়স্ক ৪১.৬ জন, বালক বালিকা ২৭.৭ জন, শিশু ২৬.৩ জন ও বৃদ্ধ ৪.৪ জন।

এই নিরন্ন জনগণের মধ্যে শতকরা তফসিলভুক্ত শ্রেণীর ৫২.৭ জন, মুসলমান ৩০.৯ জন, বর্ণহিন্দু ১৫.৪ জন ও ভারতীয় খৃষ্টান ১ জন। ইহাদের মধ্যে শতকরা অবিবাহিত ৫৫.৬ জন, বিবাহিত ৩১.২ জন, মৃতদার ও বিধবা ১৩.২ জন।

এই বুভুক্ষুগণের মধ্যে কৃষি শ্রমিক শতকরা ৪৭ ৭ জন, কৃষক ও বর্গাদার ২৫.০ জন, অল্প মূলধনের ব্যবসায়ী ৭.০ জন, ভিক্ষুক ৬.৬ জন, মৎস্যজীবী ২.৭ জন এবং অন্যান্য ১০.৭ জন।

ইহাদের মধ্যে শতকরা ২৪.৪টি পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের পারিবারিক সম্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিয়াছে এবং স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ কবিযাছে। বালক-বালিকা বয়স্ক ও রুগ্ন মাতা পিতাকে ছাড়িয়া চালিয়া গিয়াছে। ভাই বুভুক্ষু ভগ্নীকে ত্যাগ করিয়াছে।

এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ আগামী নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হইবে বলিয়া এই বিভাগ জানাইয়া দেন।

(কার্তিক ১৩৫০)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বাঙ্লার দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া

শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতির সম্পাদক স্বামী সৌম্যানন্দ ও স্বামী গোপেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন: "শ্রীহট্ট জেলার বালিয়াচঙ্গ একটি অতি বৃহৎ গ্রাম। ইহাতে প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার লোকের বাস। গত ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তিনমাসে এই গ্রামের প্রায় এক চতুর্থাংশ নরনারী খাদ্যাভাবে ও ভীষণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আরও অন্যূন দশ হাজার অধিবাসী বর্তমানে ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য ও

শুশ্রূষার অভাবে ইহারা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আছেন। বিভিন্ন রিলিফ কমিটি এই গ্রামবাসীগণকে যে সাহায্য করিতেছেন উহা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত অপর্যাপ্ত।" এজন্য উক্ত সেবা সমিতিদ্বয় এই গ্রামে সেবা কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা বাঙলা দেশের বহু স্থান হইতে এইরূপ সাংঘাতিক সংবাদ পাইতেছি। বর্তমানে আমন ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে এবং ধান চালের মূল্যও পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছে বটে কিন্তু ২০/২৫ টাকা মণ মূল্যে চাল ক্রয় করিবার সংগতি অধিকাংশ লোকেরই নাই। এজন্য দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তেমন হ্রাস পায় নাই। এখনও প্রতিদিন বহু নরনারী অনাহারে ও অর্ধাহারে জীবনীশক্তিহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন। অনশন ও অর্ধাশনের আনুষঙ্গিক কুফলরূপে বাঙলার প্রায় সকল জেলাই নানাপ্রকার মারাত্মক ব্যাধি—বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়া এবং অনেক শহর, পল্লী কলেরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। প্রতিদিন সংবাদপত্রে এক একটি স্থানের হাজার হাজার লোকের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। অনেক গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য কয়েকটি রিলিফ পার্টি স্থানে স্থানে সেবাকার্য পরিচালন করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টও সাহায্য দিতেছেন বটে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতিশয় অপর্যাপ্ত। গবর্ণমেণ্ট যদি সময় থাকিতে দেশব্যাপী ভীষণ দুরবস্থার গুরুত্ব অনুসারে প্রতিকারের ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। বর্তমানে বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষ এবং ম্যালেরিয়ার আক্রমণ এত ব্যাপক যে, কয়েকটি বেসরকারী রিলিফ পার্টির পক্ষে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ দান করিয়া সকল দুঃস্থ নরনারীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে দেশের এই ভীষণ সংকটকালে দুঃস্থিত নরনারীর সেবা করা ভিন্ন তাহাদিগকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার অন্য কোনও উপায় আমাদের নাই। এইজন্য আমরা বাঙলার শিক্ষিত যুবক এবং স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে সর্বত্র সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া নিরন্ন ব্যক্তিগণকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান এবং রুগ্নকে ঔষধ-পথ্য দান ও সেবা শুশ্রূষা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

(পৌষ ১৩৫০)

বাংলার দুর্গতি (সম্পাদকীয়)

কয়েকমাস পূর্বে দারুণ দুর্ভিক্ষে বাংলার দুর্গতি চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। খাদ্য সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি র সঙ্গে সঙ্গে শহরের ফুটপাথগুলি হাজার হাজার ভিক্ষান্বেষী বুভুক্ষু নরনারীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাটগুলিতে শত শত অনশনক্লিষ্ট নরনারী এক মুষ্টি অন্নের জন্য ভিড় জমাইয়াছিল। দিনের পর দিন উপবাসে এবং অখাদ্য-কুখাদ্য আহারে রোগাক্রান্ত হইয়া রাস্তা ঘাটে মাঠে কত লোক যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মরিয়া গিয়াছে এবং কত স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা যে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা আজও নিরূপিত হয় নাই। ভারত সেবক সমিতির সভাপতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বলিয়াছেন: 'সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি এবং দেখিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মৃত্যু সংখ্যা কুড়ি লক্ষ ছাড়াইয়া গিয়াছে'। ভারত সরকার ও বাংলা সরকার বলিয়াছেন : 'মৃত্যু সংখ্যা সংগ্রহ করা হইতেছে।' বাংলার কত লোক দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে তাহা সঠিক রূপে নির্ণীত না হইলেও ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, দুর্ভিক্ষে যত লোক মরিয়াছে, উহা অপেক্ষা

দুর্ভিক্ষের জন্য সর্বস্ব-বিনাশে এবং নানাবিধ মারাত্মক রোগে অনেক বেশি লোক মরিয়াছে এবং মরিতেছে।

সত্য বটে, গত বৎসর সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের যেরূপ প্রকোপ ছিল, বর্তমনে উহার প্রাবল্য সেরূপ নয়। কিন্তু জীবনাধারণের উপযোগী ধান-চাল ও বস্ত্রাদির মূল্য এখনও জন-সাধারণের ক্রম-শক্তির মধ্যে নামিয়া আসে নাই। সরকারী ও বেসরকারী উভয় পক্ষীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলিতেছেন যে, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বাংলায় এবার আমন ধান বেশি হইয়াছে। এখন আমন ধানের পুরা মরসুম চলিতেছে। তথাপি গত বৎসর এই সময়ে ধান-চালের যে মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। প্রতিদিন সংবাদ-পত্রে দেখা যাইতেছে যে, ধান-চালের মূল্য বাংলার প্রায় সর্বত্রই এখন বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। এই জন্য অনেকেই আশংকা করিতেছেন যে, যদি এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকে, তাহা হইলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সমগ্র বাংলা দেশ গত বৎসর অপেক্ষাও সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষের কবলিত হইবে। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, লণ্ডনের নিউজ ক্রণিকেলের নবদিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন : "বাংলায় খাদ্যশস্যের অবস্থা সম্বন্ধে এখনও উদ্বেগ অনুভূত হইতেছে।" বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত অধিবেশনে জনৈক সভ্য বলিয়াছেন : 'বর্তমানে যে হারে ধান-চালের দর চড়িতেছে, তাহাতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িবে। ধান-চালের দর তখন না কমিলে অভাবের তাড়নায় শতকরা ৬০।৭০ জন কৃষককে গত বৎসর অপেক্ষা আরও সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়িতে হইবে।'

আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, স্বাভাবিক সময়ে যখন চালেব মূল্য ৩্ হইতে ৫্ ছিল, তখনও বাংলার বহু দরিদ্র পরিবার দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না। গত বৎসর এই সময়ে চালের মূল্য ১০্।১২্ ছিল, তখনও দেশময় হাহাকার রব উঠিয়াছিল। বর্তমানে চালের মূল্য ১৫্।১৬্ হইতে ২০্।২২্ টাকা এবং ইহার গতি বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। এইরূপ অগ্নিমূল্যে চাল কিনিয়া খাইবার ক্ষমতা বাংলার অধিকাংশ পরিবারেরই নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত অধিবেশনে ফরিদপুরের জনৈক সভ্য বলিয়াছেন : 'এখন ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে মণপ্রতি ২০্।২২্ করিয়া চাল বিক্রীত হইতেছে। ফলে সমাজের দরিদ্রতর লোকদের অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের পর জনসাধারণের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, চালের মূল্য যদি মনপ্রতি ৫্ টাকায়ও নামে, তথাপি সাধারণ লোকের উহা কিনিয়া খাইবার ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্টের উচিত খাদ্যশস্য এমন একটা মূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা, যাহাতে দরিদ্রতর জনগণ উহা ক্রয় করিতে সক্ষম হয়।' কেবল ফরিদপুর জেলা কেন, বাংলার অনেক জেলারই এই অবস্থা। বর্তমানে শুধু চালের মূল্য চড়া নয়, পরন্তু জীবনধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় তরকারি দুধ মাছ কাপড় প্রভৃতি ক্রয় করাও অধিকাংশ পরিবারের আর্থিক শক্তির সম্পূর্ণ বাহিরে। এ অবস্থায় অন্নসংকটের অবসান হইয়াছে বলা যায় না। অবশ্য বাজারে দুর্মূল্য কোন জিনিসও অবিক্রীয় থাকে না। কিন্তু ইহা দেশের আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণ নয়, বরং দেশের যে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে প্রচুর অর্থ আসিয়াছে, তাঁহাদের দ্বারা অসংখ্য লোকের দুর্গতিকে আবৃত করিয়া রাখিবার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে দেশের জনসাধারণ অন্নবস্ত্র ও ঔষধের অভাবে মৃত্যুর দিকে ধাবিত, সে দেশে অতি অল্পসংখ্যক লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অতিশয় নিন্দনীয় আর্থিক অসমতার পরিচায়ক।

বর্তমানেও শহরের অধিকাংশ লোকের অন্ন-সংকট দেখা যাইতেছে। শহরের বেশির ভাগ

লোকই সাধারণ চাকরি, সামান্য মূলধনে ব্যবসা, যানবাহন নির্মাণ ও পরিচালন এবং মজুরি করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। খাদ্য ঔষধ ও বস্ত্রাদি দুর্মূল্য এবং বাড়ীভাড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় পোষ্যবর্গকে দুইবেলা খাইতে দেওয়া ইহাদের অনেকের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। অনাহারে ও অর্ধাহারে এই শ্রেণীর নরনারীর জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে এবং ইহারা নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। বাংলার শহরগুলিতে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির ইহাই প্রধান কারণ। শহরে যখন অন্নসত্র ছিল, তখন এই শ্রেণীর বহুলোক উহা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়াছে। এখন অন্নসত্রগুলি বন্ধ হইয়ায় ইহাদের কষ্টের সীমা নাই। কলিকাতায় 'রেশন' প্রবর্তিত হওয়ায় সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থদের পক্ষেও দরিদ্রগণকে অন্নদানের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ভিক্ষুকবিতাড়নের জন্য ইদানীং পেশাদারী ভিক্ষুক রাস্তাঘাটে বেশি দেখা যায় না বটে কিন্তু গৃহস্থদের বাড়ীতে—বিশেষ করিয়া যে সকল স্থানে অন্নসত্র ছিল সেই সকল স্থানে প্রতিদিন দলে দলে ভদ্রশ্রেণীর ভিক্ষুক আসিয়া অন্নবস্ত্রের জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন। ইঁহাদেব মর্মন্তুদ দৈন্যদুঃখের কাহিনী শুনিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়।

বাংলাব পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। পল্লীগ্রামে যাঁহাদের পর্যাপ্ত অর্থ ও জমি-জমা আছে, সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ভিন্ন সকলেই অন্নবস্ত্র-সংকটে এখনও বিশেষভাবে বিপন্ন। পল্লীর মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহাদের সামান্য সঞ্চিত অর্থ ও জমি ছিল, দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহারা তাহা বিক্রয় করিয়া কোনরকমে পরিবারবর্গের জীবনরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, অন্নসংকট স্থায়ী হইবে না, আবার তাঁহাদের সুদিন আসিবে। কিন্তু জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য-দ্রব্যাদির মূল্য এখনও তাঁহাদের ক্রয়শক্তির মধ্যে নামিয়া না আসায় তাঁহারা পোষ্যবর্গের জীবন-রক্ষাসম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্ভিক্ষের আক্রমণে পল্লীর ভদ্রলোকদের মধ্যে পৌরোহিত্য ও গুরুতা উপজীবী ব্রাহ্মণদের আর্থিক দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। যজমান ও শিষ্যদের স্বেচ্ছাকৃত দানই ইঁহাদের জীবনযাত্রানির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। এখন যজমান ও শিষ্যদের প্রায় সকলেই অন্নবস্ত্র-সমস্যায় পতিত। তাঁহারা নিজেরাই খাইতে পান না, গুরু-পুরোহিতের অভাব পূরণ করিবার শক্তি এখন তাঁহাদের নাই। দৈন্যের তাড়নায় যাজনিক ক্রিয়াকর্মও প্রায় লোপ পাইতেছে। এই জন্য এই ব্রাহ্মণশ্রেণীর দুরবস্থা চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা এখন জীবিকানির্বাহের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। পল্লীগ্রামের বৈদ্য কায়স্থ প্রমুখ ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই সামান্য বেতনে চাকরি করিয়া পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করেন। ইঁহারা সোনা-রূপোর অলঙ্কার ও পিতল কাঁসার বাসনাদি বিক্রয় করিয়া এপর্যন্ত কোনরকমে পরিবারবর্গকে বাঁচাইয়াছেন। এখন অনশনে অর্ধাশনে ও রোগে জর্জরিত হইয়া প্রায় সকলেই মৃত্যুর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অনেক দিন হইতেই পল্লীর তাঁতি কামার কুমার মালাকার নাপিত ছুতার মালী মাঝি জেলে কাপালী বাকালী মুচী প্রভৃতি অনুন্নত জাতির জাতীয় বৃত্তি বিনষ্টের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। ফলে ইহারা ক্রমেই দারিদ্র্যের অতলগর্ভে নিজ্জিত হইতেছিল। দুর্ভিক্ষের দৌরাত্ম্যে এই সকল জাতির প্রায় সকলেরই জাতীয় বৃত্তি লুপ্ত হওয়ায় ইহাদের জীবনযাত্রানির্বাহের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে। যখন চালের মূল্য কল্পনাতীত আকার ধাবণ করিয়াছিল, তখন ইহাদের অধিকাংশই ব্যবসার যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, চালের টিন—এমন কি ঘরবাড়ী পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া ভিক্ষাপাত্র-হস্তে সপরিবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পল্লীর মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র কৃষক শ্রমজীবী গাড়োয়ান জোলা কারিকর মাঝি নিকারী প্রভৃতিও ঐ সর্বহারাদের দলভুক্ত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের দুরন্ত প্রকোপের সময় এই শ্রেণিগুলির হিন্দু-মুসলমান খাইতে না পাইয়া যেখানে সেখানে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় দলে দলে মরিয়াছে। গ্রামে ভিক্ষা না পাইয়া ইহাদের মধ্যে অনেকে শহরে গিয়াছিল, এখন শহর হইতে বিতাড়িত হইয়া পুনরায় গ্রামে আসিয়াছে। এই শ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক নরনারী সরকারী রিলিফ ক্যাম্পে এবং অনাথ বালক-বালিকা সরকারী অনাথালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। শহরের ও গ্রামের অন্নসত্র, রিলিফ-কেন্দ্র ও দুঃস্থ হাসপাতালগুলিতে প্রধানতঃ ইহারাই ভিড় জমাইত। এখন অধিকাংশ অন্নসত্র ও রিলিফ-কেন্দ্র বন্ধ হইয়াছে। দীর্ঘকালের অনাহারে ও অর্ধাহারে এবং ম্যালেরিয়ার আক্রমণে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় ইহাদের কর্মক্ষমতাও লোপ পাইয়াছে। এজন্য আমন ধান কাটার সময় মজুর-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক স্থানে অস্বাভাবিক মজুরি দিয়াও মজুর পাওয়া যায় নাই। অনেকে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও আমন ধান কাটার সময় অতি কষ্টে কিছু কিছু কাজ করিয়াছে কিন্তু এখন আর ইহারা কোন কাজ পাইতেছে না। ইহাদের জীবিকার্জনের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। শ্রীমতী এলা রীড বিবৃতি দিয়াছেন ঃ "সরকারী লঙ্গরখানাগুলি বন্ধ হইয়াছে, ফলে গ্রামের মেয়েরা ক্ষুধার তাড়নায় এক মুষ্টি অন্নের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইতেছে। চাঁদপুরে নৌকা বোঝাই করিয়া মেয়ে আনিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। এই সমস্ত মেয়ের মধ্যে অধিকাংশর বাড়ী যশোহরে। শুধু এই স্থানেই নহে—চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার অবস্থাও অনুরূপ। ইহার ফলে দেশের সমাজ-জীবন ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই অধঃপাতের হাত হইতে বাংলার নারীসমাজকে বাঁচাইবার জন্য আমি সকল জন-প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করিতেছি।" (প্রবাসী, মাঘ ১৩৫০, ৩১৯। ৩২০ পৃষ্ঠা)।

গ্রামের মধ্যবিত্ত—বিশেষ করিয়া দরিদ্র অনুন্নত-শ্রেণীর মধ্যে যাহারা দুর্ভিক্ষের কবল হইতে এ পর্যন্ত অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহারও প্রায় সকলেই এখন সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত প্রভৃতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে ধনবানদের প্রায় সকলেই শহরে আসিয়াছেন, কিন্তু গরীবদিগকে পল্লীতে থাকিয়াই রোগে মরিতে হইতেছে। এবার বাংলা দেশের সর্বত্র অতি মারাত্মক ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে। বাংলার স্থানে স্থানে কলেরা ও বসন্ত প্রভৃতির তীব্রতাও খুব বেশি দেখা যাইতেছে। দুর্ভিক্ষের ফলেই যে এই সংক্রামক ব্যাধিগুলি ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিবাব সুযোগ পাইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি একদল মেডিক্যাল ছাত্র নদীয়া জেলার নানাস্থান পরিভ্রমণ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের চিকিৎসা করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন ঃ 'এই জেলার অনেক গ্রামের শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে অর্ধেক লোক এখনও শয্যাশায়ী। ইহা ছাড়া কলেরা ও বসন্ত প্রভৃতি রোগেও বহু লোক মরিতেছে।' শুধু নদীয়া জেলায় নয়, বাংলার প্রায় সকল জেলারই এই একই অবস্থা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, এক মাত্র ঢাকা শহরেই গত নবেম্বর মাসে ৪০,৭০৪ জন নূতন ম্যালেরিয়া রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার মিঃ পি আর দাশ জানাইয়াছেন ঃ 'কয়েক মাস পূর্বে অনাহারে বাংলার যত লোক মরিয়াছে, বর্তমানে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে উহা অপেক্ষা অনেক বেশি লোক মরিতেছে।' দীর্ঘকাল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পল্লীর অধিকাংশ লোকের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে। এজন্য ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির

আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি তাহাদের একেবারেই নাই। এই সকল সাংঘাতিক সংক্রামক ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইলেও নিদারুণ দৈন্যের জন্য তাহারা উপযুক্ত চিকিৎসা এবং ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ম্যালেরিয়ার প্রধান প্রতিষেধক কুইনিন এখন এরূপ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য যে, দরিদ্র জনসাধারণের উহা ক্রয় করিবার উপায় নাই। ডাক্তার বেণ্টলির মতে বাংলায় বৎসরে তিন লক্ষ পাউণ্ড কুইনিন দরকার। স্বাভাবিক সময়েই যখন এরূপ কুইনিন আবশ্যক তখন বর্তমান অস্বাভাবিক সময়ে যে উহা অপেক্ষা আরও বেশি প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে যে পরিমাণে কুইনিন বিতরণ করা হইতেছে উহা-দ্বারা দেশের আংশিক অভাবও পূর্ণ হইতেছে না। উপযুক্ত পথ্যের একান্ত অভাবে ভাল কুইনিনও ফলপ্রদ হইতেছে না। কোন দুঃস্থ ব্যক্তি ম্যালেরিয়াদ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে কুইনিন পথ্য ও মশারির অভাবে সে তাহার মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত এই রোগ বিস্তার করিয়া থাকে। কোন গ্রামের একজন দরিদ্র ব্যক্তির কলেরা বা বসন্ত হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা, সেবাশুশ্রূষা ও স্বাস্থ্যনীতি পালনের অভাবে উহা সংক্রামক আকার ধারণ করিয়া সেই গ্রামের সকল লোকের জীবন বিপন্ন করে। গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে দুঃস্থ হাসপাতাল স্থাপন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ ঔষধাদি বিতরণ করিয়া কতক দুর্গত রোগীর জীবনরক্ষা করিতেছেন বটে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নিতান্ত অপর্যাপ্ত। সমগ্র বাংলাদেশকে ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত প্রভৃতি দুরন্ত ব্যাধির প্রকোপ হইতে রক্ষা করিতে হইলে পর্যাপ্ত চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন ও ঔষধ-পথ্য দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আব সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন—দেশের খাদ্য-সংকট-সমস্যার সম্যক্ সমাধান। জন-সাধারণের আর্থিক দুর্গতিই দেশময় ব্যাপক ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের প্রধান কারণ। পণ্ডিত কুঞ্জরু সত্যই বলিয়াছেন ঃ 'খাদ্য-পরিস্থিতি সন্তোষজনক না হইলে ম্যালেরিয়া বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধিকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হইবে না।'

বাংলার ক্রিশ্যমান জনগণকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত কর্ম-প্রণালী অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক ঃ (১) নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল বস্ত্র ঔষধ প্রভৃতির মূল্য জনসাধারণের ক্রয়শক্তির মধ্যে নামান। (২) জীবনরক্ষার উপযোগী খাদ্যাদি ক্রয় করিবার শক্তি যাহাদের নাই, তাহাদের সেই শক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে বিনামূল্যে খাদ্যাদি এবং শিশুগণকে দুগ্ধ দান। (৩) দরিদ্র রুগ্ন ব্যক্তিগণের জন্য গ্রামের প্রত্যেক ইউনিয়নে দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন। (৪) যাহারা অন্নবস্ত্রের অভাবের তাড়নায় জমি ও ভিটাবাড়ী বিক্রয় করিয়াছে, তাহাদিগকে ঐ সকল প্রত্যর্পণ। (৫) দুস্থিত কৃষক শ্রমিক তাঁতি জোলা ছুতার মাঝি জেলে গাড়োয়ান প্রভৃতিকে তাহাদের স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা পরিচালনের উপযোগী দ্রব্যাদি দান। (৬) যাহাদের জীবিকার্জনের কোন উপায় নাই, তাহাদিগকে কৃষি, নানাবিধ কুটির-শিল্প, কচুরিপানা অপসারণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, রাস্তা-নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রানির্বাহের উপায় বিধান। (৭) নিরাশ্রয় বালক-বালিকাগণকে অনাথ আশ্রমে রাখিয়া সাধারণ ও কার্যকরী শিক্ষাপ্রদান।

গবর্ণমেণ্টের সহায়তাভিন্ন বাংলার নব্বই হাজার গ্রামে এইরূপ পুনর্গঠনকার্য করা কোন সেবা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তথাপি কেবল গবর্ণমেণ্টের উপর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকাও দেশবাসীর পক্ষে সমীচীন নয়। বাংলাদেশের বর্তমান দুর্দশা দূর করিতে হইলে বাঙালী জাতিকেই সংঘবদ্ধভাবে এই পুনর্গঠন-প্রণালী কার্যে পরিণত করিবার জন্য

অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। এখন আমাদের বিশেষ ভাবে বোঝা দরকার যে, বাংলা দেশের বর্তমান দুর্গতি সাধারণ নয়, ইহা অতিশয় অসাধারণ এবং ইহার বিষময় পরিণতি সুদূরসম্প্রসারী। বাংলায় এরূপ ব্যাপক দুরবস্থা আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। বাঙালী অন্নবস্ত্রের ঐকান্তিক অভাবে এবং মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে অসহায় ভাবে এরূপ জীবন-মরণের সমস্যায় আর কখনও পতিত হয় নাই। বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির ফলে বাঙালী জাতির ধর্ম নীতি সমাজ অর্থনীতি স্বাস্থ্য সভ্যতা সংস্কৃতি প্রভৃতি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে। বাঙালী জাতি সত্য সত্যই আজ ধ্বংসোন্মুখ। কাজেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া সময় থাকিতে ইহার প্রতিকারের জন্য বাঙালী জাতিকেই সংঘবদ্ধভাবে পুনর্গঠন-কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন বাংলার দুর্গতি অবসানের অন্য কোন উপায় নাই।

(চৈত্র ১৩৫০)

প্রবাসী

বিবিধ প্রসঙ্গ

খাদ্য সমস্যা

দেশে শুধু যে চাল ও ময়দার দাম বেড়েছে তা নয় ; নুন, চিনি, গুড় প্রভৃতির দাম ত বেড়েইছে, সাধারণ শাকসবজীর দামও খুব বেড়েছে। গবর্ন্মেণ্ট দেশস্থিত এবং বিদেশ থেকে এদেশে আনীত সৈন্যদের আহার্য্য যোগাচ্ছেন এবং বিদেশে যে-সব সৈন্য আছে তাদের জন্যও খাদ্য পাঠাচ্ছেন। অন্যদিকে বিদেশ থেকে যত খাদ্যদ্রব্য আমদানী হ'ত, তার আমদানী খুব কমে গেছে। এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে খাদ্য আমদানী রপ্তানী খুব সীমাবদ্ধ হয়েছে। এই সব কারণে সব খাদ্যদ্রব্যের দাম খুব বেড়ে গেছে, এবং বেশী দাম দিয়েও অনেক জিনিস পাওযা যাচ্ছে না। এ অবস্থার উদ্ভবের জন্য গবর্ন্মেণ্ট অনেক অংশে দায়ী। সুতরাং প্রতিকারও গবর্ন্মেণ্টকে খুব অবহিত হয়ে সহানুভূতির সহিত করতে হবে। শুধু মূল্য নিয়ন্ত্রণ করলে চলবে না ; দেখতে হবে সেই দামে লোকে জিনিস পাচ্ছে কিনা। দেখতে হবে প্রত্যেক স্থানে যথেষ্ট খাদ্য আছে কিনা ; না থাকলে আমদানী করতে ও করাতে হবে, উৎপাদন করাতে ও করতে হবে।

এই সঙ্কট অবস্থায় খাদ্য-ব্যবসাদারদেরও বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। তাঁরা অবশ্য লোকসান দিয়ে জিনিস যোগাতে পারেন না। কিন্তু অতিরিক্ত লাভের আশা তাঁদের ছেড়ে দেওয়াই উচিত। বণিকের একটি প্রতিশব্দ "সাধু"। প্রকৃত বণিক যাঁরা, সাধুতা তাঁদের ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ামক।

সেকালে সাধারণ গৃহস্থের ভিটায় ২/৪ হাত জমি থাকলেও তাতে নানারকম তরকারির গাছ লাগান হ'ত। যারা এই সাবেক চাল বজায় রেখেছেন, তরকারির দুর্মূল্যতা এখন তাঁদের কম গায়ে লাগবে। অন্য গৃহস্থেরা এঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে লাভবান হবেন।

(শ্রাবণ ১৩৪৯)

অন্নবস্ত্রের কথা

কলিকাতায় মাঝারি চাউল দশ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে। বাংলার প্রায় সর্ব্বত্র এই অনুপাতে চাউলের দর চড়িয়াছে। গত ফসলে ধান্য প্রচুর জন্মিয়াছিল। সুতরাং এই সময় চাউল দুর্ম্মূল্য হইবার কথা নহে। যে সময়ে দর চড়িল তাহাতে কৃষক লাভবান হইবে না, কয়েকজন ব্যবসায়ী মোটা টাকা পাইবে, আর যাহারা কিনিয়া খায় এরূপ অগণিত লোকের অসীম কষ্ট হইবে। হঠাৎ বাজার হইতে বহু চাউল চলিয়া না গেলে বর্ত্তমান অবস্থার উদ্ভব হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনা

গিয়াছিল বাংলা-সরকার বহু চাউল ক্রয় করিতেছেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের এক বিবৃতি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যে জেলায় চাউল প্রয়োজনের অধিক ছিল সেখানে পাছে শত্রু আসিয়া উহা অধিকার করে সেজন্য সরকার উহা কিনিয়া লইবেন এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকার যদি এরূপ করিতে যাইয়া চাউলের দর চড়াইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীতে ভুল হইয়াছে বলিতে হইবে ; কারণ এক জায়গার প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল অন্য জায়গায় ছাড়িয়া দিলে দর সর্ব্বত্র বেশী থাকিতে পারে না। তাঁহারা যদি চাউল কিনিয়া ধরিয়া রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অবিলম্বে উহার সমস্ত বা অধিকাংশ বাজারে বেচিয়া দেওয়া উচিত। ভারত সরকার যদি বিদেশে পাঠাইবার জন্য (যাহার কথা স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস কিছুদিন পূর্ব্বে অন্য খাদ্য প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন) প্রচুর চাউল কিনিয়া থাকেন তাহা হইলেও তাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কারণ এই সময়ে প্রজাকে খাওয়ার কষ্ট দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। জাপান আসামের সীমান্তে অবস্থান করিতেছে। তাহার পক্ষে আসাম ও বঙ্গদেশ আক্রমণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব একথা কেহই বলিতে পারেন না। ব্রহ্মদেশে শতকরা দশ জন বর্ম্মী জাপানীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল ইহা সেনাপতি আলেকজান্ডার বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের নেতারা একবাক্যে বলিতেছেন, নূতন জাতির পরাধীন হওয়া আমাদের আত্মসম্মানের হানিজনক। যাহাতে সাধারণ লোক অবর্ণনীয় কষ্ট পাইয়া ক্রীতদাস সুলভ মনোভাব অবলম্বন না করে তাহা দেখা সরকারের ও দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের কর্ত্তব্য। দেশে প্রচুর খাদ্য জন্মাইল অথচ লোক সরকারী কার্য্যের ফলে কষ্ট পাইবে কেন? যে-সরকার এইরূপ কার্য্য করেন তাঁহারা কি নিজেদেরই ক্ষতি করেন না? বিলাতে মন্ত্রী স্যার কিংসলী উড কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, প্রধান খাদ্যগুলির মূল্য যুদ্ধ ঘোষণার সময়ের তুলনায় কমিয়াছে ও বাড়ীভাড়া পূর্ব্ববৎ আছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনেও কি এখানকার সরকার শাসন প্রণালীর মূল নীতিগুলি উপেক্ষা করিয়া চলিবেন?

মোটা কাপড়ের দর দশ হাত ধুতি সাড়ে চারি টাকার উপর হইয়াছে। এবিষয়ে সরকার অনেক কিছু করিতে পারিতেন, করিলেন না। তবে কাপড়ের ব্যাপারে আমরা সস্তা দরে তুলা কিনিয়া, চরকা চালাইয়া, তন্তুবায়কে দিয়া কাপড় বুনাইয়া নিজেদের কষ্ট লাঘব করিতে পারি। যেখানে সম্ভব সেখানে স্বাবলম্বনই শ্রেয়ঃ ও জাতির পক্ষে আত্মসম্মানজনক। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯।—শ্রী সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

(আশ্বিন ১৩৪৯)

বাংলা দেশের অন্নবস্ত্র সমস্যা

বাংলা দেশের অন্নবস্ত্র সমস্যা ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। দরিদ্র জনসাধারণকে ডাল-ভাত দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যিনি প্রধান মন্ত্রীর মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, বেগতিক দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের প্রথম অর্থসচিব বর্তমানে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবের মসনদে সমাসীন হইয়া খাদ্য-সমস্যার সমাধানের আশা দেশবাসীকে দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ছয় মাস পূর্বে তিনি ঐ বিভাগেব ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে খাদ্য-দপ্তর মারফৎ সরকারী প্রয়োজনে ফসল সংগ্রহের জন্য যে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে তিনি তাহার ভার গ্রহণ করায় সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে।

প্রথমে চাউলের অবস্থা কি দেখা যাউক। ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে, অর্থাৎ ঠিক দুই বৎসর পূর্বে, বালাম চাউলের পাইকারী দর ছিল মণ প্রতি ৫৶ ;১৯৩৯-এর আগস্টে ঐ চাউলের দর ছিল ৩৳। ১৯৪০-৪১-এ দেশে চাউল উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ কম হইয়াছিল, এত কম চাউল ইহার পূর্বে বহু বৎসর উৎপন্ন হয় নাই, তৎসত্ত্বেও চাউলের দর ৫ টাকার উর্দ্ধে যায় নাই। ১৯৪১-৪২ সালে ব্রহ্মদেশের চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে, সিংহল এবং মধ্য-এশিয়ায় বহু চাউল রপ্তানী হইয়াছে। ফলে ইহার পর চাউলের দর বাড়িয়া ৯।১০ টাকা মণ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বর্তমান বৎসরে ফসলের যে অবস্থা দেখা যাইতেছে এবং সরকারী প্রয়োজনে যে হারে অবাধে চাউল ক্রয় ও উহা ভারতের বাহিরে প্রেরণ চলিতেছে তাহাতে আগামী বর্ষে দেশে ব্যাপক ভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে। সরকারী বিবরণে প্রকাশ, গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ কম হইবে। এই হিসাব প্রকাশিত হইবার পর প্রবল ঝড়ে ও বন্যায় মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বহু স্থানের ফসল নষ্ট হইয়াছে। ফলে এবার গত বৎসরের তুলনায় দশ আনার বেশী ধান আশা করা অন্যায়।

(পৌষ ১৩৪৯)

বাংলায় চাউলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ

মাসখানেক যাবৎ চাউলের দর অত্যন্ত দ্রুত বাড়িতেছে এবং বর্তমানে মোটা চাউল পর্য্যন্ত ১৫ টাকার কম পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে দেশে নূতন নূতন লোক আসিবার ফলে চাউলের চাহিদা চারি আনা পরিমাণ বাড়িয়াছে, এবং প্রাপ্য চাউলের পরিমাণ প্রায় আট আনা কমিয়াছে। গত কয়েক মাসে ভারত-সরকার প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করায় বাজারে চাউলের অভাব ঘটিয়াছে, তদুপরি সিংহলে ও মধ্য-এশিয়ায় অত্যধিক পরিমাণে চাউল রপ্তানী চলিতেছে। ইতিমধ্যে এক সিংহলেই প্রায় দেড় লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী হইয়া গিয়াছে এবং কোচিনে আরও প্রায় লাখ-দেড়েক মণ পাঠাইবার আয়োজন চলিতেছে। চাউলের মূল্য বৃদ্ধির দায়িত্ব কৃষক এবং ছোট ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে চাপাইয়া গবর্মেণ্ট বলিতেছেন যে মজুত চাউল টানিয়া বাহির করিবার আয়োজন হইতেছে এবং উহা এত নিগূঢ় ভাবে হইবে যে প্রকাশ্যে উহা লইয়া আলোচনা করা চলে না। মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ ইহা নহে। উহার কারণ দেশে এ বৎসরের জন্য ফসল উৎপন্ন হইয়াছে কম, ভাত খাওয়ার লোক বাড়িয়াছে, আমদানী বন্ধ এবং ইহার উপর সরকার মধ্য-এশিয়ায় এবং সিংহলে পাঠাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল এই স্বল্প পরিমাণে উৎপন্ন ফসল হইতেই ক্রয় করিয়া লইতেছেন।

(পৌষ ১৩৪৯)

সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ

আমাদের এই আশঙ্কার কারণ আছে।* প্রথমতঃ, সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা জনসাধারণের

* পৌষ ১৩৪৯ সংখ্যাতেই 'সিংহলে চাউল রপ্তানী' শীর্ষক সংবাদে শেষ বাক্যে আছে "চা, কোকো, রবার প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদনে বিলাতী বণিকদের স্বার্থ আছে এবং ঐ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্যই নিজের দেশের লোককে

স্বার্থ রক্ষার দিক দিয়া একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে অথচ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেতাত্মা ইউনাইটেড কিংডম কমার্সিয়াল কর্পোরেশন যথারীতি নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই মাল ক্রয় করিতেছে। সুতরাং কাহাদের স্বার্থে পণ্য-মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পরিচালিত হইতেছে তাহা কতকটা বুঝা যায়। ভারত-সরকার একটি খাদ্য বিভাগ খুলিয়া জানাইয়াছেন যে উহা ফসলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং উহার সরবরাহের বন্দোবস্ত করিবে এবং সৈন্যদের জন্য সরবরাহ বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগ যে ফসল ক্রয় করিত অতঃপর সেই কার্য্যের ভারও এই নূতন খাদ্য বিভাগের উপর অর্পিত হইয়াছে। এই নবগঠিত বিভাগ অতঃপর প্রদেশে ডালপালা বিস্তার করিবে ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন এই, কাহার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই "নিয়ন্ত্রণ কার্য্য" চলিবে? বাণিজ্য-সচিব নিজেই এ সম্বন্ধে দুইটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। বোম্বাইয়ে ভারতীয় বণিক সমিতির সভায় তিনি জানাইয়াছেন যে সৈন্যদল এবং ফসলক্রয়কারী প্রদেশসমূহের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ক্রয়ে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্যই কার্য্যতঃ খাদ্য বিভাগ গঠিত হইয়াছে। ঐ সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে কৃষকগণ যাহাতে আরও বেশী করিয়া তাহাদের মজুত ফসল ছাড়িয়া দিতে উদ্বুদ্ধ হয় তাহার জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তিনি সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন এবং ঐ সব ব্যবস্থার কথা তিনি প্রকাশ্যে বলিয়া দিবেন, ইহা যেন কেহ আশা না করেন। গবর্মেণ্ট এত দিন প্রজাদের প্রকাশ্যে "ভালো" করিয়া তাহাদিগকে যে অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করিয়াছেন তাহাতে বাণিজ্য-সচিবের "গোপনে ভালো" করিবার নামে শুধু কৃষককূল কেন, দেশবাসী ৪০ কোটি লোকেরই আঁৎকাইয়া উঠিবার কথা। এবার ফসলই হইয়াছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, তার উপর আমদানী নাই, কিন্তু অতিরিক্ত নানাবিধ চাহিদা আছে। ইহা বুঝিয়া বেশী টাকার লোভে চাউল বেচিয়া ফেলিলে বৎসরান্তে ২৫্ টাকা মণেও উহা জুটিবে না এই আশঙ্কায় কৃষকেরা সম্বৎসরের ধান মজুত রাখিলে তাহাদিগকে অবশ্যই দোষ দেওয়া যায় না।

বাংলা দেশের ধান বাংলার বাহিরে যাইতে পারিবে না এই আদেশ দিয়া জনসাধারণকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তও না করিয়া ভারত-সরকার আবার এক নূতন বিভাগ খুলিয়া সৈন্যদল ও অন্য প্রদেশের জন্য কৃষকদের খোরাকী ধান টানিয়া লইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন এবং এই শুভকার্য্যে স্বয়ং ভারত-সচিব আমেরী সাহেবেরও যে হাত আছে বাণিজ্য-সচিব মহাশয়ই তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে সরকারী দপ্তরখানায় এক সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, দেশে খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ভারত-সচিবকে সর্ব্বদা সংবাদ দেওয়া হইতেছে, দেশে খাদ্য-সমস্যার সমাধান কি ভাবে হইতে পারে তাহা দেশবাসী বুঝে না, জনসাধারণের প্রতিনিধিরা বুঝেন না, বণিক-সমিতিগুলি বুঝেন না—বুঝেন শুধু ভারত-সরকারের দপ্তরখানার তিন-চারি জন সিভিলিয়ান ; আর দেশের নিজস্ব এই সমস্যার সমাধান দেশের লোকে করিতে পারে না, করিয়া দিবেন ছয় হাজার মাইল দূর হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক ব্যক্তি—যেহেতু তিনি ভারত-সচিবের গদীতে কয়েক বৎসর যাবৎ অধিষ্ঠিত আছেন—এত বড় আশা ভারতবাসীর নিকট অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইবে। ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক দেশও নয়, স্বাধীনও নয় ;এখানের অন্নবস্ত্র সমস্যায় ঐরূপ সরকারী হস্তক্ষেপের অর্থ বিলাতী বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য রক্ষণশীল দলের চাপে ব্রিটিশ

অনাহারে রাখিয়াও ভারত-সরকার সিংহলবাসীদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন কিনা"—এমন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

গবর্নেন্টের ইঙ্গিতে ভারত-সরকার কর্ত্তৃক প্রদেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় হস্ত প্রসারণ,—এই ধারণাই বরং দেশবাসীর মনে বদ্ধমূল হইবে।

খাদ্য সমস্যার সমাধান এমন ভয়ানক কিছু নয়। আসন্ন দুর্ভিক্ষ বাঁচাইবার জন্য বাংলার চাউল বাহিরে রপ্তানী অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিয়া, অন্যান্য প্রদেশের জন্য অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও আমেরিকা হইতে গম আমদানী করিয়া এবং আগামী বৎসর ফসলের চাষ বৃদ্ধির জন্য কলিকাতায় পোষ্টার আঁটিয়া ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের প্রহসন না করিয়া গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে বীজ ধান ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষি ঋণ দিয়া চাষে সাহায্য করিয়া গবর্নেন্ট এখন হইতেই সচেষ্ট হইতে পারেন। এ বৎসর ধানের দাম বাড়িবে কৃষকেরা তাহা জানিত, তথাপি কেন তাহারা চাষ বাড়াইতে পারে নাই তাহার কারণও অবিলম্বে অনুসন্ধান করা আবশ্যক এবং সেই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য এখন হইতেই উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয় সে ভরসায় না থাকিয়া আগামী বৎসর যাহাতে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় তাহার জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং বণিক-সমিতিসমূহের তরফ হইতেই চেষ্টা হওয়া কর্ত্তব্য।

(পৌষ ১৩৪৯)

চাউল ও বস্ত্র লুণ্ঠন

সংবাদপত্রের নিষ্পেষিত ক্ষীণ কণ্ঠ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে চাউল ও বস্ত্র লুণ্ঠনের যে-সব সংবাদ আসিতেছে তাহা বস্তুতঃই আশঙ্কার বিষয়। নূতন ধান উঠিবার পর সাধারণতঃ যে চাউলের দর পাঁচ টাকা মণ থাকে, এখনও তাহা চৌদ্দ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। বৎসরান্তে এবার চাউলের দর ত্রিশ টাকার কোঠায় পৌঁছিলেও অবাক হইবার কারণ থাকিবে না। বস্ত্রের অবস্থাও সঙ্গীন। স্টাণ্ডার্ড ক্লথের বিজ্ঞাপন চলিতেছে, বাহির হইলেও উহার কয় জোড়া বাজারে আসিবে তাহাও দ্রষ্টব্য। চাউল ও গমের ব্যাপারে গবর্নেন্ট বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই ;বস্ত্র-সমস্যা সমাধানেও যে তাঁহারা উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারিবেন এতটা ভরসা দেশবাসী আর করিতে পারিতেছে না। চাউল ও বস্ত্র লুণ্ঠন এবং চুরি ডাকাতি বন্ধ করিবার জন্য সৈন্য পুলিসের উপর নির্ভর করা বৃথা। ইহার অর্থনৈতিক সমাধান করিতে না পারিলে কঠোর দণ্ডসত্ত্বেও এই সব চুরি ডাকাতি বন্ধ হইবে না ;এবং গ্রামাঞ্চলে শান্তি রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।

(মাঘ ১৩৪৯)

বাংলার বাজেট

প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৯৪৩-৪৪-এর বাজেট পেশ করিয়াছেন। বাজেটে এবার সাড়ে চার কোটি টাকা ঘাটতি দেখা গিয়াছে। এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য হক সাহেব কেন্দ্রীয় গবর্নেন্টের নিকট হইতে প্রায় ৪ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কয়েকটি কর বৃদ্ধি করিয়া ৩৩ লক্ষ টাকা তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকারের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে, বাজেট-বক্তৃতায় হক সাহেব তাহার কতকটা ইঙ্গিত দিয়াছেন, সবটা বলেন নাই। ভারতবর্ষের পূর্বসীমান্ত রক্ষার জন্য যে-সব সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, বাংলা হইয়াছে তাহার

কেন্দ্র। রেল ও নদী পথে সৈন্য ও সমরসম্ভার চলাচল অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে যাত্রীচলাচল ও পণ্য-চালান অনেক কমিয়া গিয়াছে। পণ্য-চালানের এই দুটি প্রধান উপায়ই শুধু যে বন্ধ হইয়াছে তাহা নহে, পেট্রোলের অভাবে লরী এবং জাপ-আগমনের আশঙ্কায় সরকারী আদেশে নৌকা বন্ধও হইয়াছে। ইহার উপর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উপর ভারতরক্ষা-আইনের ফলে সহস্রবিধ বাধানিষেধ আরোপিত হওয়ায় বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক জীবনে সরবরাহ ও চাহিদার মুল নীতি পরিত্যক্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের অপারিহার্য পরিণাম অতিলোভী ধনী ব্যবসায়ীদের সুবিধা। এক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। অর্থনৈতিক জীবনে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ সোভিয়েট রাশিয়ায় সম্ভব; সেখানকার লোকেরা স্বাধীন, দেশবাসীর পরিপূর্ণ সম্মতির উপর সোভিয়েট রাষ্ট্রের বনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে দালাল নাই, অতিলোভী ধনী নাই, দেশী বা বিদেশী কায়েমী স্বার্থ নাই এবং গবর্ন্মেণ্টের একমাত্র লক্ষ্য দেশবাসীর মঙ্গল সাধন। পৃথিবীর সকল দেশেই এই যুদ্ধে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে, কিন্তু রাশিয়া হইতে এখনও পর্য্যন্ত ইহার একটিরও সংবাদ আসে নাই। হক সাহেব তাঁহার বাজেটে ডিরেক্টরেট অফ সিভিল সাপ্লাইকে লক্ষ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, হাইকোর্টের জজ এবং পাকা ব্যাঙ্কারকে আনিয়া উহাকে "শক্তিশালী" করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণ এই শক্তি বৃদ্ধির প্রথম ফল পাইয়াছে চাউলের মূল্য ১৫ হইতে ২২।৷০ টাকায় বৃদ্ধি ! বাজেট-বক্তৃতায় হক সাহেব শান্তির ও যুদ্ধ-সময়ের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টরেট যে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সহজ করিতে পারিবেন, সহস্র বার স্কীম পরিবর্তন করিলেও তাঁহার এ আশা দুরাশাই থাকিয়া যাইবে। কায়েমী স্বার্থ ও অতিলোভী বণিকসমাকুল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘাড়ে সমাজতান্ত্রিক কায়দায় নিয়ন্ত্রণ চালাইতে গেলে উহার পরিণাম শোচনীয় হইতে বাধ্য।

কিন্তু এই অন্নহীন বস্ত্রহীন বাঙালী জনসাধারণের নিকট হইতে রাজস্বের যে টাকাটা আদায় হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে ঘাটতি তো পড়েই নাই, বরং ১৪ লক্ষ টাকা বেশী করই হক সাহেব আদায় করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। পাটের দর নাম মাত্র, ধান যাহা হইয়াছে তাহাতে বহু স্থানের কৃষকদের সম্বৎসরের খোরাকী চলিবে না, ১৫ টাকা দরে মফস্বলে চাউল বিক্রয় এখনই সুরু হইয়া গিয়াছে, বস্ত্রের মূল্য চতুর্গুণ, এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও হক সাহেব রাজস্ব আদায় কম পড়িতে দেন নাই ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আপাতদৃষ্টিতে বাজেট দেখিলে মনে হইবে বুঝি রাজস্ব-আদায়ে ঘাটতি পড়িয়াছে, কিন্তু হিসাবটা একটু ভাল করিয়া দেখিলেই উহার ফাঁকি ধরা পড়িবে। ১৯৪১-৪২ সালে রাজস্ব আদায় হইয়াছে ১৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ; ১৯৪২-৪৩ সালের সংশোধিত বাজেটে ১৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা আদায় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে হক সাহেব ধরিয়াছেন ১৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা আদায় হইবে। গত দুই বৎসর পূর্ব-বৎসরের উদ্বৃত্ত এবং আদায়ীকৃত রাজস্ব অপেক্ষা রাজস্ব খাতে ব্যয় অধিক হইয়াছে, কিন্তু এবারকার এই ভীষণ দুর্বৎসরে রাজস্ব খাতে আয়ব্যয় সমান হইবে। বাজেটের মারপ্যাঁচ রহিয়াছে প্রাপ্ত ও প্রদত্ত ঋণের হিসাবের ভিতর।

রাজস্ব খাতে ব্যয়সঙ্কোচের স্থান নাই ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। মোটা বেতনের সরকারী

কর্মচারীদের রকমারি ভাতার মধ্যে কতকগুলিকে সঙ্কোচ করিলেই বহু লক্ষ টাকা অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে।

(চৈত্র ১৩৪৯)

চাউলের সরকার-নির্দিষ্ট মূল্য বাতিল

মোটা ও মাঝারি চাউলের যে-দর কলিকাতার বাজারের জন্য জুলাই মাসে নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলা-সরকার জানাইয়াছেন, চাউলের উর্দ্ধতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। কৃষক বা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার-নির্ধারিত দরে অতঃপর ধান ও চাউল ক্রয় করা হইবে না। গবর্ন্মেণ্ট বাজার দরেই ক্রয় করিবেন। বাংলা-সরকারের মতে নিজে প্রকাশ্য বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করিলে এবং অতিলোভী ব্যবসায়ীদের সংযত করিলে চাউলের মূল্য যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে নামিয়া আসিবে।

সরকারী হুকুমনামা পাঠ করিলে কিন্তু এই আশা ফলপ্রদ হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। আগামী ফসলের পূর্ব পর্য্যন্ত দেশবাসীর খোরাকীর জন্য কত চাউল বর্তমানে আছে তাহার সঠিক হিসাব জানান হইতেছে না, কত চাউল রপ্তানী হইয়া গিয়াছে এবং আগস্ট মাসের পূর্ব পর্যন্ত যে-সব চুক্তি করা হইয়াছে তদনুসারে আরও কত রপ্তানী বাকি আছে তাহা জানা নাই, কলিকাতার বাজারে আড়তদারদের হাতে এবং গবর্ন্মেণ্টের হাতে কত চাউল আছে তাহা বলা হয় নাই, এবং বিভিন্ন জেলা হইতে কলিকাতায় চাউল আমদানীর বাধা অপসারিত হয় নাই—এই সব কারণে মনে করা অসঙ্গত নহে যে সরকারের বর্তমান আদেশে অতিলোভী ব্যবসায়ীদেরই লাভ হইবে অধিক, ক্রেতাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। কলিকাতায় গবর্ন্মেণ্টের হাতে যে চাউল মজুত আছে তাহার পরিমাণ আড়তদারদের জানা থাকিলে এবং অতি লাভ করিতে গেলেই উহা বাজারে ছাড়িয়া দাম কমাইয়া দেওয়া হইবে—এই দুইটি তথ্য জানা থাকিলে তবেই কলিকাতার বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের বিনিময় হার-নিয়ন্ত্রণ ফাণ্ডের (Exchange Equalisation Fund) যেভাবে পরিচালনা করা হয়, সেই ভাবেই ইহার কার্য্য চলিতে পারে। এই সঙ্গে জেলা হইতে জেলান্তরে চাউল চালান সম্বন্ধে সমস্ত বাধানিষেধ এবং গ্রাম হইতে শহরে চাউল প্রেরণের জন্য সমস্ত আটক নৌকা ফিরাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা ক্রমেই দূর হইতেছে, সরকারী সামরিক মুখপাত্রেরাও ইহা স্বীকার করিবার পর নৌকা আটকাইয়া রাখিবার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। চাউলের মূল্য নামাইয়া আনিবার উপায় (১) সমস্ত রপ্তানী একেবারে বন্ধ করা, (২) উপরোক্ত উপায়ে কিছু চাউল গবর্ন্মেণ্টের হাতে মজুত রাখা, (৩) চালান সম্পর্কে সমস্ত বাধা প্রত্যাহার করা, (৪) কোন ব্যবসায়ী অতিলোভ করিতেছে বলিয়া ধরা পড়িলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা, এবং (৫) কোন সরকারী কর্মচারীর অযোগ্যতা অথবা দুর্নীতি ধরা পড়িলে, প্রেষ্টিজের মিথ্যা মোহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পদচ্যুত করা। সমগ্র সমস্যাটি ব্যাপকভাবে সমাধান না করিলে ক্রেতাসাধারণের কোন লাভ হইবে না, অতিলোভী ব্যবসায়ীদেরই সুবিধা হইবে এবং চাউলের দর আরও বাড়িবে।

(চৈত্র ১৩৪৯)

চাউল কোথায় যায়?

বাংলায় উৎপন্ন চাউলের একটা মোটা অংশ বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এবং দেশবাসীর দুরবস্থা দেখিয়াও বাংলা সরকার তাহা বন্ধ করিতেছেন না, এই ধরণের একটা প্রবল আশঙ্কা বাঙালীর মনে জাগিয়াছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরটি হইতে ব্যাপারটি মোটামুটি বুঝা যাইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরের সময়ে শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখার্জির প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার নবাব বলেন যে নভেম্বর মাসে প্রশ্নটি প্রেরিত হইবার পর এ সম্বন্ধে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে কৃষিবিষয়ক সংখ্যাতত্ত্ব যেভাবে রাখা হয় তাহাতে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নহে। গবর্মেণ্টের ইহাই আশঙ্কা ছিল যে সম্ভবতঃ শহরাঞ্চলে কোন কোন স্থানে বৎসরান্তে চাউলের অভাব ঘটিবে। ঐ সময়ে চাউল সরবরাহ করা যাহাতে সম্ভব হয় এজন্য গবর্মেণ্ট ধান ও চাউল ক্রয় করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত, শহরাঞ্চলে যাহাতে উত্তমরূপে চাউল সরবরাহ করা যায় তাহার উন্নত উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাঁহারা গবেষণা করিতেছেন।

মিঃ মুখার্জি ঃ অন্যান্য প্রদেশ ও দেশে কি পরিমাণ চাউল পাঠাইয়া সাহায্য করা হইবে বলিয়া গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে কথা দিয়াছেন?

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঢাকার নবাব ঃ আগামী বৎসরের চাউল প্রেরণ সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট কোন কথা দেন নাই।

খাঁ বাহাদুর মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ ধান ও চাউল ক্রয়ের পরিকল্পনাটি কি, এবং উহার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে?

ঢাকার নবাব ঃ অঙ্কের হিসাব আমার পক্ষে এখনই দেওয়া সম্ভব নহে। আমি নোটিশ চাই।

খাঁ বাহাদুর এম. হোসেন ঃ বাংলার চাউলের অভাব মিটাইবার জন্য গবর্মেণ্ট বাহিরের এজেণ্টদের সহিত চুক্তি করিয়া চাউল আমদানীর জন্য কোন চুক্তি করিয়াছেন কি?

ঢাকার নবাব ঃ আমাদের পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাহা আমরা করিয়াছি। বর্তমান অবস্থা বুঝাইবার জন্য আমি শীঘ্রই একটি বিবৃতি দিব।

মিঃ মুখার্জি ঃ এই বৎসরের ফসল চালান দেওয়া সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট কোন চুক্তি করিয়াছেন কি না তাহা আমি জানিতে পারি কি? গবর্মেণ্ট বলিতেছেন যে তাঁহারা আগামী বৎসরের চাউল সম্পর্কে কোন চুক্তি করেন নাই। আমার মনে হয় ইহাতে আউস ফসলের কথা হইয়াছে।

ঢাকার নবাব ঃ আগষ্ট মাসের পর হইতে কোন চুক্তি হয় নাই। আমি এই বিভাগের ভার গ্রহণের পূর্বে বহু চুক্তি করা হইয়া গিয়াছিল। এখন আর কোন নূতন চুক্তি নাই বলিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে চাউল রপ্তানী বর্তমানে হইতেছে না।

মিঃ ললিতচন্দ্র দাস ঃ বাংলা-সরকারকে না জানাইয়া কলিকাতার বন্দর হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী হইয়াছে এই কথা কি সত্য?

ঢাকার নবাব ঃ আমি ইহা জানি না। আমি নোটিশ চাই।

মিঃ দাস ঃ মন্ত্রী মহাশয় দয়া করিয়া বলিবেন কি যে সিংহলের জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল আগস্ট মাসের পূর্বে বাংলা দেশ হইতে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে এ কথা সত্য কি না?

ঢাকার নবাব ঃ কিছু চাউল রপ্তানী হইয়াছে বটে কিন্তু আমার মনে হয় উহার পরিমাণ খুব বেশী নয়।

মিঃ মুখার্জি ঃ গবর্ন্মেণ্ট কি জানেন যে শিপিং মিনিষ্ট্রির হুকুমনামা লইয়া কলিকাতা হইতে বৈদেশিক বন্দরে প্রচুর পরিমাণে চাউল রপ্তানী হইয়া গিয়াছে এবং বাংলা-সরকার ঐ সব হুকুমনামা বাতিল করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু জানানো পর্যন্ত হয় নাই?

ঢাকার নবাব বলেন যে তিনি নোটিশ চান এবং এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন।

অপর এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার নবাব বলেন যে ১৯৪২ সালে কলিকাতা হইতে বহু পরিমাণে ধান ও চাউল রপ্তানী হইয়াছে ইহা তাঁহাকে জানানো হয় নাই। তিনি অনুসন্ধান করিবেন।

মিঃ মুখার্জির অপর এক প্রশ্নে উত্তরে ঢাকার নবাব বলেন যে জাপানীদের হাতে যাহাতে না পড়ে সে জন্য যেসব চাউল ক্রয় করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ জানানো জনস্বার্থের খাতিরে উচিত নহে। এই মজুত চাউল হইতে মাঝে মাঝে স্থানীয় ঘাটতি পূরণের জন্য উহা দেওয়া হইয়াছে এবং গবর্ন্মেণ্টের অন্যান্য চুক্তি রক্ষা করিবার জন্যও পাঠান হইয়াছে।

বাংলা দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে চাউল কম উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও উহার মোটা অংশ বাহিরে গিয়াছে এবং এখনও যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে ইহাই প্রমাণিত হয়। জাপানী অভিযানের ভয়ে গবর্ন্মেণ্ট যে সব চাউল হস্তগত করিয়াছিলেন তাহার মোট পরিমাণ জানাইতে তাঁহাদের কুণ্ঠা রহস্যজনক। ইহা জানাইলে শত্রুর কি সুবিধা হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু ইহার ফলে সরকারের পক্ষে গোপনে চাউল রপ্তানীর পরিমাণ ধরা পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গত বৎসরের ধান ও চাউল হইতে অনেকটা রপ্তানী হইয়া গিয়াছে, এবারও যে ঐরূপ যাইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। পরিষ্কার প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দানে অক্ষমতা দেখিয়া সন্দেহ হয় বাংলার মন্ত্রীরা এই চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন নাই।

(চৈত্র ১৩৪৯)

বঙ্গদেশে আসন্ন দুর্ভিক্ষ

১৩৪৮ সালের ফাল্গুন মাসে প্রবাসীতে আমরা লিখিয়াছিলাম:—

"পাট চাষ গত বৎসর অপেক্ষা যাহাতে অধিক না হয় সে বিষয়ে তাঁহাদিগের (অর্থাৎ বাংলা সরকারের) অবিলম্বে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য একথা আমরা গত মাসের প্রবাসীতে বলিয়াছি। এই বিষয়ে তাঁহারা যদি অবহিত না হন তাহা হইলে আগামী ফসলে কেবল যে পাটের দর কম হইবে তাহা নহে, পরন্তু ধান্যের চাষ কম হওয়ায় ও ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর অসুবিধা থাকায় বঙ্গদেশে অন্নাভাব ঘটিতে পারে।"

ইহার কিছু পূর্ব্বে হক নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিমণ্ডল পাটচাষ পূর্ব্ব বৎসরের দ্বিগুণ করিয়া দেন। তাহার অব্যবহিত পরেই উক্ত মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটে ও হক-শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়। শেষোক্ত মন্ত্রিমণ্ডলকেই প্রধানতঃ উদ্দেশ করিয়া আমরা অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা এবিষয়ে কিছুই করেন নাই। অর্থনীতির নিয়মগুলি কোন মন্ত্রিমণ্ডলের খাতির রাখে না। আজ মোটে আড়াই মাস ধান কাটা হইয়াছে। ইহারই মধ্যে মোটা চাউল কলিকাতায় বাইশ টাকা আট

আনা মণ, বর্ধমান জেলার পল্লী অঞ্চলে কুড়ি টাকা ও বরিশাল জেলায় উনিশ টাকা। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রায় এই অবস্থা। আরও দুই মাস পরে দেশের কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা চিন্তা করিতে ভয় হয়। সরকার যদি বাহির হইতে চাউল, গম, জোয়ার প্রভৃতি আমদানী না করেন ও দেশবাসী যদি সারা বাংলায় আউশ ও বোরো ধান চাষের ব্যাপক প্রসার, পাট চাষের হ্রাস ও কৃষির উপযুক্ত এক হাত জমিও ফেলিয়া না রাখিয়া তাহাতে তরিতরকারির চাষ না করেন, তাহা হইলে কয়েক মাসের মধ্যেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পুনরাভিনয় ঘটিবে।—শ্রী সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

(বৈশাখ ১৩৫০)

মানুষ আমরা নহি ত মেষ

বরিশাল জেলা বাংলার ধানের গোলা বলিয়া এত দিন খ্যাত ছিল। সম্প্রতি এই জেলার এক সরকারী চাউল বিক্রয় কেন্দ্রে চাউল ক্রয় করিতে গিয়া এক ব্যক্তি ভিড়ের চাপে মারা গিয়াছে। কলিকাতায় সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে সারিবন্দী শত শত প্রতীক্ষমান নরনারীর দিকে তাকাইয়া দেখিলে মনে হয় সময়ের মূল্য বলিয়া যেন কিছুই আর নাই। জলে ঝড়ে প্রখর রৌদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া ইহারা কাহাকে আশীর্বাদ করে, সরকারী দপ্তরখানার বাঙালী সিভিলিয়ানরাও কি সেটা একবার শুনিয়া গিয়া গবর্ণরকে জানাইতে পারেন না? মালয় ও ব্রহ্ম কি এই শিক্ষাই দেয় নাই যে, মেরুদণ্ডবিহীন ও অশিক্ষিত বলিয়া যাহাদিগকে উপেক্ষা করা হয়, দেশরক্ষায় একদিন তাহাদেরও সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে? বাধ্যতামূলক সাহায্য ও সক্রিয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা উভয়ের পার্থক্য বুঝিবার সময় কি আজও আসে নাই?

(জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে হক সাহেবের বক্তৃতা

মৌলবী ফজলুল হক কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে এক বক্তৃতায় বাংলা দেশের খাদ্যসমস্যা কেমন করিয়া এত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে তাহার কারণ বর্ণনা করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি বরিশাল গিয়া সেখানকার অবস্থাও দেখিয়া আসিয়াছিলেন। বক্তৃতায় হক সাহেব বলেন, "নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহা পূর্ব্ববর্তী সরকারের দোষেই হইয়াছে বলিয়া একটা ধারণার সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং বলা হইতেছে যে বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতিবিধান করিতে আহ্বান করার পূর্ব্বে বর্ত্তমান সরকারকে পূর্ব্ববর্ত্তী সরকারের ভুলগুলি সংশোধন করিবার জন্য অন্ততঃপক্ষে এক বৎসর সময় দিতে হইবে।

"এই ভূয়া ধারণা দূর করিবার সময় আসিয়াছে। প্রথমতঃ পূর্ব্বে লক্ষণ দেখা গেলেও খাদ্যাবস্থায় সত্যকার সঙ্কট দেখা দেয় গত তিন মাস হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই অবস্থার উদ্ভব বন্ধ করিবার জন্য আমরা দৃঢ় চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের পথে বাধা ছিল প্রচুর এবং আমাদিগকে কায়েমী স্বার্থের কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। জনসাধারণের সমক্ষে সমস্ত বিষয় উপস্থাপিত করা আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করি। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসের এক সন্ধ্যায় সরকারী কার্য্যে দিল্লী যাইবার প্রাক্‌কালে গবর্ণর আমাকে ভারত সরকারের প্রস্তাবিত 'বঞ্চনা-নীতি'র কথা বলেন। এই

নীতি প্রয়োগের ফলে যে গুরুতর অবস্থা হইবে তাহার বিষয় আমি গবর্ণরকে জানাই। দিল্লী হইতে ফিরিবার পর আমাকে জানান হয় যে, গবর্ণরের আদেশক্রমে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমাকে আরও বলা হয় যে, জয়েণ্ট সেক্রেটারীকে বাখরখঞ্জ, খুলনা ও মেদিনীপুর হইতে বাড়তি চাউল সরাইয়া ফেলিতে বলা হইয়াছে। গবর্নর তাঁহাকে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলায় তিনি মির্জা আলি আকবর নামে এক ব্যক্তিকে ঠিক করেন। এই মির্জা আলি আকবর কে? এই ব্যক্তিকে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। দলিলপত্রাদি লওয়ার পর্য্যন্ত সময় তাঁহার হয় নাই। আমি এই সম্পর্কে সরকারের সলিসিটার ও এ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শ করি। তাঁহারা জয়েণ্ট সেক্রেটারীর কাজের নিন্দা করেন। তখন সাত আট জন এজেণ্টের মধ্যে কাজটি ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাদের অধিকাংশই খুব পরিচিত প্রতিষ্ঠান। ইহাদের মধ্যে মেসার্স ইস্পাহানি, দত্ত ভট্টাচার্য্য, মির্জ্জা আকবর, হাকিম কাসিম দাদা ও আদম হাজি পীর মহম্মদের প্রতিষ্ঠান ছিল। মফস্বলে ইহাদের কাজ সুরু হওয়ায়, জনগণের দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। পল্লী অঞ্চলে গিয়া ইহারা জনগণকে ধান ও চাউল বিক্রয় করিতে কার্য্যতঃ বাধ্য করেন। আমাকে বলা হয় যে, কোন কোন স্থানে তিন টাকা মণ দরে ধান কিনিয়া কলিকাতায় চৌদ্দ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হয়। চাউল লইয়াও অনুরূপ ফাটকাবাজি চলে। মফস্বলের অবস্থা সম্পর্কে যাঁহাদের কিছু জ্ঞানও আছে তাঁহারাই জানেন যে এজেণ্টের মারফৎ ক্রয় ব্যবস্থার ফলে জনগণের বৈষয়িক জীবন কার্য্যতঃ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর আসে নৌকা-বঞ্চনা-নীতি। আমাদের প্রতিবাদসত্বেও বাংলা হইতে চাউল রপ্তানী করা হয়। আজ আমাদের সম্মুখে যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহা যে অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের কাজের ফলেই হইয়াছে তাহা বুঝা মোটেই কঠিন নহে। এই দপ্তরের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা চলিবে না বলিয়া গবর্ণর জানাইয়া দেন। এই দপ্তরের কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা বা উহাতে হস্তক্ষেপ করা হইলে তাহা গবর্ণরের নিকট রিপোর্ট করিবার জন্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য আমরা এতটুকুও দায়ী নহি। সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করিলে বর্তমান অবস্থাটা যে আমাদের সৃষ্ট নহে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। সম্প্রতি আমি বাখরগঞ্জে সফর করিতে গিয়াছিলাম। পটুয়াখালিতে চাউল অবিশ্বাস্য রকম উচ্চ দরে বিক্রয় হইতেছে। গোটা বাংলার দশাও সাধারণভাবে পটুয়াখালির দশার অনুরূপ। মিঃ সুরাবর্দ্দী সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থার দোহাই পাড়িয়া আমি রাজনৈতিক সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা বক্তৃতা করি বা না-করি, মিঃ সুরাবর্দ্দী মন্ত্রী থাকুন বা না থাকুন, জনগণের ক্লেশের শেষ ত হইতেছে না। গবর্ণর ও তাঁহার মন্ত্রিসভাকে জানানো আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করি যে, বাংলার হাজার হাজার নরনারীকে দারুণ অন্নকষ্টে ও অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতে হইতেছে। সরকারের এজেণ্টরা মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বেও অতি উচ্চ মূল্যে ঝালকাটি ও নলচিঠিতে চাউল কিনিয়াছেন।

"সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সময় চাহিবার কোন অধিকার মন্ত্রিসভার নাই। যে সমস্ত শক্তির ক্রিয়ায় এই অবস্থা হইয়াছে তাহা তাঁহারা বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন। এই সব শক্তির সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য ছিল।"

ইহার পূর্ব্বে ইণ্টালী চিলড্রেন পার্কের সভায় হক সাহেব বলিয়াছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে

তিনি দেশের খাদ্যের পরিমাণ, আমদানীর সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টরেটে একটি সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ খোলা হইয়াছে।

সরকারি তথ্য অনুসারে বাংলায় যে ফসল মজুত থাকিবার কথা, আগামী শ্রাবণ মাসের পর তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে কি না ডিরেক্টরেটের সংখ্যাতত্ত্ববিদরা হিসাব করিয়া বলিতে পারেন কি? জাপানীদের আগমন-আশঙ্কায় স্যার জন হার্বাট কত চাউল সরাইয়াছিলেন এবং সে চাউল কোথায় আছে তাহার কোন হিসাব পাওয়া গিয়াছে কি? টাকাটার হিসাব পাওয়া যায় নাই এবং উহার উদ্ধারের উপায়ও নাই, হক সাহেবই ইহা জানাইয়াছেন। চাউলের বেলাতেও কি তাহাই ঘটিয়াছে?

(জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)

খাদ্যসচিবের বিবৃতি

নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলের খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর হইতেই একটির পর একটি বিবৃতি দিয়া জানাইতেছেন যে, "১৯৪১-৪২ সালের উদ্বৃত্ত শস্য হইতে এবং মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় যাহাতে খাদ্যশস্যের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার হয় তাহার জন্য এবং ভাতের বদলে অন্যান্য খাদ্য প্রভৃতি প্রচলনের যে সব ব্যবস্থা হইতেছে তাহার দরুণ এই বৎসর কোনরূপ ঘাটতি হইলে তাহা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইতে পারিবে। সুতরাং জনসাধারণ এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, পরিণামে খাদ্যশস্যের অভাব হইবে বলিয়া কোনরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই।" খাদ্যসচিবের এই উক্তির ভিতর অনেকগুলি যুক্তির ভুল রহিয়াছে। প্রথমতঃ ১৯৪১-৪২-এর ফসলের কোন অংশ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে অনেকে এক বেলা খাইয়া চাউলের খরচ বাঁচাইতেছে বলিয়া সুরাবর্দ্দী সাহেব কতকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে মোট চাহিদার কতটুকু অংশ বাঁচিয়াছে সেটা বোধ হয় হিসাব করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। তৃতীয়তঃ, ভাতের অন্য প্রকার খাদ্য ব্যবহারের যে পরামর্শ তিনি ও গবর্ন্মেণ্ট দিতেছেন তাহার ব্যবস্থাই বা কোথা হইতে হইবে? আটা মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও অকস্মাৎ এক সময় উহাও দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে।

খাদ্যসচিব ঐ বিবৃতিতেই বলিয়াছেন যে, "বর্তমান বাজারে যে উচ্চমূল্য রহিয়াছে তাহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই। কারণ ব্যবসায়ীগণ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক মূল্য নির্ধারিত করিতেছে। বহু ক্ষেত্রে মাল ডেলিভারী ছাড়াই কয়েক ধাপ মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়াছে।" সুরাবর্দ্দী সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন, যাহাতে মূল্য হ্রাস পাইয়া ন্যায়সঙ্গত পর্য্যায়ের হইতে পারে ও পুনরায় স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা চলিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গবর্ন্মেণ্ট প্রয়োজন হইলে সরকারী সর্ব্বোচ্চ মূল্যের পুনঃপ্রবর্ত্তন ও অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘোষণার পরও চাউলের দর সমান ভাবেই চড়িতেছে। চাউলের ফাটকাবাজদের মধ্যে এবার অধিকাংশই মুসলমান এবং লীগওয়ালা, সঙ্গে কিছু ইউরোপীয়ানও আছে। অপ্রতিহত লাভে বাধা পাইবার জন্য নিশ্চয়ই ইহারা "নিজেদের" মন্ত্রিমণ্ডল এত চেষ্টা করিয়া গড়িয়া লয় নাই। ফাঁপাতি টাকার জোরে চাউলের ফাটকাবাজী সুরাবর্দ্দী সাহেব কেমন করিয়া বন্ধ করেন সেটা না দেখিলে বুঝা কঠিন।

(জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)

কলিকাতা ও হাওড়ায় চাউলের সন্ধান

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তিন দিবসব্যাপী বিতর্কের শেষ দিনে মিঃ সুরাবার্দ্দী বলিয়াছেন যে কলিকাতা এবং হাওড়ায় চাউলের সন্ধান এবার আরম্ভ করা হইবে। অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কলিকাতা ও হাওড়ার চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট আদেশ জারিও করিয়াছেন। ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ হেণ্ডরী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে কলিকাতা ও হাওড়াকে খাদ্যান্বেষণ অভিযান হইতে কেন বাদ দেওয়া হইল তাহা নাকি তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ইস্পাহানী কোম্পানীর হইয়া মিঃ সিদ্দিকী কোন সাফাই দিয়াছেন কি না, সংবাদপত্রের রিপোর্টে তাহা জানা গেল না। খাদ্যান্বেষণ অভিযান হইতে কলিকাতা ও হাওড়াকে বাদ দেওয়া এত দৃষ্টিকটু হইয়াছিল যে মিঃ সুরাবর্দ্দী ও মিঃ হেণ্ডরীর পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত নীরব থাকা সম্ভব হইল না। কলিকাতার চাউল সরিবার হইলে এতদিনে সরিয়াই গিয়াছে ; এত বিলম্বে শহর ঘেরাওয়ে চাউল আটকানো যাইবে মিঃ সুবাবর্দ্দী ইহা বিশ্বাস করিতে বলেন ?

বিশ্বাস করা কঠিন হইলেও ইহা সত্য যে খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কিত বিতর্কে সরকার পক্ষ ১৩৪-৮৮ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। তেরো জন মন্ত্রী, সতেরো জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী এবং চার শত সরকারী দোকানে বেকার আত্মীয়-স্বজনের কর্ম্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা—পরাধীন দেশের নকল পার্লামেণ্টে ভোটে জয়লাভের পক্ষে ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট।

(শ্রাবণ ১৩৫০)

চাউলের দর বাঁধিয়া দিবার আশ্বাস

আগের মাসেই মডার্ন রিভিউ পত্রে আমরা খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দীকে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম যে, আগামী ফসল উঠিবার পূর্ব্বেই যেন চাউলের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং এই দরে যাহাতে বাজারে অবাধে বেচাকেনা চলিতে পারে তাহার কঠোর ব্যবস্থা তিনি যেন এখন হইতেই করিতে আরম্ভ করেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে মডার্ন রিভিউ প্রকাশের দিনেই মিঃ সুরাবর্দ্দী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এই ইচ্ছাই জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "পূর্ব্বাঞ্চল বিভাগের বাংলা ও অপরাপর প্রদেশের চাউল আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে ১লা আগস্ট হইতে বাধানিষেধ পুনরায় আরোপিত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আদেশ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, এই আশায় বহু ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজ স্থানীয় বাজার হইতে চাউল ক্রয় করিতেছে। তাঁহারা সম্ভবতঃ ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে উক্ত বাধা নিষেধ আরোপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার জন্য চাউল সংগ্রহ ও নিয়মিত সরবরাহের একটি নূতন পরিকল্পনাও করা হইয়াছে। আমি এই প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করিয়া দিতেছি যে শীঘ্রই সমগ্র বাংলায় মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা হইবে। আমি যে দর বাঁধিয়া দিব তাহা বর্তমান বাজার দর অপেক্ষা কিছু কম এবং আউস ধান উঠিতে থাকায় ও আমন ধান কাটার সময় আসিয়া পড়ায় চাউলের দর আরও কমিবে। যাহাতে এই নিয়ন্ত্রিত মূল্য সঠিকভাবে কার্য্যকরী হয় সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। যে সকল ব্যবসায়ী তাড়াহুড়ো করিয়া বর্তমানে উচ্চ মূল্যে চাউল খরিদ করিতেছে, তাহাদের সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অধিক দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবে না।"

মিঃ সুরাবর্দ্দীর নিকট হইতে বুভুক্ষু জনসাধারণ যে পরিমাণে বিবৃতি ও ইস্তাহার প্রভৃতি পাইয়াছে, কার্য্যতঃ সাহায্য ততখানি পায় নাই। এবার অন্ততঃ একটি বারের জন্যও তিনি প্রকৃত সাহসের পরিচয় দিয়া চাউলের দর বাঁধিয়া দিবেন। তাঁহার আশ্বাস শুধু বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, এ আশা করা অন্যায় হইবে কি?

(ভাদ্র ১৩৫০)

অতিলোভী ব্যবসায়ীদের প্রতি সরকারী হুমকি

স্যার আজিজুল হক ঐ বক্তৃতাতেই বলিয়াছেন, "দেশে এখনও এমন অনেক লোক আছে যাহারা আমাদিগকে সাহায্য করে নাই এবং অপরের ভাগ্য সম্পর্কে যাহারা উদাসীন। যে পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে ও সম্পূর্ণভাবে লাভের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারিবে সে পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ উদাসীনই থাকিবে। আমি ইহাদের এবং মজুতকারী ও ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি, আমার বিভাগ এবং আমাদের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে কার্য্য করিতেছেন, সেই সব প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টগুলি সম্বন্ধে আমি এই কথা বলিতে পারি যে, যাহাতে ইহারা অব্যাহতি না পায় সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

অতিলোভী মজুতদার ও ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার অনেক হুমকি দিয়াছেন, তাঁহাদের বহু বক্তৃতায় বুঝা গিয়াছে ইহাদের কার্য্যকলাপের সন্ধান তাঁহারা রাখেন। সর আজিজুলের বক্তৃতার উদ্ধৃতাংশও তাহারই প্রমাণ। কিন্তু কার্যতঃ আজ পর্যন্ত একটিও বড় ব্যবসায়ীকে ধরিয়া শাস্তি দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সকল বিক্রম গোটা কয়েক পানওয়ালা ও মুদী প্রভৃতির উপর দিয়াই নিঃশেষিত হইতেছে।

মিঃ গ্রিফিথ্‌স অতিলোভী ব্যবসায়ীদের চুংকিং-এ যেভাবে সাজা দেওয়া হয় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এদেশেও ইহাদিগকে গাধার টুপি পরাইয়া শহর প্রদক্ষিণ করাইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। শুধু ইহাদিগকে নহে, যে-সব সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষপুটাশ্রয়ে ইহারা অবাধে বর্ধিত হইতেছে তাহাদেরও ধরিয়া এইভাবে শাস্তি দেওয়া উচিত। বেত্রদণ্ড দানের যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে তাহা এইখানে। কলিকাতায় সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারীর গৃহে খানাতল্লাস করিয়া অপরাধজনক কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদিগকে আদালতে হাজির করা হয় নাই। অসাধু কর্ম্মচারী এবং অতিলোভী ব্যবসাদার উভয়ের প্রতি সমান কঠোরতার সহিত দণ্ড প্রয়োগ না করিলে এই পাপ দূর হইবার নহে। এবিষয়ে জনসাধারণের অভিমত জানিতে চাহিয়া সময় নষ্ট করা নিরর্থক, গবর্ন্মেট ইহাদিগকে শাস্তিদানের সাহস সঞ্চয় করুন, জনসাধারণ শুধু এইটুকুই প্রার্থনা করে।

(ভাদ্র ১৩৫০)

বাংলার বর্তমান খাদ্যসঙ্কটে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব

বাংলার বর্তমান খাদ্যসঙ্কটে কেন্দ্রীয় ও প্রদেশিক সরকার, বিশেষতঃ হক মন্ত্রিমণ্ডলের দায়িত্ব

কতখানি, সর্ আজিজুল হকের বক্তৃতায় তাহার আভাস রহিয়াছে। ১৯৩৯ এর পর হইতে ভারত সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য সমস্যার আলোচনার জন্য একটির পর একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীরা এই দুইটি অত্যাবশ্যক ব্যাপারে জনসাধারণের উপকার করিতে না পারিলেও মোটা ভাতা ও ভ্রমণ ব্যয় প্রভৃতি টানিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন। স্যার আজিজুল বলিয়াছেন, ১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাসে খাদ্য সমস্যা আলোচনার জন্য নয়াদিল্লীতে যে খাদ্য সম্মেলন হয় তাহাতে চাউল সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক এবং কয়েকজন সরকারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। স্যার আজিজুল বলিয়াছেন,

"বাংলা সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহারা বলেন—ঘাটতি পড়িলেও পরবর্তী কয়েকমাস বাহির হইতে চাউল আনান আমাদের আবশ্যক হইবে না। দরকার হইলে বাংলা সরকার কি প্রকারে চাউল সংগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন জানিতে চাহিলে, প্রধানমন্ত্রী বা সরকারী প্রতিনিধি কোন প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। সরকারী প্রতিনিধি বলেন, ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে আমাদিগকে কার্য্য প্রণালী স্থির করিতে হইবে। বাংলার পক্ষ হইতে বুঝান হইয়াছিল যে বাংলায় চাউল উদ্বৃত্ত না থাকায় ও ঘাটতি পড়ায় সর্ব্বভারতীয় শস্যভাণ্ডারে বাংলাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে বলা সমীচীন হইবে না ; নিজ প্রদেশের বাহিরে চাউল সরবরাহের দায়িত্ব লইতে না বলিলে বাংলা নিজের ঘর সামলাইতে পারিবে। ঐ বৈঠকে বাংলার প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেন "আমরা জানি যে আমাদের যথেষ্ট চাউল আছে, বাহির হইতে আমাদের কিছু গম পাওয়া আবশ্যক। আমরা বাঁধাধরা কোন নীতিতে আবদ্ধ হইতে চাহি না। আমরা নিজেদের বিবেচনানুসারে ব্যবস্থা করিব।"—অন্যান্য প্রদেশগুলি তখন বাংলাকে হিসাবের বাহিরে রাখিয়া ঘাটতির ও বাড়তির হিসাব করে। বাংলার প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন যে, জোয়ার ফসল সম্পর্কে তাহাদের কোন আগ্রহ নাই।"

সর্ আজিজুলের উপরোক্ত উক্তি প্রকাশিত হইবার পরদিন মৌলবী ফজলুল হক এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,

"১৯৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে খাদ্য সম্মেলনে আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করিয়া সর আজিজুল ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অবকাশ দিয়াছেন। ঐ সম্পর্কে আগামীকল্য আমি এক বিবৃতি দান করিব। আজ শুধু এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, উক্ত খাদ্য-সম্মেলনে আমি বাংলা হইতে বাহিরে খাদ্যশস্য প্রেরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম এবং শুধু এই জন্যই সকল প্রদেশের শস্যসম্ভার একত্র করিয়া ভারতের সর্বত্র সরবরাহের জন্য ভারত সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিবার পরিকল্পনায় বাংলার যোগদান অনুচিত বলিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, বাংলায় ঘাটতি থাকিলেও বাংলা হইতে যদি বাহিরে রপ্তানী না হয় তাহা হইলে হৈমন্তিক ফসলের সহায়তায় আমরা একরূপ কুলাইয়া উঠিতে পারিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার সমাজের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন তাহা বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল। তাহারা বাংলা হইতে চাউল ক্রয়ের জন্য এজেন্টগণকে প্রেরণ করিলেন এবং উক্ত সম্মেলনে আমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির অমর্য্যাদা করিয়া মন্ত্রীদের অজ্ঞাতেই বাংলা হইতে বেপরোয়াভাবে বাহিরে চাউল রপ্তানী করিতে লাগিলেন। বাংলায় খাদ্য সঙ্কটের উৎপত্তির ইহাই মূল কারণ।"

উভয়ের বক্তব্য হইতে দেখা যায়, হক সাহেবের ধারণা ছিল বাংলা হইতে চাউল রপ্তানী না

হইলে এবং কিছু গম আমদানী করিতে পারিলে আগামী ফসল না উঠা পর্যন্ত বাংলার একরূপ চলিয়া যাইবে। সর্ব্বভারতীয় শস্য ভাণ্ডারে নাম লেখানো তিনি বিপজ্জনক মনে করিয়াছিলেন। এই ভাণ্ডারটি কি, কাহারা ইহার দ্বারা কতখানি উপকৃত হইয়াছে, কেন হক সাহেব বাংলাকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে ভয় পাইয়াছিলেন, স্যার আজিজুল তাহা জানান নাই, হক সাহেবের জানা থাকিলে জনসাধারণকে জানান উচিত।

চাউল রপ্তানীর যে হিসাব সব্ আজিজুল দিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক নহে। তিনি বলিয়াছেন, জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত এ যাবৎ ৮৫ হাজার টন ফসল রপ্তানী করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বাংলার আইনসভায় গবর্মেণ্ট হিসাব দিয়াছিলেন ১৯৪৩ সালে দুই লক্ষ চুরাশি হাজার টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। হক মন্ত্রিমণ্ডলের বাণিজ্য-সচিব এই হিসাব দেন এবং স্বীকার করেন যে এই রপ্তানীর উপর বাংলার মন্ত্রিদের কোন হাত ছিল না ; তাঁহারা বাধা দিয়াও রপ্তানী বন্ধ করিতে পারেন নাই। মৌলবী ফজলুল হকও এখন ঠিক এই কথাই বলিতেছেন। এই ব্যাপারে হক মন্ত্রিমণ্ডল একেবারে নিষ্কলুষ একথা বলিতেছি না, কিন্তু ভারত সরকারের দীর্ঘসূত্রতা, শৈথিল্য এবং অদূরদর্শিতা যে বর্তমান সঙ্কটের প্রধানতম কারণ এ সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নাই।

(ভাদ্র ১৩৫০)

মানবতার আহ্বান

পলাশীর যুদ্ধের আট বৎসর পরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যায় দেওয়ানী গ্রহণ করে। দেওয়ানী লাভের ৫ বৎসর পরে ১৭৭০-এর মন্বন্তরে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক যখন অনাহারে মারা গেল, দেশে তখন সুগঠিত কোন গবর্মেণ্ট ছিল না, দ্রুত যানবাহন বা সংবাদ আদান-প্রদানের আয়োজনও হয় নাই।

১৭৩ বৎসর পরে ব্রিটিশ অধিকৃত বাংলায় আবার এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিনে দেখা গেল, রেল, স্টীমার, টেলিফোন খাস শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সুগঠিত গবর্মেণ্ট প্রভৃতি ব্রিটিশ শাসনের ধ্বজাপতাকা কোন কিছুই কাজে লাগিল না, ১৯৪৩ সালে বিংশ শতাব্দীর উন্নত সভ্যতার মধ্য গগনে সেই ১৭৭০ সালেরই ন্যায় নরনারী শিশু বৃদ্ধ অসহায় পশুর ন্যায় রাজপথে পড়িয়া অনাহারে মরিতে লাগিল। সময় ও দূরত্ব বিজয়ী গর্বিত ইউরোপ ও আমেরিকা এত বড় করাল দুর্ভিক্ষ প্রশমনে অগ্রসর হইল না ; কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারী শিশুর মুখে অন্নকণা কেহ তুলিয়া দিল না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে কতক নরনারী নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল উদার ও বদান্য ভারতবাসীর সাহায্যে ও চেষ্টায়, এবারও বাঙালীর এই চরম ও পরম দুর্ভাগ্যের দিনে তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে ভারতবাসী নিজে। যে-দুর্ভিক্ষের পূর্ণ দায়িত্ব ভারত সরকারের, সেই গবর্মেণ্টই বাংলার দুর্ভিক্ষের প্রতিবিধানে অক্ষম, শুধু ইস্তাহার জারিতে মুখর। সরকারী উদাসীনতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতার পরিণাম যে কি ভীষণ নৃশংস ও নিষ্ঠুর হইতে পারে কলিকাতার রাজপথ ও বাংলার পল্লী আজ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

পরাধীনতার জ্বালা ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাংলা আজ যেভাবে মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে,

এমনটি আর কখনও হয় নাই। ভারতবাসীর টাকায় রেল চলে, তাহারই দেওয়া ট্যাক্সে ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট বিলাসিতা করে ;কিন্তু সহস্র সহস্র মানুষ অনশনে রাস্তায় পড়িয়া মরিলেও চাউল ও গম আনিবার জন্য গাড়ী জোটে না, ভারত সরকার তাহার অধীনস্থ রেল বিভাগকে মালগাড়ী সরবরাহে বাধ্য করিতে পারে না, ভারতের 'ট্রাষ্টি' চার্চিল ও আমেরীর দল নীরবে তাকাইয়া থাকে।

বাংলার মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া শৃঙ্খলিত ভারতবাসী পরস্পরের সান্নিধ্য গভীরতরভাবে অনুভব করুক ; জাতি-ধর্ম ও প্রদেশের সকল গণ্ডী মুছিয়া ভারতবাসী আজ মানবসেবার মহান পতাকাতলে সমবেত হউক ;মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ অনশনে কঙ্কালসার নরনারীর হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে এই প্রার্থনাই আজ বিশ্বপিতার চরণে ধ্বনিত হউক।

(আশ্বিন ১৩৫০)

বাংলায় মৃত্যুসংখ্যা

দুই সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় কতগুলি নরনারী অনশনে মৃত্যু বরণ করিয়াছে, যুগান্তর তাহার হিসাব দিয়াছেন।

তারিখ	হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা	হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা	রাজপথে মৃত্যুর সংখ্যা
১৬ আগষ্ট	৬০	৪	১৬ আগষ্ট
১৭ আগষ্ট	৮১	১০	হইতে ১৯
১৮ আগষ্ট	৯১	—	আগষ্ট পর্যন্ত
১৯ আগষ্ট	১৮১	১৮	১০৩
২০ আগষ্ট	১৬০	১৯	১৭
২১ আগষ্ট	৪৮	৮	—
২২ আগষ্ট	২০	১২	—
২৩ আগষ্ট	৩৮	৭	২৪
২৪ আগষ্ট	৬৮	৭	১৩
২৫ আগষ্ট	৪৩	১৮	২২
২৬ আগষ্ট	৭৬	২১	১৪
২৭ আগষ্ট	৮৮	১৯	৪০
২৮ আগষ্ট	৫০	৬	৩০
২৯ আগষ্ট	১০৬	২৩	৩১
৩০ আগষ্ট	৮৫	২৪	৩৫
৩১ আগষ্ট	১৩৫	২৩	—
	১৩৩০	২১৯	৩২৯

মোট মৃত্যুসংখ্যা—৫৪৮

মফস্বলের মৃত্যুহার কি ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার সামান্য আংশিক সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে।

সংবাদপত্রে যে অসম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা দেওয়া গেল:

চাঁদপুর-মিউনিসিপালিটির হিসাব অনুসারে জুলাই মাসে মৃত্যুর সংখ্যা ৭৭।৭৮, আগষ্ট মাসে অনুমান ১০০।

চাঁদপুরের মুসলিম যুবসমিতির প্রদত্ত মৃত্যুসংখ্যার হিসাব:

এপ্রিল	৮
মে	২৯
জুন	৩৫
জুলাই	১৪০
আগষ্ট (২৬-এ পর্য্যন্ত)	১৬০

ব্রাহ্মণবাড়িয়া—২১ আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ দিনে ৫

নারায়ণগঞ্জ—গত দেড় মাসে ১০০-র অধিক

কুমিল্লা	মোট	১৩৫
মাদারীপুর	তিন সপ্তাহে	৪০
নাটোর	প্রত্যহ	৩ হইতে ৬
উলুবেড়িয়া	২২ আগষ্ট	
বহরমপুর	২১ আগষ্ট	

ঢাকা, বরিশাল এবং ভোলার রাস্তাঘাটে প্রায়ই মৃতদেহ দেখা যায়।

(আশ্বিন ১৩৫০)

ধান ও চাউলের দর নির্ধারণ

ধান ও চাউলের ঊর্ধতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সিভিল সাপ্লাই বিভাগের জনৈক সহকারী কন্ট্রোলার ঘুষ খাওয়ার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ধান ও চাউলের দর বাঁধিয়া না দিলে এবং ঘুষখোর সরকারী কর্মচারী ও অতিলোভী ব্যবসায়ীদের ধরিয়া কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত না করিলে অনশনক্লিষ্ট দুঃস্থ জনসাধারণের মুখের গ্রাস লইয়া যে লুট চলিয়াছে তাহা বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি।

গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে মিঃ সুরাবর্দ্দী হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সুসম্পন্ন করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব যে তাঁহারই, ইহা ভুলিলে চলিবে না। চাউলের দর বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে চাউল বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। লোকে ৪০৲৪৫৲টাকা দিয়াও যাহা পাইতেছিল, তাহাও এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য। চাউলের অভাবে আটার চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় গমের দর কয়েক দিনের মধ্যেই ১৭৲ টাকা হইতে ৩৭৲টাকায় চড়িয়াছে। যে সব আড়তদার ও ব্যবসায়ী বাজার হইতে মাল সরাইয়া চাউলের দর নামাইয়া আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে, মিঃ সুরাবর্দ্দী তাহাদের কঠিন ভাষায় শাসাইয়াছেন। কিন্তু ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার যে দুইটি অব্যর্থ অস্ত্র আছে তাহা তিনি এখনও প্রয়োগ করেন নাই।

প্রথমতঃ, তিনি যে চারি শত সরকারী দোকান খুলিবার আশ্বাস বহু দিন পূর্বে দিয়াছেন অবিলম্বে তাহা খোলা দরকার। এইসব দোকান হইতে নির্দিষ্ট দরে ক্রেতা সাধারণকে প্রয়োজনীয়

চাউল বিক্রয় আরম্ভ করিলেই অতিলোভী ব্যবসায়ীরা চাউল ধরিয়া রাখিতে ভয় পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা দেশের যে গোয়েন্দা-বিভাগ এক একটি গুপ্ত ইস্তাহার খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রচুর তৎপরতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের উপর চাউল খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার তিনি দিতে পারেন। যে দেশে ৪৫্ টাকা চাউলের দর উঠিবার পর নরনারী রাজপথে পড়িয়া মরিয়াছে, বিদ্রোহের কথাটি মাত্র বলে নাই, মাঞ্চেষ্টার দাঙ্গা (Food Riot) প্রভৃতির ন্যায় বিলাতী আদর্শে অন্নের জন্য যাহারা দেশব্যাপী দাঙ্গায় অবতীর্ণ হয় নাই, সে দেশে বিপ্লবের বা বিদ্রোহের সম্ভাবনা বর্ত্তমানে যে কিছুমাত্র নাই ইহা আজ এক প্রকার নিঃসংশয়েই বলা চলে। সুতরাং বিরাট গোয়েন্দা বিভাগের একটা বড় অংশকে চাউল খুঁজিবার ভার দিলে দেশ রসাতলে যাইবার ভয় নিশ্চয়ই নাই। ভয় আছে শুধু তাহাদের যাহারা অন্যায় অনুগ্রহের আড়ালে দেশের সর্বনাশ করিতেছে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

সরকারের চাউল ক্রয়

বাংলার যে সব জেলায় আউশ ধান বেশী হইয়াছে, গবর্ন্মেণ্ট এবং ব্যবসায়ীর দল সকলই সেখানে ধান ও চাউল ক্রয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ক্রেতার নিকট বিক্রয় কার্য্যটি যে সরকারী নির্ধারিত দরেই চলিবে ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। চাউলের বর্তমান বাজার দর অনুসারে এবং ব্যবসায়ী ক্রেতাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে চাষীদের পক্ষে ধানের দর ২০/২৫্ টাকা পাওয়া হয়ত অসম্ভব হইত না, কিন্তু সরকার দর বাঁধিয়া দেওয়ায় আর দিন কয়েক পর হইতেই ১০্ টাকার বেশী চাহিবার উপায় তাহাদের রইল না। ধানের দর ১০্ টাকার অনুপাতে চাউলের দর ২০্ টাকার নীচে আসা দরকার। এই দরে যদি চাউল বিক্রয় না হয় তবে সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে চাষীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং যে-সব অতিলোভী ব্যবসায়ী দুঃস্থ লোকের রক্ত শোষণ করিয়া এতদিন কোটি কোটি টাকা লুট করিয়াছে তাহাদের লুটের ভাগ আরও বাড়িবে। সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের এইটিই সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা।

কিন্তু প্রতিকারের উপায় নাই এমন নহে। দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা যে কুৎসিত তস্কর মনোবৃত্তির পরিচয় এতদিন ধরিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহাতে অতঃপর ধান চাউল ক্রয়ের সমস্ত লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিয়া গবর্ন্মেণ্ট স্বয়ং এই কার্য্যের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিলে উহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় বা অবিচার হইত না। গবর্ন্মেণ্ট ভিন্ন আর কেহ ব্যবসার জন্য ধান বা চাউল ক্রয় করিতে পারিবে না, চাউলের কলগুলি গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল ক্রয় করিবে এবং গবর্ন্মেণ্টের নিকটেই নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল বিক্রয় করিবে, ক্রেতা সাধারণকে একমাত্র গবর্ন্মেণ্টের দোকান হইতে চাউল বিক্রয় করা হইবে, এই বন্দোবস্ত করিয়া দেশের সর্বত্র প্রয়োজনানুসারে চারি শতের পরিবর্তে চল্লিশ হাজার চাউলের দোকান খোলা আদৌ অসম্ভব নহে। এই ক্রয়বিক্রয় কার্য্যের মধ্যে কোন রকমে যাহাতে ঘুষ বা চুরি চলিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইলে বাংলা দেশের বর্তমান দুর্দশা দূর হইতে অধিক বিলম্ব হইবার কথা নহে। সৎকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে সরকার অর্থাভাবের যে চিরন্তন কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন তাহাও এখানে খাটিবে না, এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ব্যয় উহার আয় হইতেই নির্বাহ হইতে পারিবে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

চাউল ক্রয়ের এজেণ্ট নিয়োগ

বাংলা সরকার চাউল ক্রয়ের জন্য যেসব এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। এজেণ্টদের নাম ও চাউল ক্রয়ের এলাকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

মেসার্স ইস্পাহানী লিঃ—ময়মনসিংহ, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং বাঁকুড়া।

মিঃ সি কে ঘোষ—যশোহর ও খুলনা।

মিঃ এইচ কে দাদা—বীরভূম।

মিঃ এ কে দত্ত—নদীয়া।

মিঃ জে এন রায়চৌধুরী—মালদহ, বগুড়া ও রাজশাহী।

মিঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি।

মিঃ জয়নাল আলি রাজা—বরিশাল।

মিঃ হাসেন প্রেমজী—রংপুর।

মেসার্স বসগুলাল শিবলাল শা—পাবনা।

গত বৎসরও এইভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কতিপয় এজেণ্টের মারফৎ চাউল ক্রয় করা হইয়াছে এবং তাহার ফল যাহা ঘটিয়াছে তাহা সুবিদিত। এজেণ্টদের মারফৎ চাউল ক্রয়ে এবারও পূর্ব্বের ন্যায় বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এ আশঙ্কা আদৌ অমূলক নহে। বিশেষতঃ ইস্পাহানী কোম্পানীকে এবারও সব চেয়ে বেশী চাউল ক্রয়ের ভার দেওয়া হইয়াছে। ইস্পাহানী কোম্পানী গত বৎসর তাঁহাদের কার্য্যে কি সাফল্য দেখাইয়াছেন, চাউলের সরবরাহে ও মূল্য হ্রাসে ইহারা কতখানি সাহায্য করিয়াছেন যে এ বৎসরেও এত বড় ইজারা তাঁহাদেরই উপর অর্পিত হইল? চাউলের বাজারে এই কোম্পানীর আবির্ভাব আকস্মিক, বাংলা-সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত আগাম টাকায় এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইহাদের কারবারের স্ফীতি। গত এক বৎসর কাল ইহারা বাংলার ছয় কোটি জনসাধারণের একমাত্র আহার্য্য বস্তুর কারবার করিয়া যে বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিন-চারি বৎসর পূর্বেও ধান চাউলের কারবারে ইস্পাহানী কোম্পানীর কোন প্রতিষ্ঠা ছিল বলিয়া আমরা অবগত নহি। তৎসত্ত্বেও ইহাদেরই হাতে আটটি বৃহৎ জেলায় চাউল ক্রয়ের ভার দিতে বাংলা-সরকার কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। অল্প দিনের ভিতর ইহারা কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন যে ইহাদিগকেই প্রধান এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে হইল?

বাংলার বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য ভারত-সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক, কিন্তু বাংলা-সরকারের কার্য্যবিধি যে এ ব্যাপারে দোষমুক্ত নহে এই ধরণের ঘটনা তাহারই পরিচয়। মফস্বলের স্থানীয় এক একটি আড়তদারকে নিজ নিজ জেলার এজেণ্ট নিযুক্ত করিলে তাহার অর্থ বুঝা যাইত, কিন্তু ইস্পাহানী কোম্পানীর প্রতি বাংলার নাজিম-মন্ত্রিমণ্ডলের এত অনুরাগের কারণ কি এবং ইহারা কৃতিত্ব, সততা এবং যোগ্যতার কি অসাধারণ পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে গবর্ন্মেণ্টের কার্য্য সমর্থন করা যায়।

(আশ্বিন ১৩৫০)

রেশনিং সম্বন্ধে ভারত সরকারের প্রস্তাব

ইউনাইটেড প্রেসের ২২শে আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ, প্রস্তাবিত রেশনিং পরিকল্পনার নিম্নলিখিত ১০টি বিষয় যাহাতে সংবাদপত্রসমূহের সমর্থন লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য ভারত সরকারের প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট সমূহকে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

১. অল্প পরিমাণ সরবরাহ যাহাতে সমভাবে বণ্টন করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই রেশনিঙের উদ্দেশ্য। ইহাদ্বারা খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারের সঙ্কোচ বুঝায় না।

২. রেশনিং করিতে হইলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৩-৪. রেশনিং-পরিকল্পনার নীতি এবং সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় যাহাতে সর্বত্র যথাসম্ভব ব্যাপক হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫. রেশনিং-ব্যবস্থা আইন-অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক এবং বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারিগণের সাহায্যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে হইবে।

৬. স্থানীয় খাদ্য-পরামর্শ কাউন্সিল অথবা খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ-কমিটি গঠন করিতে হইবে।

৭. এই পরিকল্পনা প্রবর্তনের জন্য সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে।

৮. স্থানীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী খাদ্যের দোকানগুলি ব্যবহার করিতে হইবে।

৯. অবস্থা যাহাতে অচল না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য কিছু মাল হাতে রাখিতে হইবে এবং রেশন-খাদ্য সঞ্চয় করিতে হইবে।

১০. সংবাদপত্রসমূহের সাহায্য এবং সদিচ্ছা লাভ করিতে হইবে।

এই প্রস্তাব দশটির মধ্যে রেশনিঙের সাফল্যের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কথাটিই নাই। "কিছু মাল হাতে রাখিয়া" রেশনিং চলে না, এই বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে পর্য্যাপ্ত মাল আগে মজুত করিতে হয় এবং সরবরাহ যাহাতে এক দিনের জন্যও বন্ধ না হইতে পারে তজ্জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। বাংলায় বহুদিন যাবৎ রেশনিঙের কথা চলিতেছে, এবং প্রতি পদে দেখা যাইতেছে মিঃ সুরাবর্দ্দী এই বিপুল কাজে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার দ্বিধার কারণ বুঝা কঠিন নয়। রেশনিং আরম্ভ করিতে হইলে যে-পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য হাতে থাকা দরকার, বাংলায় তাহা নাই। ভারত-সরকারের উপর এ ব্যাপারে নির্ভর করা ছাড়া বাংলার কোন উপায় নাই। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য নিয়মিতভাবে সরবারহ করা হইবে এমন কোন গ্যারাণ্টি ভারত-সরকারের কথায় বা কাজে প্রকাশিত হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই গ্যারাণ্টি না লইয়া এই কাজে হাত দিলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

ভারতের বাহিরে ফসল রপ্তানী

ভারতের বাহিরে ফসল রপ্তানীর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল, তাহার ফলে ভারত-সরকার এক ইস্তাহারে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে যে-পরিমাণ ফসল রপ্তানী হইত, গত বৎসরের এবং চলতি বৎসরের প্রথম সাত মাসের রপ্তানীর পরিমাণ তাহার তুলনায় অতি সামান্য। প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৩৭০,০০০

টন খাদ্যশস্য রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হইয়াছে ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা অপেক্ষা ৯ লক্ষ টন কম খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের প্রথম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রতি মাসে নিম্নলিখিত পরিমাণ খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হইয়াছে : জানুয়ারি মাসে—গম ১৪০ টন, চাউল ১৩৮৩০ টন, মোট ১৩৯৭০ টন ; ফ্রেব্রুয়ারি মাসে—গম ১৬৬ টন, চাউল ১৯০৫৮ টন, মোট ১৯২২৪ টন ; মার্চ মাসে—গম ৬ টন, চাউল ১২৬১২ টন, মোট ১২৬১৮ টন ; এপ্রিল মাসে—গম ৩৩ টন, চাউল ৭৮১৯ টন, মোট ৭৮৫২ টন ; মে মাসে—গম ২১৬ টন, চাউল ৫৪৭৯ টন, মোট ৫৬৯৫ টন ; জুন মাসে—গম ২০৩২১ টন, চাউল ১০১৬৬ টন, মোট ৩০৪৮৭ টন ; জুলাই মাসে—গম ২৮৩ টন, চাউল ২০০৮ টন, মোট ২২৯১ টন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাস হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে মোট ২১১৬৫ টন গম ও ৭০৯৭২ টন চাউল এবং চাউল ও গম মিলিয়া মোট ৯২১৩৭ টন খাদ্যশস্য রপ্তানী হইয়াছে। সিংহল, পারস্য উপসাগর অথবা আফ্রিকার বন্দর এবং দ্বীপসমূহে এই সমস্ত খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে ভারতীয়গণের বসবাস আছে।

এই ইস্তাহারের ভিতর যে গোঁজামিল নিহিত আছে, তাহা আবিষ্কার করা খুব শক্ত কাজ নয়। ভারত-সরকার শুধু রপ্তানীর হিসাব দিয়াছেন কিন্তু ঐ সঙ্গে আমদানীর হিসাবটা অতি সতর্কতার সহিত চাপিয়া গিয়াছে। সাধারণ অবস্থায় ভারতবর্ষে বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও গম আমদানী হয়। যুদ্ধ বাধিবাব পর হইতে আমদানী একেবারে বন্ধ, অথচ রপ্তানী অবাধে চলিয়াছে। আমদানী বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত ছিল, এক কণা শস্যও বাহিরে যাইতে দেওয়া সমীচীন হয় নাই। ভারত-সরকারের শাসনযন্ত্র ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে-অবস্থায় ছিল তদপেক্ষা খুব বেশী দূর আজও অগ্রসর হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু জনসাধারণ ব্রিটিশ শাসনসত্ত্বেও, সরকারী অর্ধসত্য প্রচারের মধ্যে লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করিবার মত জ্ঞানলাভ করিয়াছে। সরকারী সিভিলিয়ানেরা এটা না ভুলিলেই ভাল করিবেন।

সরকারী ইস্তাহারটির সহিত বিহার হেরাল্ড প্রদত্ত নিম্নলিখিত সংবাদগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। চলতি বৎসরের প্রথম সাত মাসে ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে প্রেরিত ২২ লক্ষ ৯৫ হাজার মণ চাউল ও গম ভিন্ন এদেশেই সৈন্য বাহিনীর জন্য চাউল ও গম ক্রয় করা হইয়াছে ৭৫ লক্ষ ৬০ হাজার মণ। ১৯৪২ সালে ভারতে অবস্থিত সামরিক বন্দীদের জন্য ৬২ হাজার এবং চীনা, ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যদের জন্য ২ লক্ষ ১৬ হাজার গরু হত্যা করা হইয়াছে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

সর্ নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা

উত্তরপাড়ায় নাগরিকদের পক্ষ হইতে গত ২২শে আগষ্ট বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দীনকে একটি মানপত্র দেওয়া হয় এবং উহাতে খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানী কাঠ ও কয়লা এবং সববরাহের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করা হয়। উত্তরে সর্ নাজিমুদ্দীন বলেন, "মূল্য নিয়ন্ত্রণের নূতন নীতি ঘোষণায় কিছু ফল হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, দরের ঊর্দ্ধগতি যেন বন্ধ হইয়াছে এবং এখন উহার গতি নিম্নগামী হইবে। আমরা ভগবানেব কৃপায় মূল্য হ্রাস করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। আশু ফল লাভ না হইতে পারে কিন্তু আমরা আশা করি কমিতে থাকিবে, আমাদের

নির্দেশ ও আদেশসমূহ যাহাতে পালিত হয় তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করিব। এই সমস্যার সমাধান চেষ্টায় দুইটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য ছিল। প্রথমতঃ জনসাধারণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শের পর আমাদিগকে যাহা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, আমরা নিষ্ঠা ও অকপটতার সহিত তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। জনসাধারণের হিতসাধন ব্যতীত অপর কোন বিষয় দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয় নাই। আমরা কিছুতেই আমাদের নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি হইতে বিচলিত হই নাই। আমরা এই কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য নিষ্ঠা ও অকপটতার সহিত চেষ্টা করিতেছি।

"এইরূপ একটি বিষয়ে এমন অনেকে অবশ্যই আছেন, যাঁহারা নিজ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ইহার বিচার করিবেন ও বিশেষ পরিকল্পনা বিষয়ে একমত হইবেন না ; কিন্তু আমার মনে হয়, যাহারা পরামর্শ দিবার ক্ষমতা রাখেন অথবা যাঁহারা এই ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সহিত সংযুক্ত আছেন অথবা যাঁহারা এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, মন্ত্রিসভার পক্ষে এইরূপ ব্যক্তিদের পরামর্শ এবং আস্থাভাজন নেতাদের মারফৎ জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিয়া একটি পরিকল্পনা গঠন করা কর্ত্তব্য। এমন অনেকে আছেন যাঁহাদের সহিত আমাদের মিল না থাকিতে পারে ; কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সূত্র হইতে উপদেশ লইয়া মানুষের যাহা সাধ্য, আমরা তাহা করিয়াছি বলিয়া আমি দাবী করিতেছি।

"চাউলের মূল্য কমিয়া যাওয়া যদি জনসাধারণের কাম্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের কর্তব্য আমাদের সহায়তা করা এবং যাহারা চোরাবাজারের সহায়তা করে তাহাদের কোনরূপ উৎসাহ না দেওয়া। এই সকল ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধিতে জনসাধারণ যেন কোনরূপ সহায়তা না করে, তাহারা যেন গবর্ন্মেণ্টকে এবং এই অসাধুতা দমনে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য করে, ইহাই আমার আবেদন।"

ভগবানের কৃপায় মূল্য হ্রাস করিতে পারিবেন বলিয়া সর্ নাজিমুদ্দীন ভরসা দিয়াছেন। কিন্তু মানুষের নিজের হাতে গড়া এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ভগবানের দয়ার ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া মানুষের নিজেরই, বিশেষতঃ এই দুর্ভিক্ষ যাহাদের অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থার ফল, তাহাদেরই বিশেষ ভাবে অগ্রণী হওয়া দরকার। ঈশ্বর সাহায্য করেন যেন উদ্যোগী পুরুষসিংহকে, অকর্ম্মণ্য অপদার্থকে নয়।

চাউলের মূল্য হ্রাস জনসাধারণের কাম্য কি না, নাজিমুদ্দীনের এই ইঙ্গিতের কোন জবাব উপস্থিত জনমণ্ডলী দিয়াছিলেন কি না আমরা অবগত নহি। চাউলের দর ৪০ টাকার ঊর্দ্ধে উঠিবার পরও ব্যবস্থা পরিষদে ভোটাধিক্যে তাঁহার দল জয়লাভ করিয়াছে। ইহার একমাত্র অর্থই এই যে জনসাধারণ চাউলের মূল্য হ্রাসের চেষ্টা করিবার জন্য তাঁহাকে সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়াছে। চোরাবাজার দমনে গর্বন্মেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করা নিরর্থক। অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাহারা প্রধান তাহারা এত বিত্ত ও প্রভাবের অধিকারী যে জনসাধারণ তাহাদের সান্নিধ্যে গমন করিতে পারে না, ইহাদের কার্যকলাপের সন্ধান সংগ্রহ করাও তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। এ কাজ গবর্ন্মেণ্টের নিজের এবং পুলিশের সাহায্য এখানে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হইবার কথা।

(আশ্বিন ১৩৫০)

লুকানো চাউল বাহির করিবার দায়িত্ব

খাদ্য-সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী গত ১লা সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, "সরকার কর্তৃক ধান চাউলের দর বাঁধিয়া দেওয়ার পর উহা অদৃশ্য হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যদি কোন খুচরা দোকানদার দোকান বন্ধ করে তবে থানায় খবর দেওয়া জনসাধারণের কর্তব্য আর অবিলম্বে প্রতিকার পাওয়ার ইচ্ছা করিলে গোয়েন্দা পুলিসকে খবর দিতে হইবে। খুচরা দোকানদার যদি পাইকারদের নিকট হইতে মাল না পায়, তবে অবশ্য দোকান বন্ধ করা ছাড়া তাহার উপায় নাই। কিন্তু সেজন্য মাল অদৃশ্য হইতে পারে না। ২৭শে আগষ্ট পর্য্যন্ত দোকানে মাল ছিল, কিন্তু সরকারী আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ২৮ শে আগষ্ট মাল কিরূপে অদৃশ্য হইতে পারে? খুচরা দোকানদারদের যদি দোষ না থাকে, তবে পাইকারদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যেভাবেই হউক, কলিকাতার জন্য খাদ্যশস্যের সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে হইবে। মাল যাহাতে কেহ সরাইতে না পারে, গবর্ন্মেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং ইতিমধ্যে তাহাতে কতকটা কৃতকার্য হইয়াছেন। জনসাধারণ যদি অভিযোগ না করে তবে অনাহারে মৃত্যুই তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিবে।"

লুকানো চাউল খুঁজিয়া বাহির করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে গোয়েন্দা পুলিসের সাহায্যে উহা বাহির করা অসম্ভব বলিয়া কেহ মনে করিবে না। জনসাধারণের সহযোগিতার দায়িত্ব জনসাধারণের ঘাড়ে না চাপাইয়া সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টরদের নিজেদেরও মুদীর দোকানগুলিতে সন্ধান লওয়া উচিত। পুলিস বা গবর্ন্মেণ্টকে সংবাদ দিতে গিয়া হয়রান হওয়া এদেশে নূতন নহে; আহার্য সন্ধানে বিব্রত বাঙালীর পক্ষে সংবাদ-দানে হয়রানির আশঙ্কা এবং সময়ের অভাব উভয়ই ঘটা স্বাভাবিক।

অনশনক্লিষ্টদের জন্য সাহায্য-শিবির

অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যের যে ব্যবস্থা হইতেছে উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ সুরাবর্দ্দী তাহার এক বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন:

"অনশনক্লিষ্ট লোক যাহাতে কলিকাতা আসিয়া ভিড় না করে, সেজন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অন্নসত্র খোলা হইতেছে; ১৭ শত দুঃস্থ পীড়িত ব্যক্তিকে হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করা হইবে। ৪৩ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে দুঃস্থ-শিশুসাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এ, আর, পি এম্বুল্যান্সযোগে রাস্তা হইতে সেখানে শিশুদিগকে নেওয়া ও খাওয়ান হইবে। এক হাজার লোকের স্থান হইতে পারে এইরূপ চিকিৎসাকেন্দ্র কলিকাতায় স্থাপন করা হইয়াছে। তাহা প্রসারিত করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে যাহারা চিকিৎসা ও ঔষধপথ্য পাইবে তাহাদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া অধিকতর দুঃস্থদিগকে ইভ্যাকুয়েশন ক্যাম্প বা আশ্রয়শিবিরে প্রেরণ করা হইবে। এখানে ২০ হাজার লোকের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৎপরে তাহাদিগকে বাড়ীতে পাঠান হইবে। সেখানেও তাহাদিগকে খাওয়ানর ব্যবস্থা করা হইবে। নিতান্ত দুঃস্থদিগকে স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ দেওয়া হইবে। তাহাছাড়া জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বা বদান্য ব্যক্তি যাঁহারা লোকসেবার ভার লইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও স্ট্যান্ডার্ড ক্লথ দেওয়া হইবে।"

কয়েকটি অস্থায়ী শিবির খুলিয়া কলিকাতা হইতে অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে সরাইয়া লইবার আয়োজন প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা যেন প্রয়োজনের তুলনায় কম না হয়। এই সব

শিবিরের পরিচালন-ভার সরকারী কর্মচারীদের উপর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া না দিয়া বাংলার জনসেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য এ বিষয়ে গ্রহণ করিলে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। বাংলায় এই প্রকার আশ্রয়শিবির পরিচালনা কঠিন বোধ হইলে বাংলা-সরকার বিহার ও আসামে আশ্রয়-শিবির স্থাপন করিয়া সেখানে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

(আশ্বিন ১৩৫০)

রেলওয়ে বিভাগের অব্যবস্থা

পঞ্জাবের রাজস্ব সচিব চৌধুরী সর্ ছোটু রামের এক বিবৃতিতে ভারত সরকারের ও রেল বিভাগের যে কার্য্যকলাপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিস্ময়কর। সর্ ছোটু রাম বলিতেছেন, "কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট পঞ্জাব গবর্ন্মেণ্টকে মে, জুন ও জুলাই মাসের মধ্যে ৩,৩২,৭৯৭ টন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে বলেন। কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের এই অর্ডার যদিও ২০শে মে পাঞ্জাব গবর্ন্মেণ্টের হস্তগত হয়, তথাপি তাঁহারা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ২,১৮,৬৫৪ টন খাদ্যদ্রব্য কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের জন্য ক্রয় করেন। এই বিপুল খাদ্যশস্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট মাত্র ৬২,০০০ টন অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যের ২৮% ভাগ পঞ্জাব হইতে লইতে সমর্থ হইয়াছেন।"

ভারত সরকারের দুইটি বিভাগ—খাদ্য বিভাগ ও রেলওয়ে বিভাগের মধ্যে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা নাই, বহু ক্ষেত্রে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে, সর্ ছোটু রামের বিবৃতিও সেই একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি মাত্র। সর্ এডোয়ার্ড বেন্থল বাংলা সরকারের উপর দোষারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাংলায় খাদ্যদ্রব্য ডেলিভারী লইতে অসঙ্গতভাবে বিলম্ব করা হয়। রেল বিভাগের সাধারণ অব্যবস্থা ও দীর্ঘসূত্রতা দেখিয়াই সর্ এডোয়ার্ডের উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ আসিয়াছিল। সম্প্রতি বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত একটি ঘটনার সংবাদ অবগত হইয়া পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে যে অব্যবস্থার জন্য একা বাংলা সরকার দায়ী নহেন, রেল বিভাগের দায়িত্বটাও এক্ষেত্রে যথেষ্ট আছে। ঘটনাটি এই—বাংলায় কতকগুলি মাল গাড়ী বোঝাই গম ও চাউল প্রেরিত হয়। গমের গাড়ী পাঠাইবার কথা হাওড়া রামকৃষ্ণপুর সাইডিঙে, কারণ সেখানকার ময়দা-কলে সেগুলি পেষা হইবে এবং চাউলের মালগাড়ী যাইবে কলিকাতার চেতলা সাইডিঙে, সেখানকার এজেণ্টগণ উহা ডেলিভারী লইবে। সর্ এডোয়ার্ড বেন্থলের বিভাগের কর্ম্মতৎপরতার ফলে গম গেল চেতলায় এবং চাউল গেল রামকৃষ্ণপুর। ডেলিভারীর যে বন্দোবস্ত পূর্ব্বে হইয়াছে তদনুসারে কোন স্থানেই মাল খালাস করা চলে না। চেতলার গাড়ী রামকৃষ্ণপুর এবং রামকৃষ্ণপুরের গাড়ী চেতলায় পৌঁছিবার পর চাউল ও গম গাড়ী হইতে নামানো সম্ভব হইল। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই সর্ এডোয়ার্ড বাংলা সরকারের অব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন কিনা মিঃ সুরাবর্দ্দীর পক্ষে তাহা জানান উচিত। এই ধরনের অভিযোগের জবাব না দিলে বাংলার খাদ্য বিভাগের প্রতি অপর প্রদেশের অনাস্থা জন্মিবে এবং তাহাতে ক্ষতি হইবে বাংলারই।

বাংলা সরকার ত্রুটিবিহীন একথা আমরা অবশ্যই বলি না। কিন্তু বর্তমান দুর্ভিক্ষের উপশম না হওয়ার সর্বপ্রধান দায়িত্ব ভারত সরকার ও রেল বিভাগের ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে রেলের জন্য ভারতবাসী পাঁচ শত কোটি টাকারও অধিক মূলধন দিয়াছে যাহার পরিচালনার জন্য

দরিদ্র ভারতবাসী প্রতি বর্ষে এক শত কোটিরও বেশী টাকা দিতেছে, সেই রেলওয়ে ভারতবর্ষের এক মহা দুর্দিনে দেশের কাজে, আর্ত্ত ও বুভুক্ষু মানুষের সেবায় নিয়োজিত হইল না, এ কলঙ্ক কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্রিটিশ শাসন অধ্যায় হইতে মুছিবার নয়।

(আশ্বিন ১৩৫০)

বাংলার দুর্ভিক্ষে অপর প্রদেশের সাহায্য

বাংলার দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানে ভারতের অপর প্রদেশসমূহ পিছাইয়া থাকে নাই। পঞ্জাব ও সিন্ধু বাংলায় গম প্রেরণের জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য উহারা প্রেরণে সক্ষম, রেলওয়ের অব্যবস্থায় তাহার সবটা দ্রুত আসিতে পারিতেছে না। বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্র সমূহ ফণ্ড খুলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এলাহাবাদের লীডার, মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বোম্বাইয়ের জন্মভূমি, বন্দেমাতরম্, কাশীর আজ, দিল্লীর তেজ, নাগপুরের নবভারত প্রভৃতি সংবাদপত্র এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন এবং সহস্র সহস্র টাকা তুলিয়া পাঠাইতেছেন। বাংলা হইতে আগত অনাথা স্ত্রীলোক ও অনাথ শিশুকে আশ্রয়দানের জন্য পিলানীতে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে জয়পুরের দুইজন রানী উহাতে ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। বাংলা আজ একা নয়, এই ভরসা বাংলার সেবাব্রতীদের প্রাণে শক্তির সঞ্চার করিবে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

বাংলার বাহিরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতি বন্ধ

বাংলার খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের সেন্সর উহার উপর কাঁচি চালাইয়াছেন এবং সম্পূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করিতে দেন নাই। ইহা লইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রশ্ন করিলে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ভাসা ভাসা রকমের জবাব দিয়া উহা এড়াইবার চেষ্টা করা হয়। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ভারত সরকার উহা নিবারণের জন্য সময় থাকিতে চেষ্টা করেন নাই, এখনও তাঁহারা পর্য্যাপ্ত সাহায্য দিতে পারেন নাই। এই অক্ষমতার পরিচয় বাংলার ও ভারতের বাহিরে প্রকাশে তাঁহাদের অসম্মতি হওয়া স্বাভাবিক। কলিকাতার সরকার-সমর্থক পত্রিকা স্টেটসম্যান পর্য্যন্ত দৈনন্দিন করুণ দৃশ্যে বিচলিত হইয়া যে সব ছবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারত সরকারের জনৈক প্রতিনিধি তাহাতেও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া স্টেটসম্যানের কাজকে অনাবশ্যক এবং নাটকীয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাংলার দুর্ভিক্ষের সংবাদ সঠিকভাবে ভারতের বাহিরে পৌঁছিতেছে কিনা এই সংবাদ সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদে কেহ প্রশ্ন করিলে ভাল হয়।

(আশ্বিন ১৩৫০)

সরকারী আশ্রয়-কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব

মফস্বল হইতে কলিকাতায় খাদ্যান্বেষণে আগত সহস্র নরনারী শিশু বৃদ্ধকে আশ্রয়দানের জন্য বাংলা-সরকার কলিকাতার বাহিরে কয়েকটি আশ্রয়-কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যথারীতি

একটি পরিকল্পনাও রচিত হইয়াছিল এবং সাড়ম্বরে সরকারী দপ্তরখানায় এক সাংবাদিক বৈঠকে উহা ব্যাখ্যা করা বাদ যায় নাই। বৈঠকে রাজস্ব-সচিবকে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নগুলির উত্তরদান-প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহাশয় ব্যক্তিগত এবং সরকারের তরফ হইতে এই আশ্বাস দেন যে গ্রামে তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য বিনামূল্যে অন্নসত্র খুলিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয়-কেন্দ্র হইতে অপসারিত করা হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, দুঃস্থগণকে অপসারিত করার পূর্বে তাহাদের শারীরিক সুস্থতার বিষয়ও দেখা হইবে।

যাহাতে দুঃস্থদিগকে এমন কোন অঞ্চলে সরাইয়া লওয়া না হয় যেখানে তাহাদের পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধন ক্ষুণ্ণ হয়, শ্রীযুক্ত জে. কে. বিশ্বাস সেদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বলেন যে, এই কারণেই যে-সকল অঞ্চল হইতে তাহারা আসিয়াছে সরকার তাহাদিগকে সেই সকল অঞ্চলেই প্রেরণ করিবার জন্য উৎসুক।

তাড়াতাড়িতে এক জেলার লোককে অন্য কোন জেলার আশ্রয়-কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হইবে কিনা সে বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, দুঃস্থগণকে কলিকাতার আশ্রয়স্থলে আনার পর তাহাদিগকে স্ব-স্ব গ্রামের নিকটবর্ত্তী কেন্দ্রে পাঠান হইবে। তিনি আরও বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রে এই সকল দুঃস্থকে খাওয়ান এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছাড়াও যাহাতে তাহাদিগের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করা হয় সেজন্য সরকার স্থানীয় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

উল্লিখিত পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বে-সরকারী ভদ্রমহোদয়গণ, বিভিন্ন সাহায্য-সমিতি ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

সভায় প্রকাশ করা হয় যে, কলিকাতা কেন্দ্রে দুঃস্থগণকে আনার কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং শুক্রবার অপরাহ্নের পূর্ব্বেই প্রায় ৫৭০ জন দুঃস্থকে আশ্রয়দান করা হইয়াছে।

এই অতি সামান্য পরিকল্পনাটিও আজ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। একদিন ৫৭০ জনকে সরাইয়া লইবার পর আর এ বিষয়ে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রকার কয়টি আশ্রয় শিবির খোলা হইয়াছে, মোট কত লোক সেখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে ইত্যাদি কোন বিশদ সংবাদই সরকার পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপিত হয় নাই। শহরের রাজপথে রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাহারা মরিতেছে তাহাদের জন্য এরূপ অস্থায়ী আশ্রয় শিবির আরও আগেই করা উচিত ছিল। পরিকল্পনা যদিও বা হইল, উহার কতখানি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বাংলা সরকার এ সংবাদ দিতে পারিতেছেন না কেন? বাংলার বিপর্য্যস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিয়া দেশের স্থায়ী উন্নতি করিবেন, বর্তমান গবর্ম্মেণ্টের নিকট এ আশা কেহ করে না, কিন্তু বিপদের দিনে অস্থায়ী সাহায্যদানেও তাঁহাদের এ কুণ্ঠা ও অক্ষমতা কেন?

(কার্ত্তিক ১৩৫০)

কেন্দ্রীয় রিলিফ ফণ্ড

বাংলার প্রধানমন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দীন ভারতের সর্ব্বত্র দেশবাসীর নিকট এক আবেদনে বাংলার অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী যে "সেন্ট্রাল রিলিফ ফণ্ড' খুলিয়াছেন তাহাতে সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়াছেন। অর্থ সাহায্য কলিকাতার পোলক ষ্ট্রীটস্থ পোলক হাউসে সেন্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডের

সেক্রেটারী মিঃ এ এশাহ আই সি এস-এর নিকট পাঠাইতে হইবে কিংবা সর্ নাজিমুদ্দীনের নিকট "সেন্ট্রাল রিলিফ ফণ্ড" চিহ্নিত করিয়া পাঠাইতে হইবে। খাদ্য বা অন্যান্য সাহায্য অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট ৭নং চার্চ লেন, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। তিনি প্রয়োজন হইলে এই সমস্ত জিনিষ আনাইবার অনুমোদন সংগ্রহ করিবেন।

একটি কেন্দ্রীয় রিলিফ ফণ্ডের অভাব অনুভব করিয়াই নাকি সর্ নাজিমুদ্দীন এই বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এজন্য সরকারী আওতায় স্বতন্ত্র ফণ্ড খোলার কোন প্রয়োজন ছিল কি? বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ডটিকে কেন্দ্রীয় ফণ্ডে পরিণত করিয়া উহার কর্মকর্তাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করিলে কি ক্ষতি ছিল? সর্ নাজিমুদ্দীনের গবর্নেণ্ট বর্তমান দুর্ভিক্ষে সাহায্য-দান-ব্যবস্থায় যে দীর্ঘসূত্রতা, অদূরদর্শিতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার পর উহাদের হাতে সরকারী অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের নিকট হইতে টাকা আসিলেও তাহা যথাযথ সাহায্যে পরিণত হইতে কতদিন লাগিবে তাহা সঠিক বলা অসম্ভব।

(কার্তিক ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষে কাঁথির অবস্থা

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি হইতে শ্রীযুক্ত অবন্তীকুমার পান ৩রা সেপ্টেম্বরের 'যুগান্তরে' লিখিয়াছেন,

"গত প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের পর হইতে মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার অধিবাসীদিগকে রিলিফ দিয়া সরকার এ পর্যন্ত বাঁচাইয়া আসিতেছিলেন, গত ২০ শে আগষ্ট হইতে গবর্নেণ্ট উক্ত মহকুমার সর্বত্র রিলিফ বন্ধের আদেশ দিয়াছেন। শুধু শহরেই প্রতি দিন গড়ে ১৫। ১৬ জন করিয়া মরিতেছে। গত ২১শে আগষ্ট রবিবার শহরের উপরেই ২৫ জন মারা যায়। মফস্বলের ত কথাই নাই। এখন আর পোড়াইতে না পারিয়া মৃতদেহ ভাসাইয়া দেওয়া হইতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা যথেষ্ট থাকিলেও, এত দিন ধরিয়া মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য ছিল ভিক্ষুকশ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু রিলিফ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ভিক্ষুকশ্রেণীর অন্তর্গত হইল।

৮ই সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী ডাঃ জি সি ভৌমিক ইউনাইটেড প্রেসের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

"তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম হইতে বহু লোকের মরে যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। অনাহার বা ম্যালেরিয়াতে ইহারা মারা যাইতেছে। পূর্ব্ব-নন্দীগ্রামেই বেশী লোক মরিতেছে। মরা পোড়াইবার লোক না পাওয়াতে মৃত-দেহগুলি খালে ও রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। চাউলের অভাবে অন্নসত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বহু লোক শয্যাগত হইয়া রহিয়াছে। অবিলম্বে সাহায্য দরকার। সুতাহাটায় অনাহারে দৈনিক ৩০ জন করিয়া মারা যাইতেছে। মহিষাদলে অনাহারে দৈনিক প্রায় ৭৫ জন মারা যাইতেছে। তমলুক শহরে দৈনিক ৪/৫ জন এবং তমলুক মহকুমায় প্রায় ৫০ জন মারা যাইতেছে।"

৯ই সেপ্টে ম্বরের আর একটি সংবাদে প্রকাশ,

"কাঁথি মহকুমার অবস্থা দিনের পর দিন অতি সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিতেছে, মায়েরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না, প্রত্যহ শহরের রাস্তায় ৪/৫ বছরের অস্থিকঙ্কালসার শিশুরা একা একা খাদ্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, জিজ্ঞাসা করিলে

তাহারা বলে যে, তাহাদের মাতাপিতার মৃত্যু হইয়াছে অথবা শিশুদিগকে শহরে ফেলিয়া দিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই সকল শিশুর রক্ষক কেহ নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাস্তায় পড়িয়া মরিতেছে। শহরের রাস্তায় অনাহারে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে এই শহরের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে ১২৭ জন লোক অনাহারে রাস্তায় পড়িয়া মরিয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের মৃত্যুসংখ্যাও ভয়াবহ।"—যুগান্তর

বাংলা-সরকারের বাজেটে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করিবার পরও কাঁথির এই দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য টাকা জুটিল না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অত ঝঞ্ঝার পর হইতেই মেদিনীপুরের প্রতি বাংলা-সরকারের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। যতখানি সাহায্য মেদিনীপুরকে করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই। এই জেলায় দুর্ভিক্ষ যখন করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে সেই সময় হঠাৎ সেখানে সরকারী রিলিফ বন্ধ করা হইল কেন? কলিকাতা কর্পোরেশনের 'মেয়র রিলিফ ফণ্ডে' মেদিনীপুরের নামে যে ৮০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা অবিলম্বে একমাত্র মেদিনীপুরের জন্যই ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(কার্ত্তিক ১৩৫০)

বর্তমান দুর্ভিক্ষে নারী রক্ষার প্রয়োজন

বাংলার দুর্ভিক্ষে বহু জটিল সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। পারিবারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন বহু নারী, যুবতী ও কিশোরী আহারান্বেষণে পথে পথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় কুলোকের প্ররোচনায় পড়িয়া ইহারা অবাঞ্ছনীয় জীবনযাত্রায় বাধ্য হইবে ইহা আদৌ অস্বাভাবিক নহে। অনাথ বালকদিগকে আশ্রয় দানের একটু সামান্য চেষ্টা হইলেও নারীদের আশ্রয়-দানের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। এই গুরুতর সমস্যাটি আর উপেক্ষা করা উচিত নহে। নিখিল-ভারত মহিলা-সম্মেলনের কর্ম্মিবৃন্দ এদিকে মনোযোগ দিতে পারেন। মহিলা-প্রতিষ্ঠানগুলিই এই কার্য্যে অগ্রণী হইলে ভাল হয়।

(কার্ত্তিক ১৩৫০)

বরিশাল হিতৈষীর নিকট জামানত দাবি

বরিশাল হিতৈষীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য এই পত্রিকাটির নিকট পাঁচ শত টাকা জামানত দাবি করা হইয়াছে। দশ দিনের মধ্যে এই টাকা দাখিল করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বরিশাল হিতৈষী দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার মতবাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং এজন্য সরকারের নিকট হইতে লাঞ্ছনাও ভোগ করিয়াছে। এ আদেশ তাহার নিকট নূতন নয়। সরকারী কোপ বরিশাল হিতৈষীর ন্যায় পত্রিকাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না, দেশবাসীর এই বিশ্বাস তাহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

(কার্ত্তিক ১৩৫০)

বাংলা-সরকারের চাউল ক্রয়

১১ই সেপ্টেম্বরের যুগান্তর পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হয় ঃ

"এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ প্রচার করা হইয়াছে যে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে গবর্মেন্ট কলিকাতাতে ২৪৲টাকা মণ দরে ২৫ হাজার মণ চাউল খরিদ করিয়াছেন। চাউলের দর যখন কলিকাতায় ২০ টাকা মণ ছিল, তখন তাহা সাত-আট টাকায় নামাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া যাঁহারা আস্ফালন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আজ ২৪ টাকা দরে চাউল কিনিয়া লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে চাউলের দর কমিতেছে। কিন্তু এই ২৪৲টাকা মণ দরে হঠাৎ এক দিন ২৫ হাজার মণ চাউল খরিদের সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাঠ করিয়া স্বতঃই কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়, যথা—১) এই চাউল কাহার নিকট হইতে খরিদ করা হইয়াছে, ২) চাউলটা আউস না আমন, ৩) কবে এই চাউল কলিকাতায় আসিয়াছে, ৪) বিক্রেতা কত দরে খরিদ করিয়াছিল, ৫) কত দিন এই চাউল বিক্রেতার হাতে ছিল, ৬) এই চাউলের জন্য তাহার লাইসেন্স ছিল কি, ৭) লাইসেন্স থাকিলে তাহার নিকট যে এই চাউল আছে তাহা সে জানাইয়াছিল কি, ৮) জানাইয়া থাকিলে কবে জানাইয়াছিল, ৯) না জানাইয়া থাকিলে গবর্মেণ্ট এই চাউলের সন্ধান কি করিয়া পাইলেন, ১০) বিক্রেতা স্বেচ্ছায় এই দরে গবর্মেণ্টকে চাউল দিয়াছে, না গবর্মেণ্ট এই দরে বিক্রয় করিতে তাহকে বাধ্য করিয়াছেন, ১১) এই চাউল অসামরিক না সামরিক বিভাগের জন্য খরিদ করা হইয়াছে? আশা করি, গবর্মেণ্ট অবিলম্বে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া অকস্মাৎ এভাবে ২৫ হাজার মণ চাউল খরিদ করার সংবাদ প্রচারের প্রকৃত তাৎপর্য্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। অন্যথায় এই প্রচারকার্য্য নানা সন্দেহ উদ্রেক করিবে।"

ইহার চার দিন পর ১৫ই সেপ্টেম্বর যুগান্তর আবার লেখেন,

"কয়েক দিন আগে প্রচারিত হইয়াছিল যে, ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলা-সরকার ২৪৲টাকা মণ দরে ২৫ হাজার মণ চাউল খরিদ করিয়াছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে যে চাউলের উচ্চতম মূল্য ২৪৲ টাকা হইবে ইহা পূর্বেই ঘোষিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় এক দিন আগেই ঐ দরে চাউলপ্রাপ্তির সংবাদ যে একটা সুসংবাদ তাহতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সংবাদটি প্রচার করার উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। প্রশ্ন কয়েকটির উত্তর পাওয়া যায় নাই। ইত্যবসরে জনৈক পত্রপেরক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, উক্ত ৯ই তারিখেই নাকি সরকারের তরফে মল্লিক ষ্ট্রীটের এক গদিতে বসিয়া ২৯৲-৩০৲টাকা মণ দরে বহু চাউল এবং ঐ তারিখেই টালিগঞ্জের কোনও এক রাইস মিল হইতে ২৮৸০ মণ দরে ছয় শত মণ চাউল খরিদ করা হইয়াছে। কথাটা সত্য হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, একই দিনে সরকার বাহাদুর ২৪৲ টাকা মণ দরে চাউল খরিদ করিতে পারিলেন অথচ সরকারের তরফে ক্রেতারা বেশী দাম দিয়া কিনিলেন কেন? অধিকন্তু পরদিনই যে চাউল ২৪৲টাকা মণ দরে পাওয়া যাইবে একদিন অপেক্ষা না করিয়া সেই চাউল বেশী দরে খরিদ করা হইল কেন? যদি সত্য সত্যই ঐরূপ খরিদ করা হইয়া থাকে, তবে লোকসানটা কে দেবে, সরকার বাহাদুর, না এজেণ্টগণ?"

বাংলা-সরকার ইহারও কোন জবাব দেন নাই। ১৯শে সেপ্টেম্বর দৈনিক বসুমতী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "উড়িষ্যা হইতে যে লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল আমদানী করা হইয়াছিল তাহা

আসাম সরকার কিনিয়াছিলেন কি না? যদি কিনিয়া থাকেন তবে কেন? উহা কি "Carrying Coal to Newcastle" নহে? সেই চাউল আবার বাংলায় আসে নাই ত?"

পঞ্জাব হইতে বাংলা-সরকারের বিরুদ্ধে গম লইয়া অতিলাভের অভিযোগ উঠিয়াছে। উপরোক্ত মন্তব্যগুলি হইতে আশঙ্কা হয় চাউল ক্রয় ব্যাপারেও বাংলা-সরকার কলুষমুক্ত নহেন। অন্ততঃ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিশ্চয়ই করা উচিত। বাংলার দুইটি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রের প্রকাশ্য অভিযোগ নীরবে এড়াইবার চেষ্টা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। চাউল ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে বাংলা-সরকারের কার্য্যকলাপের বিশদ বিবরণ প্রকাশের দাবি আরও তীব্র হওয়া দরকার।

(কার্তিক ১৩৫০)

বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ডাঃ দেশমুখের বিবৃতি

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ডাঃ দেশমুখ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,"বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অবস্থার পর্যালোচনা করিলে উহার প্রতীকার প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে পারে। কিছুকাল ধরিয়া শোচনীয় অবস্থা চলিতেছে। উক্ত প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের একজন অসামরিক সরবরাহ সচিব আছেন। তিনি শুধু বিবৃতি দেওয়া ছাড়া এ পর্য্যন্ত স্বয়ং অথবা তাঁহার গবর্ন্মেণ্টের মারফৎ কিছুই করেন নাই। তিনি ফসলের কোনও আনুমানিক হিসাব দেন নাই এবং কোনও বরাদ্দ ব্যবস্থা করেন নাই। মজুত করার বিরুদ্ধে ও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে স্থায়ী জমিদারগণ যাহাতে তাঁহাদের মজুরগণকে নগদ টাকা না দিয়া অন্য প্রকারে পারিশ্রমিক দেন, তিনি তাঁহাদের সম্পর্কে সেরূপ কোন ব্যবস্থা করেন নাই। শিল্পপতিগণ যাহাতে কেবল তাঁহাদের শ্রমিকগণকে খাওয়াইবার উদ্দেশ্যে মজুত করিয়া লাভ না করিতে পারেন তিনি সে রূপ কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। উক্ত প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট সম্পূর্ণরূপে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।"

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বাংলা সরকার একটিও স্পষ্ট কথা বলিতে চাহিতেছেন না। খাদ্যাভিযানের ফলে কি পরিমাণ ঘাট্‌তি ধরা পড়িয়াছে, ঘাট্‌তি পূরণের জন্য তাঁহারা কোন জেলায় এযাবৎ কত শস্য পাঠাইয়াছেন, কোন্ জেলা হইতে কত ধান ও চাউল ক্রয় করা হইয়াছে এবং কোথায় কত বিক্রয় করা হইয়াছে, কোন্ প্রদেশ হইতে কত ফসল এ যাবৎ আসিয়াছে এই সব অত্যাবশ্যক তথ্য গবর্ন্মেণ্ট কিছুতেই প্রকাশ করিতে চাহিতেছে না। গোড়া হইতেই এইভাবে ঢাক-ঢাক নীতি অবলম্বন করিবার ফলে বাংলা-সরকার আগে শুধু বাঙালীর নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও আস্থা হারাইতেছেন। ডাঃ দেশমুখের বিবৃতি তাহারই পরিচয়।

(কার্তিক ১৩৫০)

মিঃ সুরাবর্দ্দির বিবৃতি

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মিঃ সুরাবর্দ্দি বাংলার অন্নসমস্যা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে কাজের কথা একটিও নাই। তবে এত দিন পরে দুর্ভিক্ষের কথাটা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ সুরাবর্দ্দি অন্নসমস্যার ১১টি কারণ দেখাইয়াছেন : ১) ১৯৪২ সালে আউস ধানের অভাব, ২) ১৯৪২-৪৩

সালে আমন ধানের অভাব, ৩) মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণায় বাত্যা, ৪) মড়কের জন্য ধান নষ্ট হওয়া, ৫) নৌকা-নিয়ন্ত্রণ-নীতি, ৬) সমুদ্রোপকূল হইতে লোকাপসরণ ৭) বর্মা হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীর দল, ৮) কারখানা-অঞ্চলে মজুরসংখ্যা বৃদ্ধি, ৯) বর্মা হইতে চাউল আমদানী বন্ধ, ১০) অতিরিক্ত মিলিটারী আমদানী, এবং ১১) অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহুল পরিমাণে আমদানী হ্রাস।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় বৎসরাধিক কাল পূর্ব হইতেই আসন্ন বিপদ অনুভব করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট কারণ পাওয়া গিয়াছিল। অন্যত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর যে-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের কি কি ব্যবস্থা ফেমিন কোডে আছে তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাংলা সরকার দুর্ভিক্ষের লক্ষণগুলির প্রতি একেবারেই মনোযোগ দেন নাই। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহাদের চৈতন্য হইয়াছে। মিঃ সুরাবর্দ্দি দুর্ভিক্ষের যে ১১টি কারণ দেখাইয়াছেন, সময় থাকিতে সেগুলি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এ দুর্ভিক্ষ আজ দেখা দিত না।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যবৃন্দের কর্তব্য পালনে ঔদাসীন্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নিয়োগী যত সতর্কতার সহিত প্রাদেশিক ফেমিন কোড অধ্যয়ন করিয়া বাংলা-সরকারের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন সদস্য সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইহাদের বক্তৃতার অধিকাংশই ভাবপ্রবণতা ও উচ্ছ্বাসে পূর্ণ ; নিজ নিজ জেলায় জেলায় কি ঘটিতেছে তাহার সঠিক তথ্যপূর্ণ বিবরণ পর্যন্ত উহার ভিতর পাওয়া যায় না। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণের প্রধান দায়িত্ব নিজ নিজ নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রয়োজনের কথা যাচাই করা, তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা এবং সরকারের কোন কাজে অন্যায় অবিচার অথবা অক্ষমতার সংবাদ পাওয়া গেলে উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর পরিষদে প্রশ্নোত্তরের আকারে তাহা প্রকাশ করিয়া গবর্মেণ্টকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অতি সামান্য দুই এক জন ভিন্ন আর কেহই এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। বেতন ও ভাতায় মাসিক ইহারা প্রায় তিন শত টাকা করদাতাদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। সেদিক দিয়াও ইহাদের কর্তব্য পালিত হয় নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে খাদ্য-সমস্যা লইয়া যেভাবে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল, মিঃ সুরাবর্দ্দির বিবৃতির যেরূপ সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন ছিল, সদস্যবৃন্দের অক্ষমতার জন্য তাহা হয় নাই।

(কার্তিক ১৩৫০)

ইস্পাহানী কোম্পানীকে সাড়ে চারি কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে কি না?

বাংলার নব-নিযুক্ত লাট সর্ টমাস রাদারফোর্ড কার্যভার গ্রহণ করিবার পর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে একখানি খোলা চিঠি লেখেন এবং কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিতে ৮ই সেপ্টেম্বর উহা প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কথার মধ্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ঐ পত্রে নিম্নলিখিত গুরুতর অভিযোগটি করেন :

"অবাধ বাণিজ্যের আমলে বাংলা-সরকার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলি হইতে যে উপায়ে খাদ্যশস্য কিনিতেছিলেন তাহা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। মুস্লিম লীগ দলভুক্ত বলিয়া একটি পেয়ারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে কোন টেণ্ডার আহ্বান না করিয়াই এই ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত এ

প্রতিষ্ঠানকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক এ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি, কেননা, আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এই সকল কেনা বেচার কালে বাংলার জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই। যদি স্বাধীনভাবে তদন্ত গৃহীত হয় তবে আমরা প্রমাণ করিতে পারিব যে, মন্ত্রিমণ্ডল বাংলার প্রতি কিরূপ অবিচার করিয়াছেন। তাঁহারা জনকল্যাণ অপেক্ষা দলগত স্বার্থবোধ দ্বারাই অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন।"

এই খোলা চিঠি প্রকাশের সময় মিঃ সুরাবর্দ্দি লাহোরে ছিলেন। বোম্বাই ক্রনিকেলের নিজস্ব সংবাদদাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, একথা সত্য কি না যে গবর্ন্মেণ্টের দলভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানকে সরকারের সোল এজেন্ট রূপে চাউল ক্রয়ের জন্য প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে চার কোটি টাকারও বেশী আগাম দেওয়া হইয়াছে এবং ইহারা বাংলার বাহিরে যে-দরে চাউল ক্রয় করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক চড়া দরে বাংলা-সরকারকে উহা বিক্রয় করিয়াছে। বাংলা সরকার নিজেই বা কেন অপর প্রদেশ হইতে সরাসরি চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন না? মিঃ সুরাবর্দ্দি এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন, "বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সব প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার যথোচিত জবাব দেওয়া হইয়াছে। তিনি পরিষদ গৃহের বাহিরে এই সব কথা বলিলে আমি তাঁহাকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করিব। আমি জানি সে সাহস তাঁহার নাই।" মিঃ সুরাবর্দ্দির লাহোর হইতে প্রদত্ত এই বিবৃতির পর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট বলেন, "মিঃ সুরাবর্দ্দির এই ধৃষ্টতা ও ভীতিপ্রদর্শনের পরও আমি আমার অভিযোগের পুনরুক্তি করিতেছি। কটূক্তির দ্বারা তথ্য উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যে-সব তথ্য এবং মন্ত্রীদের যে-সব অপকীর্ত্তি ও মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পাইয়াছে, মন্ত্রিত্বের ইতিহাসে সে কেলেঙ্কারীর তুলনা নাই। বিষয়টি আরও বেশী গুরুতর এই জন্য যে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর জীবন যখন বিপন্ন, সেই সময়ে এই সব কেলেঙ্কারী চলিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দ্দি এবং তাঁহার বন্ধুদের যদি সাহস থাকে, তাঁহারা প্রকাশ্য এবং নিরপেক্ষ তদন্ত-কমীটির সম্মুখে দাঁড়াইতে সম্মত হউন। নিজের কথা আমি বলিতে পারি যে এরূপ প্রস্তাব মানিয়া লইতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।" এই বিবৃতি প্রদত্ত হয় ১৩ই সেপ্টেম্বর। ১৮ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা-পরিষদ গৃহে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ আবার অভিযোগের পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন : "মিঃ সুরাবর্দ্দির যদি সাহস থাকে তবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব যেন পরিষদে পেশ করেন :—

১) ইস্পাহানী কোম্পানীকে মোট কত টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ তারিখে দেওয়া হইয়াছে।

২) গবর্ন্মেণ্ট ও ইস্পাহানী কোম্পানীর চুক্তিপত্র।

৩) বাংলার বাহির হইতে কোন্ কোন্ তারিখে কোন্ কোন্ স্থান হইতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি অথবা এজেন্টের নিকট হইতে কত কত দরে ইস্পাহানী কোম্পানী চাল খরিদ করিয়াছেন। সাড়ে চার কোটি টাকারও বেশী ইস্পাহানী কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে। তাহার হিসাব জানার অধিকার বাংলাবাসীর আছে, বিশেষতঃ যখন মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত ইস্পাহানী কোম্পানীর রাজনৈতিক আঁতাত রহিয়াছে। যদি মন্ত্রিমণ্ডলীর কোন একটুও আত্মমর্য্যাদা বোধ থাকে (আমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে) তাহা হইলে তাঁহারা এই সমস্ত খবর বাংলাদেশকে জানাইবেন।"

ইহার পর প্রায় সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, মিঃ সুরাবর্দ্দি পরিষদ-গৃহে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের স্পষ্ট অভিযোগের পরিষ্কার জবাব দেন নাই।

(কার্তিক ১৩৫০)

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন কোন সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

বোম্বাই ক্রনিকেলের সংবাদদাতা লাহোরে মিঃ সুরাবর্দ্দিকে আরও একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেটি এই ঃ "বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন কোন সদস্য সরকারের টাকায় খাদ্যদ্রব্যের দোকান খুলিয়াছেন এবং ফলে চাউল ও আটা দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদের হাতে না পড়িয়া চোরাবাজারে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া যে-সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা সত্য কি না?" মিঃ সুরাবর্দ্দি অবশ্য এই অভিযোগও অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথার মূল্যে যেভাবে সন্দেহ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এই অস্বীকৃতিতে আস্থা স্থাপন করা কঠিন। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক, বিশেষতঃ কথাটা যখন বাংলার বাহিরে উঠিয়াছে। পরিষদের কর্তব্য পরায়ণ সদস্য যাঁহারা আছেন, বাঙালীর স্বার্থের খাতিরে তাঁহাদেরই এবিষয়ে অগ্রণী হইয়া অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

(কার্তিক ১৩৫০)

দৈনিক ২৭ হাজার মণ গম যায় কোথায়?

পঞ্জাব হইতে দৈনিক হাজার টন অর্থাৎ ২৭$\frac{১}{২}$ হাজার মণ গম মাসাধিক কাল যাবৎ বাংলায় আসিতেছে, তথাপি বাংলায় আটা সরকারী দরের আড়াই গুণ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আটার সরকারী দর ছয় আনা, কিন্তু অস্থায়ী লাট সর্ টমাস রাদারফোর্ড নিজেই উহা চৌদ্দ আনায় বিক্রয় হইতে দেখিয়াছেন। কলিকাতা ও শহরতলীতে মাসিক প্রায় ৪৬ হাজার টন আটা প্রয়োজন, তন্মধ্যে প্রায় ৩০-৪০ হাজার টন হিসাবে আসিতেছে, তৎসত্ত্বেও আটা দুর্মূল্য হইবার কারণ কি তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন ছিল। সম্প্রতি লাহোরের সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ সুরাবর্দ্দির বিবৃতি হইতে এ সম্বন্ধে একটুখানি আলোর সন্ধান যেন মিলিতেছে।

মিঃ সুরাবর্দ্দি বলিয়াছেন, "গত আগষ্ট মাসে আমাদিগকে ৪০ হাজার টন গম পাঠানো হইয়াছে। গম পাওয়া মাত্র আমরা উহা পিষিবার জন্য মিলে পাঠাইয়া দিই। প্রাপ্ত আটার একটা অংশ যায় কলিকাতার মিলগুলিতে তাহাদের শ্রমিকদের জন্য, তার পর কতক যায় নিয়ন্ত্রিত দোকানে, কতক রুটির কারখানায় এবং মফস্বলের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে।" এই উক্তি হইতে সন্দেহ হয় যে প্রাপ্ত আটার মোটা অংশটা গিয়া মজুত হয় মিল-মালিকদের গুদামে। ইহাদের মধ্যে প্রধান যাহারা তাহাদের অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ এবং মিল-চালনা ছাড়া কেনা-বেচা ব্যবসায়ও অনেকের আছে। কলিকাতায় গত খাদ্যান্বেষণ অভিযানে ইহাদের কাহার গুদামে কত খাদ্য মজুত ছিল, ইহাদের সাপ্তাহিক প্রয়োজন কত তাহার কোন হিসাব আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রমিকদের নামে ক্রীত আটার কতটা অংশ প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকেরা পাইতেছে এবং কতখানি চোরাবাজারে প্রবেশলাভ করিতেছে এই তথ্য উদঘাটিত হওয়া দরকার। যে-অঞ্চলের প্রয়োজন ৪৬ হাজার টন সেখানে

৪০ হাজার টন হিসাবে আমদানীর পর বাজার-দর কোন রকমেই ছয় আনার স্থলে চৌদ্দ আনা থাকিতে পারে না।

(কার্তিক ১৩৫০)

বাংলা-সরকার ও মজুতদার

গোপন মজুতদারদের প্রতি বাংলা-সরকার মাঝে মাঝে ইস্তাহার জারি করিয়া হুমকি দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহাদের কার্য্যে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করেন না। ইস্পাহানী কোম্পানীর চাউল ক্রয়ের অবাধ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আটা মজুতের ব্যাপারটি বাংলা-সরকার চাপিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছেন কি না এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে সংশয় হওয়া স্বাভাবিক। সন্দেহের প্রধান কারণ, মিল-মালিকদের গুদামে মজুত আটা ও তাহাদের মাসিক বা সাপ্তাহিক ক্রয়ের পরিমাণ প্রকাশে বাংলা-সরকারের অনিচ্ছা। এই তথ্য প্রকাশ করিলে ভারতরক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিবার কোন কারণই নাই। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সর্ টমাসের প্রতি খোলা চিঠিতে এ বিষয়ে অভিযোগ করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : "গবর্ন্মেণ্ট এই প্রদেশের অভ্যন্তরেও যে-প্রণালীতে শস্যাদি হস্তগত করিয়াছেন আমাদের মতে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। গত জুন মাসের বাংলার বহু ঢক্কানিনাদিত খাদ্যাভিযান সম্পর্কে সাধারণে কি বলে, তাহাও আপনাকে জানিতে হইবে। খাদ্য-অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে কোন হিসাব এখনও প্রকাশ করা হয় নাই, আমরা অবিলম্বে উহা প্রকাশ করিবার দাবী জানাইতেছি। সরকারী হিসাব অনুসারে বাংলার কোন্ এলাকায় খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত আছে, কোথায় বা আছে ঘাট্তি তাহা জানিবার কোন উপায় আমাদের নাই। বড় বড় ব্যবসায়ী ও মজুতদারদিগকে এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া যাহা খুশী মূল্যে চাউল কিনিতে দেওয়ার ফলেই বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাংলার পল্লী অঞ্চল হইতে প্রকৃতপক্ষে সকল মজুত খাদ্যশস্যই সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে এইরূপ বেপরোয়া ভাবে ক্রয় করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। সম্প্রতি গবর্ন্মেণ্ট সরবরাহের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াই মূল্য-নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করিয়াছেন। এই আদেশ কার্য্যকরী হইবার পূর্বে বড় বড় ব্যবসায়ী ও মজুতদারগণ এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া চাউল ও ধান ক্রয় করিবার জন্য এক সপ্তাহেরও বেশী সময় পাইয়াছিলেন। ইহার অনিবার্য্য ফলরূপে চোরাবাজার ও ফাটকাবাজী দেখা দিয়াছে। যেখানেই গবর্ন্মেণ্ট চাউল ক্রয় করিয়াছেন, সেখানেই বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশা দেখা দিয়াছে। ডিসেম্বর মাসে আমন ধান উঠিবে। তাহার পূর্বে গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক চাউল ক্রয়ের পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন না হইলে আমাদের উদ্ধারের কোন পথই থাকিবে না।

"যে উপায়ে শস্যাদি বণ্টন করিয়া দেওয়া হইতেছে আমাদের মতে তাহাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। আমরা এ বিষয়েও আপনাকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলি। যদি বণ্টন-ব্যবস্থাতে গবর্ন্মেণ্ট সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করেন, তবে তাহার ফল মারাত্মক হইবে। বণ্টন ব্যবস্থায় অনেক দুর্নীতির অভিযোগও উঠিয়াছে। এই প্রদেশে সেনাদলের জন্য এবং রেলওয়ে ও বড় বড় মালিকদের হাতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত আছে? এই সকল খাদ্যদ্রব্যের এক অংশ কি অসামরিক জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া যায় না?"

(কার্তিক ১৩৫০)

আহার্যের সরকারী পরিমাণ

বাংলা সরকার জনপ্রতি দৈনিক আহার্যের যে বরাদ্দ ঠিক করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহা বাড়াইয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন: "প্রাপ্ত বয়স্ক এবং আসন্ন প্রসবা ও প্রসূতিদের জন্য মাথাপিছু ৮ ছটাক ; অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কাদের জন্য মাথাপিছু ৬ ছটাক এবং শিশুদের জন্য মাথাপিছু ৪ ছটাক করিয়া দুই বারের আহার হিসাবে বিলি করা হইবে। এই ব্যবস্থা দুই দফায় কার্যকরী করা হইবে। আপাততঃ কার্যরত প্রাপ্তবয়স্ক এবং আসন্ন প্রসবা ও প্রসূতিদের জন্য মাথাপিছু ৮ ছটাক, অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু ৪ ছটাক এবং শিশুদের জন্য মাথাপিছু ২ ছটাক নির্দ্ধারিত থাকিবে। দ্বিতীয় দফায় সংশোধিত বরাদ্দের সর্বোচ্চ পরিমাণ দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকরী করা হইবে। এই ব্যবস্থা যতদুর সম্ভব শীঘ্র কার্যকরী হইবে।"

মানুষের জীবনধারণের পক্ষে এই পরিমাণ আহার্যও যথেষ্ট নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাংলা দেশে বড় বড় চিকিৎসকের অভাব নাই, মেডিকেল এসোসিয়েশন প্রভৃতিও আছে। ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কি এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না ? আহার্যের যে পরিমাণ পূর্ব্বে বরাদ্দ করা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সর্ জগদীশপ্রসাদ বলিয়াছিলেন যে ইহাতে মানুষ বাঁচে না, মরিতে একটু সময় লাগিবে মাত্র। বর্তমান হার প্রচলিত হইলেও, যদি কখনও হয়, অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহা ত মনে হয় না।

(কার্তিক ১৩৫০)

সরকারী বিতরণ কেন্দ্রের খিচুড়ী

বঙ্গীয় মেডিকেল রিলিফ কমিটি একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"বাংলা-সরকার লঙ্গরখানায় যে পরিমাণ ও যে শ্রেণীর খিচুড়ী বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা হইতে প্রতিবারে মাত্র ৮২৫ ক্যালোরি পাওয়া যাইতে পারে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাব ব্যতীত উহাতে অত্যাবশ্যক খাদ্য-উপাদানেরও যথেষ্ট অভাব আছে। তদুপরি উহাতে বাজরার পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের অনেকেই উহা খাইয়া পেটের অসুখে ভুগিতেছে।"

পাঁচ সহস্রাধিক খিচুড়ী-বিতরণ-কেন্দ্র হইতে প্রত্যহ বিশ লক্ষাধিক লোককে এত দিন ধরিয়া এই অমূল্য বস্তুই পরিবেশন করা হইয়াছে। সর্ জগদীশপ্রসাদ এই খিচুড়ীর পরিমাণ ও নমুনা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাতে মানুষ বাঁচে না, মরিতে একটু সময় লাগে মাত্র।" সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এই খিচুড়ীর প্রতি খাদ্যসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে উহা খাইয়া একটি বড় ইঁদুরও বাঁচিতে পারে না। বাংলা-সরকার ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে সেপ্টেম্বর মাসে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন এখনও তাহা কোন কেন্দ্রে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

সেবাকার্য্যে বাধাদান

বর্তমান দুর্ভিক্ষে জনসাধারণের তরফ হইতে যে-সব সাহায্যের আয়োজন হইয়াছে গবর্ন্মেণ্ট তাহাতে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন, এই অভিযোগ অনেকে করিয়াছেন। ইউনিভার্সিটি

ইন্‌ষ্টিটিউটের জনসভায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, যেন একটি সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত উপায়ে বে-সরকারী সাহায্য প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং শ্রীমতী রাজন নেহরুও এই একই উক্তি করিয়াছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছেন,

"সরকারী লঙ্গরখানাসমূহের সংখ্যা যে শুধু প্রয়োজনের অপেক্ষা বহু কম তাহা নয়, তথায় যে ঘেঁট দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ এত কম যে, লোকে অবাক্ হইয়া ভাবে, কেন এই ঘেঁট একান্তই দেওয়া হইতেছে। অনেক জেলার লঙ্গরখানার ঘেঁটের বর্ণ একেবারে কাল। আমাকে অনেকে বলিয়াছেন যে, বে-সরকারী লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সহিত সহযোগিতা করেন না। উপরন্তু সকল সময় সরকারী কাজের সমালোচনা করিয়া কাজের বিঘ্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যে সত্য নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমি জনসাধারণের নিকট একটি বিষয় জানাইতে চাহি। আমি কাঁথিতে যে ভদ্রলোকের অতিথি হইয়া গিয়াছিলাম তিনি নিজ ব্যয়ে প্রত্যহ দুই শত দুঃস্থকে অন্নদান করিতেছেন। দলে দলে লোকে এখানে আসিত। কিন্তু আমি যেদিন সেখানে যাই সেই দিন স্থানীয় মহকুমা হাকিম তাঁহাকে তাঁহার লঙ্গরখানা তুলিয়া দিতে নির্দেশ দেন। ইহার কারণ-স্বরূপ বলা হয় যে, তাহার লঙ্গরখানার দরুণ লোকে বহুদূর হইতে শহরে আসিতেছে। ফলে শহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি এক্ষেত্রে মাত্র এইটুকুই বলিতে চাই যে, এই শহরের কোথাও স্বাস্থ্য রক্ষার কোন ব্যবস্থাই আমার নজরে পড়ে নাই। আমি এ সম্পর্কে খবর জানিতে চাহিলে আমাকে বলা হয় যে, সেখানে ধাঙ্গড় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।"

এইসব অভিযোগ প্রকাশিত হইবার প্রায় এক মাস পরও অবস্থা যে পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে, ১০ই নভেম্বরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘাটালের দেশসেবক ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পত্র তাহার প্রমাণ। ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন, "ঘাটালের মহকুমা হাকিমের স্বাক্ষরযুক্ত পত্রে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বে-সরকারী লোকেরা মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অপর কোথাও কোন খাদ্য-বিতরণ কেন্দ্র খুলিতে পারিবেন না এবং সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহাদিগকে খাতাপত্র রাখিতে হইবে। ইহারা প্রকাশ্য বাজার হইতে চাউল ও আটা ক্রয় করিতেও পারিবেন না, সরকারী গুদাম হইতে উহা ক্রয় করিতে হইবে।" মেদিনীপুরে জনসেবায় বাধাদান বাংলা সরকাররে পক্ষে নুতন নহে। গত বন্যার পর হইতে ইহা স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

লর্ড ওয়াভেলের বাংলায় আগমন

বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কয়েক দিনের মধ্যেই লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় আসিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। সাত মাসের মধ্যেও লর্ড লিনলিথগো বাংলায় আসিবার সময় পান নাই, কিন্তু লর্ড ওয়াভেল সাত দিনের মধ্যেই সে সময় করিয়া লইয়াছিলেন। বড়লাট যে-সব স্থানে গিয়াছেন সেখানে পূর্ব্বে কোন সংবাদ দেন নাই। মন্ত্রীদের কেহ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না ইহা উল্লেখযোগ্য। পরিদর্শনের পর বড়লাট মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারী প্রভৃতিদের লইয়া সভা করেন এবং উহাতে নিম্নোক্ত কার্য্যসূচী স্থির হয় ঃ

১) অতঃপর কলিকাতায় যে-সকল দুর্গত রহিয়াছে তাহাদিগকে সাময়িক আশ্রয়স্থলে অপসারণ করিতে হইবে। সেখানে তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে, বস্ত্রাদি দেওয়া হইবে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে স্থানান্তর করার উপযুক্ত মনে হইলে নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করা হইবে। ২) যেহেতু কলিকাতা হইতে বিভিন্ন জেলায় খাদ্যশস্য প্রেরণে নানাপ্রকার অসুবিধা বর্তমান জরুরি অবস্থার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, সেহেতু যানবাহন পরিচালনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক সামরিক কর্মচারীর সহায়তা যাহাতে বাংলা-সরকার পাইতে পারেন সেজন্য একজন মেজর জেনারেলকে নিযুক্ত করিতে প্রধান সেনাপতি সম্মতি দিয়াছেন। ৩) যে-সকল জেলার সমস্যা অত্যধিক জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে-সকল জেলায় যাহাতে অবিলম্বে খাদ্যশস্য প্রেরণ, দুর্গতদের সাময়িকভাবে আশ্রয়দানের ব্যবস্থা ও রিলিফ ষ্টোর স্থাপনের কার্য্যে যাহাতে সামরিক বিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় সেজন্য বড়লাট প্রধান সেনাপতিকে অনুরোধ জানাইবেন। কোন কোন অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ ও চিকিৎসাদি ব্যাপারে যাহাতে সামরিক বিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় সেরূপ অনুরোধও জানাইবেন।

দুর্ভিক্ষ প্রশমনে লর্ড ওয়াভেলের তৎপরতা প্রশংসনীয় কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় জননেতাদের সাহায্য গ্রহণ করিলে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা ছিল। মন্ত্রীরা যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, জননেতারা বাহির হইতে সেবাকার্য্যের দ্বারা তাহার খানিকটা পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সংবাদপত্রের রিপোর্ট হইতে ইহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রীদের প্রতি নূতন বড়লাটের অনাস্থার ভাব স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু সাহায্য-প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সহযোগিতায় আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না।

লর্ড ওয়াভেল সেনাদলের সাহায্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন, তাহাতে সুফলও যথেষ্ট হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি কিছু চাউল এবং টিনের দুধ প্রভৃতি নিজের গুদাম হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। গবর্ন্মেণ্ট অবিলম্বে নৌকা পুনরায় চালাইবার আদেশ দিলে জলপথেও মফস্বলে বহু ফসল চালান দেওয়া যাইত। সৈন্যবিভাগের লরীর উপরই একমাত্র নির্ভর করিতে হইত না।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষের প্রকৃত প্রতিকার

বিলাতের কমন্স সভায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ছয় ঘণ্টা ব্যাপী যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে একমাত্র শ্রমিক-সদস্য মিঃ কোব সমস্যার আসল দিকটির প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন। ভারতে বা বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে তাহার মূল কারণ রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান ভিন্ন ইহার প্রকৃত প্রতিকার যে হইতে পারে না, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় ইহাই তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মিঃ কোব বলেন,

"দায়িত্ব কাহার অবিলম্বে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কোন সিলেক্ট কমিটি বা রয়াল কমিশনের দ্বারা তাহা করা যাইতে পারে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মিঃ আমেরি সব কথা খুলিয়া বলেন নাই। আরও অনেক কথা প্রকাশের দরকার। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। আমরা দুই শত বৎসর শাসন করিতেছি, অথচ দেখিতে পাইতেছি যে, বর্তমান মহাযুদ্ধের মত

একই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সমস্ত ব্যবস্থা চুরমার হইয়া যায়। ইহা আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচায়ক। বৈষয়িক অসুবিধা দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা রাজনৈতিক অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা না করি তাহা হইলে সমস্যা সমাধান হইবে না। পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি আমাদের বন্ধুবর্গ কারারুদ্ধ হইয়াছেন। আমি খোলা কথাই বলিতেছি। ভারতীয় নেতারা আমাদের মহতী প্রচেষ্টায় যে সহায়তা করিতেছে না তাহার জন্য দোষী আমরাই। জাহাজ বোঝাই করিয়া খাদ্যশস্য ভারতে পাঠাইলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারাগার হইতে মুক্তি দিতে হইবে। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাদের করিতেই হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কংগ্রেসী নেতাদের কারারুদ্ধ করিবার বেলায় সরাসরি যেরূপ ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইয়াছিল, ভারতীয়দের অন্ন যোগাইবার বেলায় সেরূপ করা হয় নাই কেন? বর্তমান সর্বাত্মক যুদ্ধে ভারতীয়দের দেহ ও মনের বল যাহাতে অটুট থাকে তাহার জন্য কি করা হইয়াছে?

"ইহার জবাবে সরকারের কি বলিবার আছে? এই সভায় প্রশ্নোত্তরে মিঃ আমেরি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিশ্চেষ্টতা, মূর্খতা এবং মানবপ্রীতির অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।" মিঃ কোব মিঃ আমেরির জানুয়ারী মাসের কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। "ঐ সময়ে মিঃ আমেরি বলিয়াছেন—আতঙ্কের কারণ নাই, উপযুক্ত সতর্কতা ও সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা পার হওয়া যাইবে, কিন্তু বণ্টন সমস্যা অতীব গুরুতর। আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইতেছে। আগামী দুই তিন মাসে যুদ্ধে সমস্ত রাষ্ট্রের যে পরিমাণ লোক মারা যাইবে তদপেক্ষা ভারতে বেশী লোক মারা যাইবে। আমরা প্রচার করিয়া থাকি আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও ফ্যাসিস্ত অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছি। ভারতবাসীদের নৈতিক সমর্থন লাভের জন্য আমরা কি আহ্বান জানাইব। আমি অস্বীকার করি যে পণ্ডিত নেহরু আমাদের যুদ্ধের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছিলেন। একথাও অস্বীকার করি যে কংগ্রেস মনে প্রাণে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। ভারতের নেতৃবৃন্দের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে হইবে। বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা যাইতে পারে।"

বিতর্কে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের মুখপাত্র মিঃ আমেরি ও সর্ জন এণ্ডার্সন সমস্যার এই দিকটা একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত মীমাংসা না হইলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন একেবারেই যে অসম্ভব, এই সত্য নানাদিক দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মিঃ যোশীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, এখনও (১লা সেপ্টেম্বর তারিখে) ১৯২৮৪ জন কংগ্রেসকর্ম্মী কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন এবং ৮০৭৩ জন ভারতরক্ষা আইনে বন্দী আছেন। কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মীদের মুক্তিদান করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা অর্জন করিলে বর্তমান দুর্ভিক্ষ প্রশমন করা সম্ভব হইত, ফাসিস্ত আক্রমদের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষার ব্যবস্থাও অনেক সহজ হইত।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

"রেলওয়ে বিভাগের অব্যবস্থা"

"মাননীয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার পত্রিকার ১৩৫০ সালের আশ্বিন সংখ্যার ৪৯২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত টিপ্পনীতে রেলওয়ে

ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে মন্তব্য করা হইয়াছে। আপনার সাধারণভাবে আলোচিত টিপ্পনীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আপনার ভাষ্যের সমর্থনের জন্য অব্যবস্থার বিশেষ উদাহরণ-স্বরূপ রামকৃষ্ণপুরে গমের মালগাড়ী প্রেরণ এবং চেতলায় চাউলের মালগাড়ী পৌছানর কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে প্রকৃতপক্ষে গমের মালগাড়ীগুলি চেতলায় ও চাউলের মালগাড়ীগুলি রামকৃষ্ণপুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং চাউল ও গমপূর্ণ মালগাড়ীগুলিকে পুনরায় যথাস্থানে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল।

এই উক্তির মূলে যে কোন সত্য নাই তাহা জানাইতে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে ব্যবহৃত রেলওয়ে সম্পর্কীয় তথ্যগুলির সততা নির্ণয় ও তৎপ্রসূত অনুসন্ধানের জন্য আপনাকে সাদরে আমার দপ্তরে আহ্বান করিতে, আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

তারিখ ১লা অক্টোবর '৪৩
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস
১০৫নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

ইতি
আপনার বিশ্বস্ত
চীফ কমার্সিয়াল ম্যানেজার"*

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

"লিনলিথগোর বিচার হউক"— সেমুর কক্স, সিলভারম্যান ও কোব

বাংলার দুর্ভিক্ষ লইয়া পার্লামেণ্টে যে বিতর্ক হইয়াছে তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের বক্তব্য শুনিয়া রক্ষণশীল দল ভিন্ন অপর কোন দলের সদস্যেরাই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিতর্কের পূর্ব্বে বিলাতে যে-সব পত্রিকা ভারত-সচিবকে সমর্থন করিতেছিল, পরে তাহারাও সুর নামাইতে অথবা নীরবতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'সাণ্ডে টাইমসে'র ন্যায় আমেরির গোঁড়া সমর্থক পত্রিকার উৎসাহ কমিয়া আসিয়াছে এবং অপর দিকে 'রেণল্ডস্ নিউজ' তীব্র ভাষায় ইণ্ডিয়া অফিস হইতে আমেরির অপসারণ দাবী করিয়াছে। রক্ষণশীল ভিন্ন পার্লামেণ্টের অপর প্রায় সকল সদস্যেরই মত এই ছিল যে "পুনর্গঠিত মন্ত্রীসভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ আমেরিকে কোন্ পদ দিবেন না দিবেন তাহা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইতে চাই না। ভারতবর্ষে মিঃ আমেরি যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশেষতঃ খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে যে কাণ্ড তিনি ঘটাইয়াছেন, তাঁহাকে আর যে কাজেই দেওয়া হউক ইহার চেয়ে খারাপ তিনি করিতে পারিবেন না।" প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের নিকট অবশ্য ৪০ কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য অথবা ৬ কোটি বাঙালীর ধনপ্রাণ অপেক্ষা তাঁহার বন্ধু মিঃ আমেরির ভুয়া প্রেষ্টিজেরও দাম বেশী, তাই তাঁহার পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভাতেও আমেরি সাহেবই ভারত-সচিবের পদে বহাল রহিয়াছেন। অন্য এক কারণ বোধ হয় যে ঐরূপ অকর্মণ্য "বাহাত্তুরে" গ্রস্ত লোককে অন্য কোথায়ও দিলে চার্চ্চিলের দল বিপদগ্রস্ত হইতে পারে। যে চার্চ্চিল ও আমেরি এই ভাবে দলের নিছক সংখ্যাধিক্যের জোরে নিজের দেশের পার্লামেণ্টের বিরোধীদলসমূহের অতিশয় ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করিলেন তাঁহারাই ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রভাবের পিছনে ফাসিস্ত মনোভাব দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠেন এবং মিঃ জিন্না প্রভৃতির ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি-পরিচালিত বিরোধীদলের দরদে ব্যাকুল হন। যেদিন যে মুহূর্তে পার্লামেণ্টের বিরোধীদলের অভিমত

* এই চিঠির সম্পাদকীয় উত্তরও দেওয়া হয়েছে যা এখানে নেওয়া হয়নি।

পদদলিত করিবার কথা তিনি ভাবিতেছিলেন, ঠিক সেই দিন সেই সময়েই মিঃ আমেরি বক্তৃতায় বলিতেছিলেন, "ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যে সকল দলের এবং সর্বপ্রকার লোকের সম্মতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিবে তাহা ভুলিলে চলিবে না।" রাজনৈতিক ভণ্ডামির এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বক্তৃতার সময় আমেরি সাহেব লর্ড লিনলিথগোর গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে দলের কয়েক ব্যক্তি হর্ষধ্বনি করিয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সেমুর কক্স, সিলভারম্যান ও কোব বলিয়া উঠেন, "ইহার নামে হর্ষধ্বনি না করিয়া ইহাকে বিচারের জন্য লর্ড সভার নিকট অভিযুক্ত করা উচিত।" (He should be impeached not cheered.)

ইংলণ্ডে আজ বার্কের ন্যায় মানুষ থাকিলে শুধু লর্ড লিনলিথগো নহে, বাংলায় লক্ষ লক্ষ নর-নারী-শিশুর মৃত্যুমুখে নিক্ষেপের অভিযোগে চার্চ্চিল-আমেরি-লিনলিথগো তিন জনেরই ইমপীচমেণ্টের দাবী উঠিত।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

কমন্স সভার বিতর্কে চার্চ্চিলের অনুপস্থিতি

কমন্স সভার বিতর্কে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের অনুপস্থিতি এত দৃষ্টিকটু হইয়াছে যে মিঃ জয়াকরের ন্যায় মডারেটও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে ইউরোপের ক্ষুদ্রতম দেশটির সম্বন্ধেও যখন কমন্স সভায় আলোচনা উঠে, মিঃ চার্চ্চিলের তাহাতে উপস্থিত থাকিবার সময়ের অভাব হয় না, কিন্তু তাঁহারই ন্যায় একই সাম্রাজ্যের ৪০ কোটি অধিবাসীর ভাগ্য লইয়া যে বিতর্ক হইয়া গেল তিনি তাহাতে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। মিঃ জয়াকর তাঁহার বিবৃতিতে ইহাও দেখাইয়াছেন যে বিতর্কে পার্লামেণ্টেব ৬০০ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩৫ হইতে ৫৩ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইহার দ্বারা এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ৭০০০ মাইল দূরে ৬০০ ব্যক্তির দ্বারা ভারতশাসন সম্ভব এই কাহিনী অতঃপর ভুলিয়া যাইবার দিন আসিয়াছে।

মিঃ জয়াকর কিন্তু ইহার অপর দিকটার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। পার্লামেণ্টে বর্তমানে অধিকাংশ সদস্যই চার্চ্চিল ও আমেরির দলভুক্ত। দলের এই সব নেতার প্রতি কার্য্য সমর্থন করা এবং ভোটের সময় হাত তোলা ছাড়া ইহাদের আর কোন কাজ নাই—এ সত্য ইহারা অবগত আছেন ভোটের সময় ইহাদিগকে হুইপ করিয়া অর্থাৎ ডাকিয়া আনা হইবে ইহা তাঁহারা জানেন। আলোচনার প্রতি আগ্রহ অথবা ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি ইহার কোনটাই ইহাদের নাই। বিতর্কের দিন সদস্যদের অনুপস্থিতির দ্বারা একনায়কত্বের নিকৃষ্টতম রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ মনোবৃত্তি ফ্যাসিস্ত নীতির জঘন্যতম অংশ।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

ভাইকাউণ্ট ওয়াভেলের বক্তৃতা

বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণের দুই মাস পরে কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্সের বাৎসরিক সভায় ভাইকাউণ্ট ওয়াভেল তাঁহার প্রথম বক্তৃতা করিয়াছেন। বড়লাটের এই প্রথম

উক্তির ভিতর আন্তরিকতার সুর স্পষ্ট, পেশাদার রাজনীতিবিদের ন্যায় কথার মারপ্যাঁচ ইহাতে কম,—তাঁহার সকল কথায় একমত হইতে না পারিলেও ইহা স্বীকার্য্য। ভারতে পদার্পণ করিয়াই তাঁহাকে এক বিরাট্ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; পূর্ব্ববর্তী বড়লাট লর্ড লিনলিথ্‌গো অথবা বাংলার লাট সর্ জন হার্বার্টের ন্যায় দায়িত্ব এড়াইবার অথবা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া দুর্ভিক্ষের সংবাদ চাপিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। কার্য্যভার গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই উপযুক্ত সৈনিকের ন্যায় তিনি দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উহার তীব্রতা প্রশমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙালী ইহা কৃতজ্ঞতার সহিতই স্মরণ করিবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের একটি প্রধান কারণ ফাটকাবাজি ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি আজ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে দমন অথবা সংযত করিতে পারেন নাই।

ওয়াভেল বলেন, "খাদ্য-সমস্যার সমাধানই আমাদের প্রথম কাজ; কি করিয়া এই সমস্যার উদ্ভব হইল, সে সম্পর্কে এখানে কোনও আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। পিছনের পানে নয়, সুমুখ পানে তাকানই আমাদের কর্তব্য। ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য দ্বারাই সাধারণ অবস্থায় ভারতের প্রয়োজন প্রায় পূরণ হয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতের অধিকাংশের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে—অতি ভোজন নয়, স্বল্পভোজন, সুতরাং দুঃসময়ের জন্য উদ্বৃত্তও কিছু থাকে না। তা ছাড়া খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণও অঞ্চলে অঞ্চলে একই রকম নয় এবং অধিকাংশ উৎপাদকই ক্ষুদ্র চাষী, কোনওক্রমে নিজের আহার্য্য সংগ্রহ করে মাত্র। জাপানের যুদ্ধাবতরণ ও মালয় ও ব্রহ্মে আমাদের বিপর্য্যয়ের ফলে (যাহার ফলে যুদ্ধ ভারতের সীমান্তে আসিয়া হাজির হয়) খাদ্যাবস্থায় একটা অস্থিরতার ভাব দেখা দেয়। ফলে ছোট ছোট চাষী ও সাধারণ গৃহস্থরা প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য ধরিয়া রাখে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপক আস্থাহীনতার ভাবই বর্তমান সমস্যার প্রথম ও প্রধান কারণ; এই আস্থাহীনতা অস্বাভাবিকও নয়, এবং দোষেরও নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অপরাপর দেশের মত ভারতেও এমন লোক আছে যাহারা নির্দোষ নয়; তাহারা শুধু নিজ নিজ সুখসুবিধার কথাই ভাবে এবং কোন প্রকার বাচবিচার না করিয়া খাদ্যাভাবের সুযোগ লইয়া টাকা রোজগার করিবার ফিকিরে থাকে। তাহাদের এই অন্যায় কার্য্য যে দুর্গতি ও মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিতে পারে, সেদিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপমাত্রও থাকে না। এই শ্রেণীর লোকেরা যে মাল ধরিয়া রাখিয়াছে এবং ফাটকাবাজি করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে যে মানুষের লোভই হইতেছে দ্বিতীয় প্রধান কারণ। খাদ্য-সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যা হিসাবে না দেখিয়া স্থানীয় সমস্যা হিসাবে দেখিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ, বিভাগ বা জেলার মধ্যে একটা ঝোঁক দেখা গিয়াছিল; এই ঝোঁক দূর করিতে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহাই হইতেছে তৃতীয় কারণ। উপরোক্ত প্রধান কারণগুলি ছাড়াও তুফান ও বন্যার ফলে বাংলার অবস্থা আরও জটিল হয়।

"সমগ্র দেশে মোটামুটি একই ধরণের খাদ্য নীতি পরিচালনার একটি সুব্যবস্থা প্রবর্তন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমরা যদি সুষ্ঠুভাবে খাদ্য ব্যবস্থা পরিচালনায় অসমর্থ হই এবং বাহির হইতে আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য আনাই তাহা হইলে আমরা অন্যান্য দেশের কষ্টের কারণ হইব এবং তাহার ফলে পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধ ও অধিক দিন স্থায়ী হইবে। বড় বড় শহরগুলিতে পুরাপুরি বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণই আমাদের খাদ্য পরিকল্পনার মূল কথা।"

বড়লাট এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে কেবলমাত্র কাগজপত্রে নির্দেশ জারী করিবার উপর নির্ভর না করিয়া গ্রামের খুচরা দোকানদার হইতে শুরু করিয়া বড় বড় হাট-বাজারের মহাজন ও পাইকারী বিক্রেতাদের বেচাকেনা অফিসারগণকে ব্যক্তিগত ভাবে তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, গবর্ণমেন্টের খাদ্যশস্য সংগ্রহের নীতি বিবেচনার সঙ্গে চালাইতে হইবে এবং খাদ্যশস্য চলাচলও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। সমগ্র ভারতের আমরা একটি খাদ্যনীতি স্থির করিয়াছি। বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা পাইলে ঐ নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আমি স্থির বিশ্বাস রাখি এবং ইহাকে সার্থক করিবার জন্য আমি কঠোরতম ব্যবস্থাবলম্বনেও কুণ্ঠিত হইব না।

বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি বলেন, বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব বাংলার প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু বাংলা নিজেকে সাহায্য করিবার জন্য যদি চেষ্টান্বিত না হয় তাহা হইলে এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি থাকিবে না। আগামী ছয় মাস হইবে বাংলার পরীক্ষার সময়। এই সময়ের মধ্যে বাংলা-সরকারকে তাহাদের নীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইবে এবং ইহার শাসন-ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করিতে হইবে। এখন বাংলার উপরই বাংলার খাদ্য-সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী কয়েক মাসের জন্য কলিকাতার খাদ্য সরবরাহের ভার লইয়াছেন বটে, তবে প্রকৃতিদেবীর প্রচুর শস্যদান সত্ত্বেও যদি নিজেদের অক্ষমতার দরুণ প্রাদেশিক সরকার ঐ শস্য ঠিকমত সংগ্রহ ও বণ্টনে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার যে 'একটি প্রদেশকে' অনির্দিষ্ট কালের জন্য চালাইয়া নিবেন তাহা হইতে পারে না।

খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে বড়লাট শেষ পর্য্যন্ত বলেন, "আমি মনে করি, দেশের সঙ্কটকালে যে-সব লোক খাদ্য ও ঔষধ বিক্রয় করিয়া বে-আইনীভাবে অধিক লাভ করিবার চেষ্টা করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন নিন্দাবাদই যথেষ্ট নহে এবং কোন শাস্তি-ব্যবস্থাকেই বেশী বলা যায় না। গড়িমসিভাব ও দীর্ঘসূত্রতাকে আমল দেওয়া যাইতে পারে না এবং রাজনৈতিক দলাদলি প্রত্যেকের আবশ্যক খাদ্য পাইবার পথে যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে সেই দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

ফাঁপাই ('ইন্‌ফ্লেশন') সমস্যা সম্পর্কে বড়লাট বলেন, "কার্য্যকরীভাবে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করিতে না পারিলে অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে ফাঁপাই দেখা দিয়াছে তাহার সমাধান হইতে পারে না। কারণ খাদ্যের উপরই সমস্ত দরপত্র নির্ভর করিয়া থাকে। অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য জিনিসপত্রের দর বাড়াইয়া দিয়া কেহই লাভবান হইতে পারিবে না। কারণ তাহা দ্বারা তাহার লাভের মূল্যও কমিয়া যাইবে, অথচ অন্য সকলের পক্ষে তাহা অবর্ণনীয় দুর্দশার কারণ হইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াও ফাঁপাইর দিকে যে ঝোঁক দেখা যাইতেছে তাহা নিরোধ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ।"

উপসংহারে বড়লাট বলেন, "ভারতের শাসনতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলি নাই। ইহার কারণ এই নয় যে, এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে আমি চিন্তা করি না, অথবা ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি নাই। যুদ্ধ চলিতে থাকা কালে কোনরূপ রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান অসম্ভব, এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই যে আমি এ সম্পর্কে নীরব আছি তাহাও ঠিক নহে এবং যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইয়া

যাইবে তাহাও আমি বিশ্বাস করি না। আসল কথা হইল এই যে এখানে এই সব সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিলে উহাদের সমাধান সহজতর হইবে বলিয়া আমি মনে করি না।"

ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যা, ইনফ্রেশন সমস্যা এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা এই তিনটি একসূত্রে গ্রথিত। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া অপরটির সমাধানের কোন উপায় নাই। বড়লাট যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা বেশী করিয়া বলিয়াছেন এবং রাজনীতি বাদ দিয়া অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমান যুগে রাজনীতি ও অর্থনীতির অভিন্নতার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্যমাত্র। এদেশেও ভারত-শাসন আইনে রক্ষাকবচ বসাইয়া বিলাতী অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভারতরক্ষা আইনে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে এমন বহু আদেশ জারি হইয়াছে যাহার ফলে রাজনীতির সহিত বিন্দুমাত্র সম্পর্ক যাহাদের কোন কালেও ছিল না এবং নাই, তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সর্ জন হার্বার্টের ভীতিগ্রস্ত চিত্তের ফল নৌকাপসারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক কারণে প্রদত্ত এক অপ্রয়োজনীয় আদেশের ফলে কর্মহীন হয়ে বাংলার লক্ষ লক্ষ মাঝি ও মৎস্যজীবী সপরিবারে অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহারই বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখা যায় সোভিয়েট রাশিয়ায়। দেশের রাজনীতি যেখানে জনসাধারণের রাজনীতি, মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থপ্রসূত রাজনীতি নয়, দেশের অর্থনৈতিক জীবন সেখানে দীর্ঘকালব্যাপী করাল সংগ্রামের মধ্যেও বিপর্য্যস্ত হয় না। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং প্রভৃতির প্রয়োজনও সেখানে হয় না। খাদ্য সমস্যা, ইনফ্রেশন সমস্যা এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা—এই সব কয়টিরই কারণ রাজনৈতিক। যুদ্ধে র লক্ষ্য সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কোন কথা বলিতে অস্বীকার করিলে কংগ্রেস এ যুদ্ধে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিল, মুসলিম লীগ সহযোগ ও অসহযোগের দুই নৌকায় পা দিয়া স্বার্থসিদ্ধি তে প্রবৃত্ত হইল, হিন্দু মহাসভা বিনাশর্ত্তে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিল যদিও কার্য্যতঃ কোন সাহায্য করিতে পারিল না। কংগ্রেসের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার জন্য গবর্ন্মেণ্টকে অকাতরে অর্থ ব্যয়ের পথ বাছিয়া লইতে হইল, কৃষকের নিকট দুই টাকায় ক্রীত দ্রব্যের মূল্যস্বরূপ দালালকে দশ টাকা দিতে হইল, নিছক টাকার লোভ দেখাইয়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্যপতিগণকে ভারত-সরকার দলে টানিতে পারিলেন। অতিরিক্ত লাভকর আদায় বন্ধ করা হইল, বড় বড় শিল্পগুলিকে নানাভাবে সুবিধা দেওয়া হইল, দালালদের ক্রয় কার্য্যের সুবিধার জন্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি হইল—ইনফ্রেশন অপরিহার্য্য। ৬০০ কোটি বাড়তি টাকার মধ্যে এক শত কোটি পাইল কৃষক— অবশিষ্ট ৫০০ কোটি জমা হইল শিল্পপতি ব্যবসায়ী ও দালালের ব্যাঙ্কে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকারের দালাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ক্রয় করিতে পারিয়াছে, পারে নাই জনসাধারণ ; আর ফাঁপতি টাকার ৬ ভাগের ৫ ভাগ জমিয়াছে ৩০/৪০টি ব্যাঙ্কে, অভিজ্ঞতা এবং ব্যাঙ্কের হিসাব হইতে এই সত্যই প্রমাণিত হয়। গবর্ন্মেণ্ট আজ সম্পূর্ণরূপে এই শ্বেত ও কৃষ্ণ বণিক সম্প্রদায়ের করায়ত্ত। ফাটকাবাজি ও মাল আটক করা অবাধে চলিতেছে এই সংবাদ জানিয়াও ফাঁকা আওয়াজ করা ভিন্ন তাঁহাদের কোন উপায় নাই, ইহাদিগকে চিনিয়া এবং জানিয়াও ধরিয়া শাস্তি দিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা গবর্ন্মেণ্টের আছে বলিয়া মনে হয় না।

(মাঘ ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষের পর নারী সমস্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি অসদুদ্দেশ্যে নারী বিক্রয়ের ব্যবসা বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, দারিদ্রের নিদারুণ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব্ববঙ্গে অসংখ্য দুঃস্থা নারী 'বেশ্যাবৃত্তি' অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, বহু অভিভাবক তাহাদের পুত্রকন্যা বিক্রয় করিয়াছে। এই সমস্ত দুঃস্থা ও 'পদস্খলিতা' নারীকে উদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য গবর্ন্মেণ্ট বহু অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। অসৎ উদ্দেশ্যে নারী-বিক্রয়-ব্যবসা বন্ধ করার ও দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করার জন্য গবর্ন্মেণ্ট রেল স্টেশনে ও নদীর ঘাটে প্রখর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তরের সময় সরকার পক্ষ জানাইয়াছেন যে, গত দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক নারী একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে উপার্জ্জনক্ষম স্বামীপুত্র হারাইয়াছে, অনশনে, অর্দ্ধাশনে অনেকের খাটিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট আদেশ জারি করিয়াছেন, যেখানে এই সমস্ত নারীর সংখ্যা অধিক, সেখানে এক বা ততোধিক অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হউক। এই সমস্ত অনাথাশ্রম পরিচালনা সম্পর্কে গবর্ন্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, যাহারা এইগুলিতে আশ্রয় পাইবে তাহাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে এবং যে আধা-সরকারী স্থানীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত আশ্রম পরিচালিত হইবে, যথেষ্ট সংখ্যক নারীকে উক্ত কমিটিতে নিয়োগ করা হইবে।

জনৈক সদস্য একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণ সিংহ জিজ্ঞাসা করেন, "বাংলাদেশে বিদেশী সৈন্যদল আমদানীর জন্য কি অসৎ উদ্দেশ্যে নারী-বিক্রয়-ব্যবসা বৃদ্ধি পাইয়াছে?" পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারি জবাব দেন, "গবর্ন্মেণ্ট তাহা জানেন না।" এই প্রশ্ন এখানেই শেষ না করিয়া বাংলা-সরকারের তরফ হইতে বিশেষভাবে ইহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত এবং অভিযোগ সত্য হইলে অবিলম্বে তাহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক।

বাংলা সরকার অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এরূপ কোন আশ্রম এযাবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, অথবা হইলে কয়টি হইয়াছে তাহাও জানান নাই। দুর্ভিক্ষের তীব্রতা হ্রাস পাইবার পর প্রায় চারি মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে, আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে গবর্ন্মেণ্ট এই সময়ের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিতে পারিতেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাময়িকভাবে কিঞ্চিৎ সুফল হইলেও উহা এই সমস্যা সমাধানের উপায় নহে। দয়া বা অর্থ ভিক্ষা দিয়া কোন সমস্যারই সমাধান হইতে পারে না, ইহার দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেশের ও জাতির ক্ষতিই করা হয়। 'দরিদ্র আইনে' ব্যাপক ভিক্ষা দানের ফলে ইংলণ্ডের নিজেরও কম ক্ষতি হয় নাই। ইহার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধানও হয় নাই। ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা দেখিবার পরও দুর্ভিক্ষোত্তর পুনর্গঠনে বাংলা-সরকার অনাথ আশ্রম, 'ওয়ার্ক-হাউস' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা দরিদ্র দেশবাসীর আরও কিছু অর্থ অপচয়ের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুপরিকল্পিত উপায়ে কুটীর-শিল্প প্রসার ভিন্ন এই সমস্যার সমাধান হওয়া একেবারে অসম্ভব। ইংরেজ দরিদ্রের ন্যায় বাঙালীও কখনও বসিয়া খাইতে চাহে নাই। অনাথাশ্রম এবং

ওয়ার্ক হাউসে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সরকারী অন্ন ধ্বংসের সুযোগ পাইয়াও লোকে সেখানে যাইতে চাহে না ;গবর্ন্মেন্টও নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

বাংলা দেশে আপাততঃ চাউলের কলগুলির কার্য্য কমাইয়া দিয়া অনাথা স্ত্রীলোকদের দ্বারা ধান ভানিবার বন্দোবস্ত করিলে সরকারী খরচ ব্যতীতই লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয়া নারীর অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারে ইহা আমরা পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি।

(বৈশাখ ১৩৫০)

বাংলার গবর্ণরের বক্তৃতা

বাংলার নূতন গবর্ণর মিঃ কেসী গত ১লা এপ্রিল এক বেতার-বক্তৃতায় অর্ধাশনে জর্জরিত এবং দুর্ভিক্ষে গৃহহারা বিপর্য্যস্ত নরনারীকে আশ্বাসবাণী শুনাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় দুই মাস হইল গবর্ণর রূপে মিঃ কেসী এ দেশে আসিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যেই এদেশের খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতেই তিনি জানাইয়াছেন যে, অতীতে যে দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে, ১৯৪৪ সালে আর যাহাতে সেরূপ না হইতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। খাদ্যসম্পর্কে বস্তুতঃ বাংলার যে আশঙ্কার কারণ নাই, ইহা তিনি অনুমানের উপর বলেন নাই। এই বিশ্বাসের কারণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, ১) গত বৎসর এদেশে সত্যই চাউলের অভাব ছিল এবং অজন্মা ও প্রাকৃতিক বিপর্যায় উহাকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল ;কিন্তু এ বৎসরে শস্যের উৎপাদন অত্যন্ত আশাপ্রদ। ২) গত বৎসর বাংলা দেশকে একা কলিকাতার ন্যায় বিরাট্ নগরীকে আহার্য্য যোগাইতে হইয়াছে; এ বৎসরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলি ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই ব্যবস্থায় বৃহত্তর কলিকাতার চল্লিশ লক্ষেরও অধিক লোকের জন্য এক কোটি ঊননব্বুই লক্ষ মণ খাদ্য-সামগ্রী বাহির হইতে কলিকাতায় আনা সম্ভব হইবে। ৩) গত বৎসর সরকারের ভাণ্ডার ছিল শূন্য এবং শস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের কোন সঙ্গত ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাও সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু আজ সরকারী ভাণ্ডার খাদ্য-সামগ্রীতে পূর্ণ, সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যাপক ও বিপুল ব্যবস্থা বহু গুণে উন্নততর। ৪) গত বৎসর যানবাহনের নানারূপ অসুবিধা ছিল ; জলপথ, স্থলপথ, রেলপথ, সবদিকেই ছিল বহু বাধাবিঘ্ন। কিন্তু এ বৎসর পূর্বাহ্নেই কর্তৃপক্ষ সজাগ ও সতর্ক এবং চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিও সুস্পষ্ট, শুধু তাহাই নহে যাহাতে সুব্যবস্থা সম্ভব এবং সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, সে জন্যও তাঁহারা বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ভারত গবর্ন্মেন্টের সহিত প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিয়া, অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ দ্বারা, প্রয়োজনমত যানবাহন পাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা শস্য সংগ্রহ এবং বণ্টনের ব্যবস্থায় তাঁহাদের ঐকান্তিক শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। বাড়তি অঞ্চল হইতে শস্য আনাইয়া ঘাট্তি অঞ্চলে উহা বণ্টনের প্রস্তাবে অনেকের মনে একটা সন্দেহ জাগিতেছিল যে, বাড়তি অঞ্চল হইতে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে শস্য সংগৃহীত হইতে থাকে, তাহা হইলে বাড়তি অঞ্চলই বা ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হইতে কতক্ষণ? গবর্ণর এই সকল সংশয়বাদীদের আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন, এ আশঙ্কা অমূলক। অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগকে পূর্বাহ্নেই যথেষ্ট সতর্ক করিয়াছে। এ আশঙ্কা যাহাতে দেখা না দেয়, সেজন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

কৃষকগণ কর্তৃক ধান আটকাইয়া রাখাই দুর্ভিক্ষের একটা প্রধান কারণ—এই কথাটা মিঃ কেসীর ন্যায় সর্ জন হার্ব্বার্টও বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কার্য্যকালে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, বাড়তি ধান কাহারও নিকটেই ছিল না। এবার বেশী ফসল হওয়ায় সম্বৎসরের খোরাকী মজুত রাখিবার চেষ্টা হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতার পর ইহা দোষাবহও নহে, সর্ টমাস রাদারফোর্ড বাংলা ত্যাগের পূর্বে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কৃষকের ঘরে সম্বৎসরের খোরাক মজুত থাকিলে তাহার জন্য বাজারে বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ ক্রেতাহিসাবে তাহার চাহিদা ত জোগানের সঙ্গে সরিয়াই গেল। প্রয়োজনাতিরিক্ত ধান লাভের লোভে যাহারা মজুত রাখে, বিপদ ঘটাইতে পারে তাহারাই। এবার চাষীদের হাতে চাউল প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে জমিয়া গিয়াছে, মিঃ কেসী কোন তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা জানাইলে ভাল হইত। ভারতবর্ষে তিনি নবাগত, বাংলার অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ দেশ সম্বন্ধে তাঁহার প্রাথমিক জ্ঞান সম্ভবতঃ মিঃ আমেরির আপিসে সঞ্চিত হইয়াছে। এখানে যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রণাদাতা, দেশবাসী তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না, তাহাদের উপর লোকের আস্থা ফিরাইয়া আনা দরকার, ইহা ভারত-সরকারও স্বীকার করিয়াছেন। মাস দুয়েকের মধ্যে দুই দশটা রেশনিং কেন্দ্র অথবা হঠাৎ গড়িয়া উঠা দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র দেখিয়া এই ধরনের গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কতদূর সঙ্গত গবর্ণর তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

বাড়তি জেলা হইতে ঘাট্তি জেলায় সরকারী এজেন্ট মারফৎ চাউল প্রেরণের অসুবিধা, আবশ্যক ব্যয়বাহুল্য ও অপচয়ের সম্ভাবনার কথা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি। মিঃ কেসীও দেখিতেছি সর্ জন হার্ব্বার্টের অনুসৃত এই অস্বাভাবিক বন্দোবস্তই সমর্থন করিতেছেন। কলিকাতায় চাউল বাহির হইতে আসিতেছে, বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে এবং এবার আশাতিরিক্ত ফসলও ফলিয়াছে। এই অবস্থায় বাংলা দেশের অভ্যন্তরে অবাধ বাণিজ্য চলিতে দেওয়াই মূল্য হ্রাসের ও সমবণ্টনের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য উপায় ছিল। গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য সাধু হইলে এই ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁহারা সৎ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া একটি সুদক্ষ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ পুলিসবাহিনী গঠনের দ্বারা অন্যায় লাভ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে পারিতেন। সরকারী এজেন্টদের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইতেছে ইহাতে তাহার অধিকাংশই বাঁচিয়া যাইত।

বাংলার দুর্ভিক্ষ শেষ হইয়াছে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত যে মৃত্যুসংখ্যা স্টেটস্ম্যানে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে দেখা যায় এখনও সপ্তাহে প্রায় ২৫০ জন করিয়া অর্থাৎ মাসে প্রায় এক হাজার 'পপার' মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। হাসপাতালে মৃত বুভুক্ষুর যে তালিকা প্রতিদিন সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত হয় তাহা যোগ করিলে সপ্তাহে ২০/২৫টির বেশী হয় না। তবে কর্পোরেশনের হিসাবে প্রদত্ত এই সব 'পপার' কাহারা, এবং ইহারা মরিতেছেই বা কোথায়? মফস্বল হইতেও উদ্বেগজনক সংবাদ আসিতেছে। কোন কোন শহরের দিকে বুভুক্ষুর অভিযান সুরু হইয়াছে, শেয়াল কুকুর কর্তৃক মানুষের মৃতদেহ ভক্ষণের সংবাদও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে। চৈত্র মাসে যে সময়ে খাজনার কিস্তি দেওয়ার জন্য চাউলের দর সর্বাপেক্ষা কম থাকে সেই সময়ে সমগ্র দেশে বিশ টাকার কাছাকাছি দর থাকা রীতিমত আশঙ্কার কথা। গত বৎসর মাস কয়েকের জন্য মাত্র দর বিশ টাকা

হইতে চল্লিশ টাকা উঠিয়াছিল ; এবার ধান উঠিবার পর হইতেই চার টাকার চাউলের দর ষোল টাকার নীচে নামিতে চাহিতেছে না। ভূমিহীন সাধারণ চাষী ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে এই মূল্যাধিক্য সাংঘাতিক। নূতন বৎসরের দর দশ টাকায় নামাইবার প্রতিশ্রুতি সর্ টমাস রাদারফোর্ড এবং মিঃ সুরাবর্দ্দী দুজনেই দিয়াছিলেন কিন্তু কেহই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় অনাহারে হাজার হাজার লোক এখনও মরিতে থাকিবে এবং অর্ধাশনে শীর্ণ লক্ষ লক্ষ লোক রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই।

মিঃ কেসী যানবাহনের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। দেশবাসী কিন্তু ভরসার বিশেষ কারণ পাইতেছে না। চাউল অপেক্ষা পরিমাণে অনেক কম লাগে লবণ এবং কয়লা, ইহাই আনিবার মালগাড়ী যেখানে জোটে না, সেখানে জেলায় জেলায় চাউল প্রেরণের ভরসা তিনি কোথায় পান? রেলের অসুবিধা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না মণিপুরের যুদ্ধের পর ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অন্ততঃ রেলের উপর চাপ যত দূর সাধ্য কমাইয়া দেওয়া উচিত ইহা নিঃসন্দেহ। লর্ড ওয়াভেলের দয়ায় মিলিটারী লরী যতগুলি একাজে পাওয়া গিয়াছিল তাহা চিরদিনই বজায় থাকিবে ইহা আশা করাই অন্যায়। আসামের যুদ্ধে যে কোন মুহূর্তে উহাদের প্রয়োজন হইতে পারে। সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ছিল নৌকা এবং গরুর গাড়ী। মিঃ কেসী এদিকে মন দিলে ভাল করিতেন। অবশ্য ২৫টি নৌকার 'কনভয়' অপেক্ষা অনেক বেশী নৌকা ইহাতে প্রয়োজন হইত।

যে সব ভ্রান্ত ধারণা ও বে-বন্দোবস্তের ফলে সর্ জন হার্ব্বার্ট বাংলায় দুর্ভিক্ষ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, মিঃ কেসী তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ও যুক্তিসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করিবেন এমন কোন পরিচয় আমরা তাঁহার বক্তৃতায় পাইলাম না। যে কয়েকটি মন্ত্রণাদাতার উপর সর্ জন হার্ব্বার্ট নির্ভর করিয়াছিলেন মিঃ কেসীও তাঁহাদেরই পরামর্শে চলিতেছেন। এই অবস্থায় মিঃ কেসীর সাফল্য সর্ জন হার্ব্বার্টের চেয়ে বেশী হইবে এই ভরসা রাখিতে আমরা অক্ষম।

(বৈশাখ ১৩৫১)

দুর্ভিক্ষের পর বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

দুর্ভিক্ষের পর বাংলার বিভিন্ন জেলায় রোগের প্রকোপ কিভাবে বাড়িয়াছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতিতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ রায়ের মূল বক্তব্য এই ঃ

"দুর্ভিক্ষের পর বাংলাদেশে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ শুরু হইয়াছে। এমন একটি জেলাও নাই, যেখানে ইহা ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই। গবর্ন্মেণ্টও বাংলাদেশের অন্যূন পক্ষে ১৮টি জেলায় কলেরা ও বসন্ত সংক্রামক আকারে দেখা দিয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে যাঁহারা সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের হিসাবে বাংলার অন্ততঃ দুই কোটি লোক আজ রোগগ্রস্ত। বসন্তের আক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কলেরার প্রকোপ মধ্যে একটু ভাটা পড়িয়াছিল, কিন্তু আবার তাহা রুদ্র আকার ধারণ করিয়াছে। কোনও অঞ্চলে ম্যালেরিয়া উপশমের কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অন্ততঃ কতকগুলি জেলায় ম্যালেরিয়ার মৃত্যু সংখ্যা নিশ্চিতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগের বেশী এবং নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর ও মেদিনীপুরে শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ লোক আজ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত।

"সেবা-নিয়ন্ত্রণ সমিতির প্রচেষ্টায় আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেবাব্রতীদের মধ্যে

অধিকতর যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রায় ৭০টি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভক্ত হইয়া তাহারা গত তিন মাসের মধ্যে অন্ততঃ ১০ লক্ষ পীড়িত দুঃস্থের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বাংলার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দুরীকরণের পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত চেষ্টা নহে।

"প্রথমতঃ কুইনিনের কথাই উল্লেখযোগ্য। গবর্ন্মেণ্ট বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য এ পর্য্যন্ত ১,২৪,০০০ পাউণ্ড কুইনিন মাত্র বরাদ্দ দিয়াছেন এবং খুব কম করিয়া ধরিলেও বাংলায় বর্ত্তমানে প্রকৃতপক্ষে ২,৩০,০০০ পাউণ্ড কুইনিনের প্রয়োজন। জেলা কর্ত্তৃপক্ষের হাতে বহু কুইনিন মজুদ থাকিলেও বিতরণ সম্পর্কে তাহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় বলিয়া সেবাদলগুলির পক্ষে কুইনিন যোগাড় করা সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গন্ধকের অভাবে সংক্রামক খোস পাঁচড়া চিকিৎসা অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বসন্তের টীকা সম্বন্ধেও দেখা যাইতেছে লীম্ফগুলি এতই নিম্নস্তরের সরবরাহ করা হইতেছে যে, তাহার ফলে বসন্ত বাধা মানিতেছে না।"

এইসব সমস্যা সমাধান করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন এবং গবর্ন্মেণ্ট ও জাতির সমবেত চেষ্টায় যদি বাংলার পীড়িত দুঃস্থদের এই সব সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করা না যায়, তাহা হইলে 'অধিক খাদ্যশস্য ফলাও' আন্দোলন জোরে চলিতে থাকিলেও বাংলার শস্যক্ষেত্রগুলি শ্মশানে পরিণত হইবেই। ঔষধের বিশেষতঃ কুইনিনের অভাব সম্বন্ধে বহুবার গবর্ন্মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য ফল যে উহাতে হয় নাই, ডাঃ রায়ের বিবৃতি তাহার সর্বশেষ নিদর্শন। ডাঃ রায় সম্প্রতি বোম্বাই, সিন্ধু, পঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বাংলার বর্তমান অবস্থার কথা সকলকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার আবেদনে বহু সাহায্য আসিয়াছে। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, খোস-পাঁচড়া প্রভৃতির জন্য যে-সব সাধারণ ঔষধ আবশ্যক, বাংলাদেশে অনায়াসেই তাহা প্রস্তুত হইতে পারিত ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তবে সরকার নিষ্ক্রিয় থাকিলে অথবা প্রয়োজনীয় সাহায্য না দিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা মাত্র করিলে বর্তমান অবস্থায় উহা সম্ভব নহে।

(আষাঢ় ১৩৫১)

দুর্ভিক্ষোত্তর সমস্যা ও বাংলা সরকার

দুর্ভিক্ষে যাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে তাহাদিগকে স্বাভাবিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাংলা সরকার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রথমেই তাঁহারা সমগ্র প্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের তীব্রতা যেসব স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল এবং এখনও যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে সেই সব স্থানকে প্রথম ভাগের মধ্যে আনা হইয়াছে। ২৬৯৪টি ইউনিয়ন বোর্ড এবং ৩,৩৪,৩১,৮৩৪ জন লোক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সরকারের হিসাবে এই জনসংখ্যার শতকরা ১০ জনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এবং আরও শতকরা ১০ জনের জন্য কোন না কোনরূপ সাহায্য দরকার। অর্থাৎ এখনও ৬৫ লক্ষ লোক বাহিরের সাহায্য ভিন্ন স্বাভাবিক জীবন পুনরায় আরম্ভ করিতে পারিবে না। গবর্ন্মেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে ইহার মধ্যে শতকরা মাত্র ১ জনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং শতকরা আর এক জনের সাহায্যের ভার মাত্র তাঁহারা গ্রহণ করিবেন।

সমগ্র অঞ্চলটিকে ৪০০ কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে কয়েকটি করিয়া ওয়ার্ক হাউস গঠিত হইবে। গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য ৬০টি এবং শিশু ও নারীদের জন্য ৬০টি আশ্রয়স্থান

নির্মিত হইবে।

সরকারী রাজস্ব বিভাগ কার্য্য পরিচালনা করিবেন, রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী ডিরেক্টর হইবেন এবং একজন ডেপুটি ডিরেক্টরের উপর প্রকৃত পক্ষে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার থাকিবে। অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া ইনসপেকটর সুপারভাইজার প্রভৃতি নিযুক্ত করা হইবে। কেরানী প্রভৃতির জন্য একমাত্র কলিকাতা আপিসেই মাসে হাজার টাকা ব্যয় হইবে। ওয়ার্ক হাউসে জিনিষ বিক্রয়ের জন্য দুইজন মার্কেটিং অফিসার ২০০ হইতে ২৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইবেন। মোটের উপর পেন্সনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে, ইহাই গবর্ন্মেণ্টের আশা।

দুর্গত সাহায্যে বহুদর্শী সমাজসেবী শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী এই পরিকল্পনা অবাস্তব ও ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। পরিকল্পনাটি দেখিবার পর আমরাও তাঁহার অভিমতই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত নিয়োগীর মতে উহার মধ্যে কার্য্য পরিচালনার বন্দোবস্ত বাহুল্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু আসল কাজের কথা উহাতে সামান্যই আছে।

দুর্ভিক্ষোত্তর পুনর্গঠন সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে, দুর্ভিক্ষের মধ্যেই আমরা ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি, কিন্তু সরকারের কর্ণে উহা প্রবেশ করিয়াছে কি না সন্দেহ। ৬০-৭০টি, এমন[কি] ৬০০০-৭০০০ ওয়ার্ক হাউস প্রতিষ্ঠা করিয়াও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। দয়া ভিক্ষা দিয়া অথবা দুই শত টাকা দান করিয়া সমাধান করিবার সমস্যা ইহা নহে। বহুকালাবধি বাংলার অর্থনৈতিক বনিয়াদে ঘুণ ধরিয়াছে, কৃষি ভিন্ন কৃষকদের উপার্জনের অপর সমস্ত পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে।

(আষাঢ় ১৩৫১)

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় সাক্ষ্য গ্রহণ চলিতেছে। কমিশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতে হইবে ; ১) ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলায় খাদ্যাভাবের কারণ কি? এবং ২) ঐ খাদ্যাভাবের পর মহামারীর প্রকোপের কারণ কি? কমিশনকে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে হইবে—৩) কিভাবে খাদ্য-সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে, ৪) দুর্ভিক্ষের অবস্থায় জরুরী চিকিৎসার ও সংক্রামক ব্যাধি দমন ব্যবস্থার উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে ; ৫) কি উপায়ে খাদ্যশস্যের পরিমাণ ও উৎকর্য বৃদ্ধি পাইতে পারে ; ৬) কি প্রকারে লোকের আহার্য্যের উন্নতি হইতে পারে ; ৭) খাদ্যাভাবের পুনরাবৃত্তি নিবারণ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

দুর্ভিক্ষে জনসাধারণের কথা কমিশনকে জানাইবার দায়িত্ব নেতাদের উপর। ইহারা প্রস্তুত হইবার যথেষ্ট সময় পাইয়াছেন। দুর্ভিক্ষের মধ্যে সংবাদ প্রকাশে বহু বাধা নিষেধ আরোপিত হইয়াছিল, সুতরাং শুধু প্রকাশিত সংবাদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষে

লোকের কি অবস্থা হইয়াছিল, সরকারী এবং বেসরকারী সাহায্যদান কিরূপে চলিয়াছে, কোন কোন স্থানে লোকে সরকারী সাহায্যকেন্দ্রে কেন যাইতে চাহে নাই, প্রভৃতি অপ্রকাশিত বহু সংবাদ যথোপযুক্ত প্রমাণ সহ কমিশনের নিকট উত্থাপিত হওয়া দরকার। কোন কোন স্থানে যথাসময়ে মজুত চাউল বিলি না হওয়ায় অনাবশ্যক মৃত্যু ঘটিয়াছে এরূপ অভিযোগও আছে, তাহা সত্য হইলে উপযুক্ত প্রমাণ সমেত তাহাও দাখিল হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ প্রণীত Famines in Bengal বইখানির কথা নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। যে উপাদান উহাতে রহিয়াছে তাহাকেই বিস্তৃত তথ্যদির দ্বারা পূর্ণাঙ্গ করিয়া লইলে দুর্ভিক্ষে মৃত লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুর্দ্দশার কাহিনী অন্ততঃ খানিকটাও বলা যাইবে।

(ভাদ্র ১৩৫১)

দুর্ভিক্ষে প্রজার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব

বিলাতের ও আমেরিকার কোন কোন পত্রিকা বাংলার গত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে বাঙালী বা ভারতবাসী এই দুর্দিনে যথাসাধ্য করে নাই। এই অভিযোগ সত্য নয়। সর্বাঙ্গে শৃঙ্খলিত হইয়াও বাঙালী ও ভারতবাসী দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং দুর্ভিক্ষের দুর্দশা প্রশমনে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের সর্বপ্রধান উপায় খাদ্য আমদানী, তার জন্য চাই জাহাজ রেলগাড়ী এবং অন্যান্য সর্ববিধ যানবাহনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। বাঙালীর বা ভারতবাসীর হাতে সে কর্তৃত্ব ছিল না, নৌকাগুলি পর্য্যন্ত সর জন হার্বার্ট ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। তারপর দরকার টাকা। তার জন্য সময় থাকিতে দেশে ও বিদেশে আসন্ন দুর্ভিক্ষের সংবাদ জানাইয়া আবেদন করিতে হয়। বাংলার গত দুর্ভিক্ষে তাহাও হয় নাই। প্রথম হইতেই দুর্ভিক্ষের সংবাদ অত্যন্ত সতর্কতা ও কঠোরতার সহিত চাপিয়া রাখা হইয়াছে। বিদেশ তো দূরের কথা, দেশের লোকেও সময় থাকিতে এই মহাবিপদের সংবাদ জানিতে পায় নাই।

দুর্ভিক্ষে প্রাণ রক্ষার দায়িত্বের প্রশ্ন সকলের আগে উঠে। আমরা দেখিয়াছি বড়লাট লর্ড লিনলিথগো গত দুর্ভিক্ষে একেবারে উদাসীন ছিলেন, ভারত-সচিবও উহা নিবারণে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। অথচ পূর্ববর্তী বড়লাটদের মধ্যে অনেকেই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যে, প্রজার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব সরকারের, জনসাধারণ চিকিৎসা ও কাপড় যোগান প্রভৃতিতে সাহায্য করিবে এই মাত্র। কয়েকজন বড়লাটের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৮৬৮-৬৯ সালের বুন্দেলখণ্ড ও উত্তর-ভারতের দুর্ভিক্ষে বড়লাট লর্ড লরেন্স এই নিয়ম প্রণয়ন করেন যে অনশনে মৃত্যু নিবারণের জন্য সরকারী কর্মচারীগণকে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে এবং এরূপ কোন মৃত্যু ঘটিলে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীকে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করা হইবে। ১৮৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে লিখিয়াছিলেন, "বাংলার দুর্ভিক্ষে একটি মাত্র প্রজারও যাহাতে প্রাণহানি না হয় তার জন্য ভারত-সরকার যে-কোন উপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিবেন না এবং ইহার জন্য যত টাকা প্রয়োজন হইবে তাহাও তাঁহারা সংগ্রহ করিবেন এই ভরসা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট রাখিতে পারেন।" বাংলার লাট সর্ রিচার্ড টেম্পল তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "সরকারী কর্মচারীদের আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে তাহাদের কাহারও দোষে একটি প্রজারও জীবন নাশ হইলে তাহাকে অভিযুক্ত ও পদচ্যুত করা

হইবে।" ১৮৭৬-৭৮ সালের মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে বড়লাট লর্ড লিটন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্য যত অর্থ লাগে তাহা দেওয়া হইবে, যত চেষ্টা দরকার তাহা করা হইবে। কোন কারণেই কোন দুর্গত সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইবে না।"

তারপর লর্ড কার্জন। কার্জনের আমলে অনাবৃষ্টির জন্য ভারতবর্ষে দীর্ঘকালব্যাপী এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলের আয়তন ছিল ৪,৭৫,০০০ বর্গ মাইল এবং এই অঞ্চলের লোকের সংখ্যা ছিল ছয় কোটি। ১৮৯৮ সালে এই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। ১৯০০ সালে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ৬০ লক্ষ। প্রায় নয় কোটি টাকা ইহাতে ব্যয় হইয়াছিল লর্ড কার্জন স্বয়ং দূরতম গ্রামে পর্য্যন্ত গিয়া সাহায্য দান ও চিকিৎসা তদারক করিয়াছেন কাজেই প্রদত্ত অর্থের প্রায় সবটাই দুর্গতের হাতে গিয়াছে। কর্মচারীদের দিয়া তিনি কাজ করাইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের উপর সমস্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া দেন নাই, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের প্রত্যেকটি কাজ তিনি পরিদর্শন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষে অর্থ ব্যয়ের কথা উঠিলে কার্জন ১৯০০ সালের ১২ই জানুয়ারী ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, "মানুষের প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব যেখানে, সেখানে অর্থব্যয়ে আমি কুণ্ঠিত হইব না ; মানুষের প্রাণ বাঁচাইবার এবং চরম দুর্দশা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোষাগারের শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্যয় করিতে গবর্ন্মেণ্ট বাধ্য, গবর্ন্মেণ্টের এই চূড়ান্ত দায়িত্ব আমি স্বীকার করিতেছি।" কলিকাতা টাউন হলে এক সভায় জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়া লর্ড কার্জন বলেন, "প্রজার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব আমার, দুর্ভিক্ষপীড়িতকে বস্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি যোগাইয়া তাহাকে একটুখানি স্বস্তি দিবার জন্য আপনাদের নিকট সাহায্য চাহিতেছি।"

লরেন্স, নর্থব্রুক, লিটন, কার্জন ও টেম্পলের সহিত লিনলিথগো ও হার্ব্বার্টে তুলনা চলে না। এক দলের লক্ষ্য ছিল মানবতার প্রতি কর্তব্য পালন, অপর দল করিয়াছেন চাতুরী। তীব্র জনমত প্রশমনের জন্য যেটুকু না করিলে নয়, লিনলিথগো এবং হার্ব্বার্ট সেটুকুও করেন নাই।

(আশ্বিন ১৩৫১)

দুর্ভিক্ষে সাহায্য

দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানে বাঙালী কিছু করে নাই, ইহাও অসত্য কথা। গত দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সামলাইয়া যাহারা বাঁচিয়া উঠিয়াছে তাহাদের প্রাণরক্ষার ব্যয়ের শতকরা আশি ভাগ বাঙালী নিজে বহন করিয়াছে। বাংলা-সরকারের দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের এক সার্কুলারে জানাইয়াছিলেন যে তিন মাস শতকরা দশ জন লোককে দশ টাকা করিয়া দিলেও আঠার কোটি টাকা দরকার এবং এই টাকা বাংলা সরকারের মোট বার্ষিক আয়ের চেয়েও বেশী। অতএব দেশের লোকের সাহায্যদান প্রবৃত্তি যেন জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ শতকরা দশ জন লোকের, অর্থাৎ মোট ষাট লক্ষ লোক সাহায্য না পাইলে বাঁচিত না, ইহা সত্য, প্রকৃত সংখ্যা ইহা অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম হইবে না। এই ষাট লক্ষ দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মধ্যে সরকারী হিসাবে মরিয়াছে সাত লক্ষ, অবশিষ্ট ৫৩ লক্ষ অন্ততঃ ঐ ত্রিশ টাকা সাহায্য পাইয়া তবে বাঁচিয়া গিয়াছে ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ নিবারণে গর্ন্মেণ্ট সাহায্য

দিয়াছেন সাড়ে তিন কোটি টাকা, বে-সরকারী সাহায্য সমিতিগুলি সংগ্রহ করিয়াছে প্রায় ৫৫ লক্ষ। তন্মধ্যে ৩০/৩৫ লক্ষ বাংলার বাহির হইতে আসিয়াছে, অবশিষ্ট বাংলায় সংগৃহীত। অতএব সরকারী ও বাংলার বাহিরে সংগৃহীত মোট টাকা দাঁড়ায় ৪ কোটি। ৬০ লক্ষ লোকের জন্য দরকার ছিল ১৮ কোটি, পাওয়া গেল ৪ কোটি, অবশিষ্ট দিয়াছে বাঙালী নিজে। বে-সরকারী হিসাবে অনুমান এক কোটির উপর লোক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হয়, এবং আনুমানিক ত্রিশ হইতে চল্লিশ লক্ষ লোক মারা যায়। এদিক দিয়া দেখিলেও হিসাব ঐরূপই দাঁড়ায়। দুর্ভিক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে যিনি যে ভাবে পারিয়াছেন, তিনি তাহাই দান করিয়াছেন। ছোট ছোট বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত নিজেদের আহারের কতকাংশ বাঁচাইয়া তাহা বুভুক্ষুর মুখে তুলিয়া দিয়াছে ইহাও বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে।

তারপর বাঙালী এই দান করিয়াছে কত কষ্টে, কি ভয়ানক অবস্থার মধ্যে তাহাও বিচার্য্য বিষয়। সর জন হার্ব্বার্টের নৌকাপসারণ আদেশের ফলে সহস্র সহস্র চাষী ও ধীবর উপার্জ্জনের একমাত্র পন্থা হইতে বঞ্চিত হইয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে। চাকুরীজীবী ভিন্ন উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বাঙালী মধ্যবিত্তের সচ্ছলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে কৃষকের অবস্থার উপর। ৪০।৫০ টাকা দরে চাউল কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য ইহাদের এমনিতেই নাই, তদুপরি কৃষকের চরম দুর্দশার সহিত ইহাদেরও অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তৎসত্ত্বেও ইহারা গ্রামের বা পাড়ার বুভুক্ষুকে সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হন নাই। তফাৎ শুধু এইখানে যে, সে দানের হিসাব কেহ রাখে নাই।

(আশ্বিন ১৩৫১)

দুর্ভিক্ষের জের

ন্যাশনাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউট রি-ইউনিয়নে সভাপতি ডাঃ অবনীমোহন গোস্বামী দুর্ভিক্ষের পর বাংলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা যেমন সত্য তেমনই মর্ম্মন্তুদ। ডাঃ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

“এক বৎসরকাল বাংলা যে দুরবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতেছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাংলায় যে লোকক্ষয় হইয়াছে, তাহা মনে করিলে শঙ্কিত হইতে হয়। কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর পরে যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাও ভয়াবহ। দীর্ঘকাল অনাহারের ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাবে গাছ পাতা প্রভৃতি আহার করিয়া উদরপূর্তি করায় দেশের জনগণের যে শারীরিক দুরবস্থা ঘটে তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে রোগ-প্রকোপ হইতে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব এবং কাজেই দেশের ব্যাধির বিস্তার মহামারী হইয়া উঠে। আমরা শুনিতেছি, দুর্ভিক্ষে বাংলায় ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে আর ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ লোক শোচনীয় অবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাযাবর রূপে ব্যাধি বিস্তার করিতেছে—আপনারা মরিতেছে।

“দুর্ভিক্ষের পরে ম্যালেরিয়া, ক্ষত, বসন্ত ও রক্তামাশয় মহামারী হইয়া দেখা দিয়াছে। সরকার বাংলার ১৮টি জেলা ম্যালেরিয়া ও বসন্তের লীলাক্ষেত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহারা সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে কোন কোন জেলায় শতকরা ৬২ জন লোক ম্যালেরিয়ায় পীড়িত আর প্রায় শতকরা ৪৫ জন বসন্তে কাতর। ক্ষুধায় ও

অভাবের তাড়নায় দলে দলে স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে এবং সেইজন্য যৌন ব্যাধির বিস্তার ঘটিতেছে।"

সময় থাকিতে সতর্ক হইলে দুর্ভিক্ষ বা মহামারী নিবারণ যে মোটেই কঠিন নয়, স্বয়ং ব্রিটেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এদেশে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের শাখা ভারত-সরকার ও বাংলা সরকার দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষের জের মহামারী কোনটিরই সম্বন্ধে যথাসময়ে সতর্ক হন নাই। পরে যথেষ্ট সময় পাইবার পরও মহামারী আয়ত্তে আনিতে পারে নাই। UNRRA বিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনে অবতীর্ণ হইবার পরও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বা ভারত-সরকার কেহই বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নিবারণের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অথচ বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দুইয়েরই প্রধান কারণ যুদ্ধ।

(চৈত্র ১৩৫১)

ভারতবর্ষ

সাময়িকী

খাদ্য সমস্যা

বহুদিন ধরিয়া নানা স্থানে খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে সমস্যা সমাধানের কোন উপায়ই নির্ণীত হয় নাই। দেশের লোককে দিন দিন অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইতেছে এবং লোক যে ক্রমে একবেলা না খাইয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইতেছে, তাহা মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন। চাউলের দাম বাড়িয়া যখন ৫ টাকা স্থলে ১০ টাকা হইয়াছিল, তখনই লোক শঙ্কায় ভীত হইয়াছিল—কিন্তু সেই চাউলই লোক এখন ৩৫ টাকা মণ দরে ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। এ বিষয়ে গভর্ণমেন্ট পক্ষ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। কারণ তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ইস্তাহার প্রচার করা ছাড়া চাউল সরবরাহে বা চাউলের মূল্য হ্রাসের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। মজুত চাউল সম্বন্ধে যে হিসাবই সঠিক হউক না কেন, বাজারে যে চাউল পাওয়া যাইতেছে না তাহা সকলেই জানেন। মধ্যে বাজারে কিছু আটা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা ধনিকগণ অধিক পরিমাণে তাড়াতাড়ি ক্রয় করিয়া লওয়ায় মধ্যবিত্তগণ এখন আর বাজারে আটাও পাইতেছে না। এই ত গেল প্রধান খাদ্যর কথা। চিনি মধ্যে মধ্যে কন্ট্রোল দরে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া গেলেও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা সুলভ বা সহজপ্রাপ্য নহে। কয়লার অভাবের কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি—কিন্তু এখনও বাজারে আড়াই টাকার কম মণ দরে কয়লা পাওয়া যায় না। কেরোসিন তৈল পাইতে মফঃস্বলের লোকদিগকে কিরূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। বর্ত্তমানে বস্ত্র সমস্যাও ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে; গত এক বৎসর কাল লোক অতি অল্প পরিমাণে বস্ত্র ক্রয় করিয়া অতি কষ্টে দিন চালাইয়াছে—কিন্তু গরীবদের জন্য গভর্ণমেন্ট যে ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা আজও বাজারে বাহির হইল না। কাজেই সকলকে ১০ টাকা জোড়ার ধুতি ও ১৩ টাকা জোড়ার শাড়ী ক্রয় করিতে হইতেছে। এইরূপ অধিক মূল্যে বস্ত্র ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া বহু লোক অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। সে বিষয়ে গভর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন, তাহাও জনসাধারণ জানিতে পারেন নাই। আরও কতদিন এইভাবে চলিবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এইরূপ দারুণ অভাবের ফলে লোকে একবেলা খাইয়া ও অনেক স্থলে না খাইয়া থাকিতে বাধ্য হয়—তাহাতে দেশে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়াছে ও

অকালে মানুষ মারা যাইতেছে। যুদ্ধ যে আজ দেশে কিরূপ দুরবস্থা আনয়ন করিয়াছে, তাহা দেশের ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধ সকলেই সমভাবে বুঝিতে পারিতেছে। ইহার প্রতীকারের কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া লোক নিরাশ হইয়া পড়িতেছে।

(আষাঢ় ১৩৫০)

খাদ্য সমস্যায় গভর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য

১২ই আষাঢ় শনিবার হইতে দুই দিন কলিকাতা শহরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে নিখিলবঙ্গ খাদ্য সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাব বাঙ্গালার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছে। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে 'খাদ্য সংকটের সুযোগ লইয়া যাহারা প্রচুর লাভ করিতেছে এবং যাহারা প্রচুর খাদ্যশস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে বা মজুত করিয়াছে, তাহাদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য সম্মেলন গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছে। মফঃস্বলের মজুতকারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করিয়াছে কলিকাতা ও হাওড়ার মত দুইটি মহানগরীকে সেই ব্যবস্থার আওতার বহির্ভূত রাখায় এবং বাঙ্গালার যে কোন অঞ্চল হইতে যে কোন মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে এজেন্টদিগকে ও বড় বড় ব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহিত করায় সম্মেলন গভর্ণমেন্টের নীতির তীব্র নিন্দা করিয়াছে। গভর্ণমেন্ট ইতিপূর্বেই ঘোষণা করিয়াছে যে চাউল সরবরাহ সম্বন্ধে মফঃস্বলে প্রত্যেক অঞ্চলকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। গভর্ণমেন্টের বর্ত্তমান ব্যবস্থা উক্ত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

চাষী ও সাধারণ গৃহস্থের সঞ্চিত দ্রব্যের দিকে অনাবশ্যক দৃষ্টি দেওয়া এবং উহা সরাইলেই খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইবে এই ভাব ব্যক্ত করায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে—খাদ্য সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য গভর্ণমেন্ট চেষ্টা করিতেছে। গভর্ণমেন্টের এই নীতির জন্য সম্মেলন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য আসল জায়গায় আঘাত না করিয়া এখানে ওখানে হস্তক্ষেপ করিয়া অন্ধকারে হাতড়ানোর মত যে সকল ব্যবস্থা গভর্ণমেন্ট অবলম্বন করিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিতে সম্মেলন গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে সহর ও মফঃস্বলের জনসাধারণকে সমানভাবে খাদ্যদ্রব্য বিতরণের সুষ্ঠু পরিকল্পনাসহ খাদ্য সরবরাহ ও উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যাপক নীতি গ্রহণ করিতে সম্মেলন গভর্ণমেন্টকে আহ্বান করিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে সকল শ্রেণীর নরনারীকে খাদ্য জোগাইবার এমন ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে তাহারা সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে পারে। সম্মেলন এই দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে—নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কিত ব্যাপক পরিকল্পনা কোন দলীয় মন্ত্রীমণ্ডল কর্ত্তৃক সুচারুভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে না। যে গভর্ণমেন্টের উপর জনসাধারণের সকল অঙ্গের আস্থা আছে, তাঁহারাই কেবল উহা কার্যকরী করিতে পারেন। সম্মেলন দাবী করিতেছে যে গভর্ণমেন্ট অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করুন (১) খাদ্যশস্য রপ্তানী সম্পূর্ণ বন্ধ (২) যে পর্যন্ত আমন ফসল না পাওয়া যায় সে পর্যন্ত ঘাটতি অঞ্চলে অন্য প্রদেশ হইতে যথেষ্ট খাদ্য শস্যের আমদানী (৩) যুদ্ধ ব্যবস্থার দরুণ বর্ত্তমান খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্য স্বাভাবিক অবস্থার সময় আবশ্যক ঘাটতি পূরণের জন্য বাহির হইতে গম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আমদানী (৪) অধিক শস্য উৎপাদন আন্দোলনের সাফল্য কল্পে (ক) ভাল বীজ সরবরাহ (খ) সেচ কার্য্যের জন্য সুবিধা

দান (গ) চাষীদিগকে অধিক দাদন (ঘ) পতিত জমির আবাদ (ঙ) সার, কৃত্রিম সার প্রভৃতি সরবরাহ ও (চ) শিশু এবং প্রসূতিকে দুগ্ধ সরবরাহ। ◻

(শ্রাবণ ১৩৫০)

মজুত খাদ্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে

সম্প্রতি অসামরিক সরবরাহ সচিবের দপ্তরখানা হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, গত ৭ই জুন মজুত ধান্য উদ্ধারের জন্য প্রদেশব্যাপী অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। যে পল্লীতে আনুমানিক ১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের বাস এই প্রদেশের ঐ সকল পল্লীতে একটি করিয়া খাদ্য কমিটি গঠন করাই কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায়। ইতিমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ পল্লী-খাদ্য কমিটী গঠিত হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে খাদ্য বিতরণ সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু কোন অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য উদ্বৃত্ত হইলে ঘাটতি অঞ্চলে তাহা স্থানান্তরিত করিবার জন্য কেবলমাত্র সেইসকল ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন। পল্লীর খাদ্য কমিটী মজুত খাদ্যের সন্ধান করিয়া কেবলমাত্র বন্টন করিবেন তাহাই নহে—তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আরও উন্নততর হইবে। বিভিন্ন জেলা হইতে ইতিমধ্যে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে যাঁহাদের নিকট মজুত মাল ছিল তাঁহারা স্বেচ্ছায় দরিদ্র প্রতিবেশীগণের জন্য বিতবণ করিয়াছেন।

(ভাদ্র ১৩৫০)

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের আবেদন

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪ দিন বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলার বন্যাবিধ্বস্ত স্থানগুলি দেখিয়া আসিয়া ২৫শে আগষ্টের সংবাদপত্রসমূহে এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেশের প্রকৃত অবস্থা শুধু বলিয়া দেন নাই—এ অবস্থায় গভর্ণমেন্টের ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—স্থানীয় লোকদিগের সহায়তায় আমি কালনা, মেমারী ও নবদ্বীপে এবং কৃষ্ণনগর সহরে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছি। বেঙ্গল রিলিফ কমিটী সম্ভব মত সাহায্য প্রেরণ করিবে। অতি দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ভাত এবং দরিদ্র মধ্যবিত্তদিগকে চাল, ডাল ও আলু প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কাহাকেও বিনামূল্যে এবং যাহারা দাম দিতে সমর্থ তাহাদের অর্দ্ধ মূল্যে খাদ্য প্রদান করা হইবে। শিশুদিগকে স্থানে স্থানে বিনামূল্যে দুগ্ধ দানের ব্যবস্থা করা হইবে। গভর্ণমেন্ট সাহায্য দান ব্যাপারে আর কিছুই করিতেছেন না—যাহা করিতেছেন তাহার কোন ব্যবস্থা নাই এবং তাহা সন্তোষজনক নহে। এখনও ঐ সকল স্থান হইতে গভর্ণমেন্টের এজেন্টগণ খুব বেশী দামে ধান ও চাউল ক্রয় করিয়া অন্যত্র প্রেরণ করিতেছে। গভর্ণমেন্ট খাদ্যশস্য সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে গভর্ণমেন্ট হইতে যে সকল বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে তাহার সংখ্যা খুবই কম। মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার প্রতি গ্রামে একটা করিয়া বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা উচিত। এগুলি গভর্ণমেন্টের খরচে চলা উচিত। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যে যত খাদ্য দান করিতে পারেন করুন। যে সকল লোকের বাসগৃহ নষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য কিছুই দেওয়া হয় নাই। যে লোক সাধারণ প্রতিষ্ঠানে (বেসরকারী) সাহায্য দান করিতেছেন, গভর্ণমেন্ট

তাহাদিগকে স্বল্প মূল্যে চাল দিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। মধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারগুলিকে সাহায্য দানের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। তাহারা যাহাতে সস্তাদরে খাদ্য দ্রব্য পায় গভর্ণমেন্টের এখনই সে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বস্ত্র বিতরণের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য স্ত্রীলোক বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণে অক্ষম হইয়াছে। তাহাদের অবিলম্বে কাপড় দেওয়া দরকার। কৃষি ঋণ দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু চাষীরা বীজ কোথায় পাইবে তাহা তাহারা জানে না। বন্যার জল চলিয়া গেলে অনেক চাষের জমি পাওয়া যাইবে—গম, বার্লি, ছোলা, মটর প্রভৃতির বীজ বিতরণ করা হইলে চাষীরা ঐ সকল জমীতে কলাই চাষ করিতে পারে। প্রত্যেক স্থানেই লোক আমাকে বীজ সরবরাহ করিবার কথা বলিয়াছে।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া যাহাতে সত্বর লোককে সাহায্য দান করা হয়, সে জন্য কি সরকারী, কি বেসরকারী—সকল সম্প্রদায়ের ধনীর অবিলম্বে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(আশ্বিন ১৩৫০)

কলিকাতার অবস্থা

২১শে আগষ্ট—২১শে আগষ্ট শনিবার কলিকাতার পথ হইতে ৪৮ জন অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্যাম্বেল ও বেহালা এ আর পি হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল—তন্মধ্যে ৮ জন তখনই মারা যায়। ক্যাম্বেল হাসপাতালে ২০ জন পুরুষ ও ৪ জন শিশু—মোট ২৪ জনকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—তন্মধ্যে ২জন অল্পক্ষণ পরেই মারা যায়। বেহালায় ৪ জন পুরুষ, ১১ জন স্ত্রীলোক ও ৯ জন শিশু মোট ২৪ জনকে ভর্ত্তি করা হয়—তন্মধ্যে ৩ জন শিশু ও ৩ জন পুরুষ মারা যায়। শনিবার হিন্দু সৎকার সমিতি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য পুলিসের নিকট হইতে ১১টি মৃতদেহ পাইয়াছিল।

২২শে আগষ্ট—২২শে আগষ্ট রবিবার ১৯ জন অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে—তন্মধ্যে ১০ জন পুরুষ, ৭ জন স্ত্রীলোক ও ২টি শিশু। বেহালা এ আর পি হাসপাতালে ঐ দিন একটিমাত্র শিশুকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। ঐ দিন বেহালা এ আর পি হাসপাতালে ১২জনের মৃত্যু হইয়াছে—তন্মধ্যে ৪ জন পুরুষ, ৩ জন স্ত্রীলোক ও ৫ জন শিশু। হিন্দু সৎকার সমিতি রবিবার পুলিসের নিকট হইতে ৪টি ও ক্যানাল সাউথ রোডের ভবঘুরে নিবাস হইতে ৪টি মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য পাইয়াছিল। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ২০০ ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ১০০ অনাহারক্লিষ্ট রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২৩শে আগষ্ট—গত ২৩শে আগষ্ট সোমবার কলিকাতার পথ হইতে মৃতপ্রায় অনাহারক্লিষ্ট ৩৯ জনকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—তন্মধ্যে ১২ জন মহিলা, ৬ জন শিশু ও ২১ জন পুরুষ। বেহালা এ আর পি হাসপাতালে ঐ দিন কোন অনাহারক্লিষ্ট লোক লইয়া যাওয়া হয় নাই। ২৩শে আগষ্ট হিন্দু সৎকার সমিতি ও আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম কলিকাতার রাজপথ হইতে ২৪টি মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া সেগুলির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বেহালা এ আর পি হাসপাতালে সোমবার ৭জন অনাহারক্লিষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৫ই আগষ্ট হইতে ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৯ দিনে শুধু হিন্দু সৎকার সমিতি রাজপথে ১০০টি মৃতদেহ পাইয়া তাহাদের সৎকার

করিয়াছে। রাজপথ হইতে সংগৃহীত লোকদিগকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে নিম্নলিখিত তিন প্রকার খাদ্য প্রদান করা হইতেছে—(ক) চাল—৪ ছটাক, ডাল—১ ছটাক, মসলা৩/৮ ছটাক ও সব্জী—৬ ছটাক (খ) বার্লি—১ ছটাক, চিনি—১ ছটাক (গ) দুধ—৪ ছটাক, বার্লি ½ ছটাক ও চিনি ½ ছটাক।

২৪শে আগষ্ট—মঙ্গলবার ক্যাম্বেল ও বেহালা এ আর পি হাসপাতালে মোট ৬৭ জন অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। বেহালা হাসপাতালে ঐদিন মোট ৭জন মারা গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হাসপাতালে ২৩শে সোমবার ৪জনকে ভর্ত্তি করা হয়। মঙ্গলবার পথ হইতে ১৪টি মৃতদেহ কুড়াইয়া নিমতলা ও কাশীমিত্র শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়।

২৫শে আগষ্ট—বুধবার ৪৫ জন অনাহারক্লিষ্ট ক্যাম্বেল ও বেহালা হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। বুধবার ক্যাম্বেলে ৮ জন ও বেহালায় ৬ জন অনাহারজনিত রোগে মারা গিয়াছে। গত ১৬ই আগষ্ট হইতে ২৫শে আগষ্ট পর্যন্ত ১০ দিনে বেহালা হাসাপাতালে মোট ৩৩৬ জনকে ভর্ত্তি করা হয়, তন্মধ্যে ১৫ জনকে ক্যাম্বেলে পাঠান হয়, ১৩৩ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় (চিকিৎসার পর) এবং ৬৭জন মারা যায়। এখনও তথায় ১২১ জন অনাহারক্লিষ্ট রোগী আছে—এবং তথায় ১৭৯টি স্থান খালি আছে—তথায় মোট ৩০০ রোগী রাখার ব্যবস্থা আছে।

উপরে মাত্র কয়েকদিনের বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝা যাইবে। প্রধান সহরের যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার গ্রামগুলির কি শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

(আশ্বিন ১৩৫০)

শেষ কোথায়?

যাহারা উত্থান শক্তিরহিত, মৃতপ্রায় বা মুমূর্ষু—কলিকাতার রাস্তা হইতে তাহাদের তুলিয়া লইয়া ক্যাম্বেল বা বেহালার হাসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাদের অনেকেই যাইবার পথেই বা চিকিৎসালয়ে পৌঁছিয়া মরিতেছে। ইহা ছাড়া শতকরা পঁচাত্তরটা লোক উপযুক্ত পথ্য ও সেবা পাইলে বাঁচিয়া যাইতে পারে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস। আমাদের প্রশ্ন—ইহাদের ছাড়িয়া দিলে দাঁড়াইবে কোথায় এবং তাহার শেষ ফল কি? যাহারা সমাজের ও সংসারের সমস্ত অবসান করিয়া কলিকাতার পথে পড়িয়া মরিতেছিল, তাহারা হাসপাতাল হইতে বাহির হইলে দাঁড়াইবে কোথায়? বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয় নাই;তাহা হইলেও দুর্ভিক্ষকালে যেমন সাময়িক আশ্রম করিয়া সেবা ও অন্নের ব্যবস্থা করিতে হয়, সেরূপ ব্যবস্থা অচিরে হওয়া দরকার। সমস্যা কেবল কলিকাতার নয় —সারা বাঙ্গালার, সুতরাং এরূপ আশ্রম বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলে হওয়া দরকার। তাহা ছাড়া আমাদের বিশ্বাস অনশনে কাতর হইলেও যাহাদের দেহে কিঞ্চিৎ শক্তিও অবশিষ্ট আছে, পল্লীর দিকে যদি তাদের আহারের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের কুটীরে বাস করিতে পারে এবং তাহাদের জন্য আর স্বতন্ত্র বাসস্থান ও চিকিৎসার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। তাহাতে যে কেবল ব্যয় আছে তাহা নহে, গভর্ণমেন্টের মনোযোগ একস্থানে অনেকটা নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। আমরা সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে চাই।

(আশ্বিন ১৩৫০)

বাহিরের সহানুভূতি

পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ পাঞ্জাববাসী সকল জমীদারকে বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে পাঞ্জাব হইতে সকল অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বাঙ্গালায় প্রেরিত হয়, সেজন্য তিনি সকলকে অবহিত হইতে বলিয়াছেন।

পাঞ্জাবের নেতা রাজা নরেন্দ্রনাথ, নবাবজাদা রসিদ আলী, পণ্ডিত সন্তানম, বেগম ইফতিখারউদ্দীন, প্রভৃতি এক আবেদন প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধাদি বাঙ্গালায় পাঠাইতে আবেদন জানাইয়াছেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা সকলকে বাঙ্গালা রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন।

সার তেজবাহাদুর সাপ্রু নিজে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন এবং যুক্তপ্রদেশবাসী সকলকে সাহায্য করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ রাওয়ালপিণ্ডিতে গমন করিয়া বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা তথায় বিবৃত করিলে স্থানীয় অধিবাসীরা রায়সাহেব বরকৎরাম চোপরাকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। ঐ কমিটী বাঙ্গালার দুর্দ্দশাগ্রস্তদের জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন।

(আশ্বিন ১৩৫০)

বাঙ্গালার দুঃখ জ্ঞাপন

কলিকাতার মেয়র মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা গত ২৩শে আগষ্ট মিঃ উইনস্টন চার্চ্চিল ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট কুইবেকে তার প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন—"কলিকাতা সহরে ও বাঙ্গালা প্রদেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাবের জন্য দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, লোক অনাহারে মারা যাইতেছে। এখনই আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে যাহাতে ভারতে খাদ্য শস্য প্রেরিত হয়, আপনারা দয়া করিয়া তাহার ব্যবস্থা করুন।"—এই তার প্রেরণ 'অরণ্যে রোদন' হইবে কি না কে জানে?

(আশ্বিন ১৩৫০)

কলিকাতায় মৃত্যুর হার বৃদ্ধি

কলিকাতা সহরে প্রত্যহ বহু অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর আগমনের জন্য শহরের সাপ্তাহিক মৃত্যুর হার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। গত ৫ বৎসর কাল গড়ে প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় ৫৮৮ জন লোকের মৃত্যু হইত। গত জুলাই মাস হইতে মৃত্যুর হার বাড়িয়া যায়—ঐ সময়ে এক সপ্তাহে ৬৮৪ জন মারা গিয়াছিল। কিন্তু গত ২২শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় মোট ১২২৯ জন লোক মারা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, খাদ্যাভাবজনিত রোগেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। খাদ্য সরবরাহের যে ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মৃত্যুর হার যে আরও বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

(আশ্বিন ১৩৫০)

বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষ-কথার প্রচার বন্ধ

৩১শে আগষ্ট নয়া দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এক মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন। বাঙ্গালার খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যে বিবৃতি বাঙ্গালার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহা দেশের অন্যান্য প্রদেশে প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এইভাবে বিবৃতিটির প্রচার বন্ধের কোন হেতু দেখা যায় না। স্টেটসম্যান পত্রে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের যে সকল চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতিতে বর্ণিত বিষয় অপেক্ষা ভীষণ। শ্যামাপ্রসাদবাবুর বিবৃতি প্রচারিত হইলে বাঙ্গালার বাহিরের লোকজন হয়ত বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে অধিক সাহায্য প্রেরণ করিতেন— বিবৃতিটি প্রচারিত না হওয়ায় সাহায্য আসার পথ রুদ্ধ হইতে পারে। যাঁহারা বিবৃতির প্রচার বন্ধ করিয়াছেন, তাহারা হয়ত এদিক দিয়া জিনিষটির বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই।

(আশ্বিন ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান

মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী কলিকাতা ও সহরতলীর অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। সোসাইটীর কার্য্য ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যহ ৩০ হাজার লোককে বিনামূল্যে খাদ্য দেওয়া হইবে, ৫০ হাজার লোককে সুলভে পরোটা দেওয়া হইবে এবং ২৫ হাজার লোককে প্রত্যহ সুলভ খিচুড়ী দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া সহরের সাতটি ওয়ার্ডে মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহকে সুলভ মূল্যে খাদ্যশস্য বিতবণেরও ব্যবস্থা করা হইতেছে। ৭নং ওয়ার্ডে সুলভে মধ্যবিত্ত পরিবারবর্গকে খাদ্য দিবার জন্য ২০২/১ হ্যারিসন রোডে একটি অফিসও খোলা হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের জন্য সোসাইটী ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। সোসাইটি এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪ শত ৩৪ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। সোসাইটীর কার্য্যালয—৩৯১ আপার চিৎপুর রোডে অবস্থিত।

সোসাইটী নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করিতেছেন—মসাট, মেতুর, মগরা থানা, সরিষা, পার্ব্বতীপুর, গাজিরমণ, ঘোড়ামারা, দিঘীরপাড় ও মধুসূদনপুর। এই ৯টি কেন্দ্রের প্রত্যেক স্থানে প্রত্যহ ৫ শত লোক খাওয়ানো হইতেছে। প্রথম ৪টি স্থান ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় অবস্থিত এবং বাকি ৫টি স্থান সুন্দরবনের মধ্যে। কসবা, সোনারপুর, ম্যাডক্স স্কোয়ার ও ৬৫/২ বিডন স্ট্রীট (দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের সহযোগে) এই ৪টি স্থানে প্রত্যহ এক হাজার করিয়া লোক খাওয়ানো হইতেছে। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার বিভীষণপুর পিছাবনীতে এবং সদর মহকুমার সাবং নামক স্থানে সোসাইটী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্দ্ধমান জেলার কালনায় এবং মেদিনীপুর জেলার গোলা গ্রামে (সদর মহকুমার) আরও দুইটি কেন্দ্র খোলা হইবে।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সুলভে পরোটা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে—কলিকাতার জগমোহন মল্লিক লেন, নিউ জগন্নাথ ঘাট রোড, সেন্ট্রাল এভেনিউ, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, হাওড়া, ভবানীপুর ও বালিগঞ্জ। বর্ত্তমানে প্রত্যহ ৫০ মণ পরোটা বিক্রীত হইতেছে—আরও অধিক আটা সংগৃহীত হইলে অধিক কেন্দ্রে পরোটা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ১৬২ নং বৌবাজার স্ট্রীটে প্রত্যহ বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ১২ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে বিনামূল্যে দুধ বিতরণ করা হইতেছে।

কলিকাতা রিলিফ সোসাইটীর পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে প্রত্যহ বিকাল সাড়ে ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এক আনা মূল্যে আধ সের করিয়া খিচুড়ী বিক্রয় করা হইতেছে। ক্রেতাদিগকে পাত্র লইয়া যাইতে হইবে—বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ১৫৫ রসা রোড ভবানীপুর। ১২৬ লোয়ার সার্কুলার রোড। ৮৪ আপার সার্কুলার রোড, পপুলার ক্যান্টিন, ৬৭ রাসবিহারী এভেনিউ, বালিগঞ্জ। পপুলার ক্যান্টিন, ৯৩এ বহুবাজার ষ্ট্রীট। পপুলার ক্যান্টিন, ১নং আর জি কর রোড.....শ্যামবাজার বাজার।

(আশ্বিন ১৩৫০)

অনাথ শিশুদের রক্ষা

সিন্ধু দেশ হইতে ডাক্তার অমরনাথ সুরি ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জানাইয়াছেন যে যতদিন বাঙ্গালায় অন্নাভাবে থাকিবে, ততদিন তিনি বাঙ্গালার ২ শত অনাথ শিশুকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। মহালক্ষ্মী কটন মিলের শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্তও ১০ বছরের কম বয়সের ১ শত শিশুকে যতদিন না তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় ততদিন প্রতিপালন করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী ১ শত শিশুকে মজঃফরপুরে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

(আশ্বিন ১৩৫০)

আশ্রয় ব্যবস্থা

বাঙ্গালা সরকার এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে কলিকাতায় আগত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য যাহারা ১৭শত লোকের উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহা নিম্নলিখিতরূপ—বেহালা হাসপাতাল-৩০০, ক্যাম্বেল হাসপাতাল-২৫০, লেক ক্লাব গৃহ-১২০, কামারহাটী হাসপাতাল-৩০০, উত্তরপাড়া হাসপাতাল-৪৩০, কোন্নগর হাসপাতাল-১৫০ সুরেশ চন্দ্র রোড হাসপাতাল-১৫০। কলিকাতার রাস্তা হইতে কুড়াইয়া প্রথমে তাহাদের ১০ নলিন সরকার ষ্ট্রীটে বা ৫৫ হরিশ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে রাখা হইতেছে, এজন্য লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ এবং সাখাওয়াত হাইস্কুল গৃহও গ্রহণ করা হইয়াছে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

পণ্ডিত মালব্যের আবেদন

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এক আবেদন প্রচার করিয়া বাঙ্গলার এই দুর্দ্দিনে ভারতবাসী সকলকে বাঙ্গালার দুর্দ্দশাগ্রস্তদিগকে সাহায্য দান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। সার তেজবাহাদুর প্রমুখ যাঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা যাহাতে অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, সেজন্য মালব্যজী সকলকে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন।

(আশ্বিন ১৩৫০)

বোম্বাইয়ের সাহায্য

বোম্বাই হইতে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাঙ্গলার সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের নিকট ৫০ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁরা আরও অর্থ এবং খাদ্যদ্রব্য ব্যবস্থা করিতেছেন।

(আশ্বিন ১৩৫০)

পাটনার সাহায্য

পাটনার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র দাস, রায়বাহাদুর শ্যামনন্দন সহায়, ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি বাঙ্গলাকে সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। সেজন্য তথায় 'বঙ্গীয় সাহায্য ভাণ্ডার' খোলা হইয়াছে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

হুগলী জেলায় সাহায্য দান

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে তিনি হুগলী জেলায় কৃষি ঋণ হিসাবে ৮০ হাজার, গৃহনির্ম্মাণ সাহায্যবাবদ ২০ হাজার টাকা ও বিতরণের জন্য ৬৪ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। শ্রীরামপুর মহকুমায় বিনামূল্যে খাদ্য দানের জন্য ৬০ হাজার টাকা এবং আরামবাগ মহকুমায় কৃষিঋণের জন্য আরও দেড় লক্ষ ব্যয় করা হইবে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

পাঞ্জাব ধনীর সাহায্য

পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ধনকুবের সার গঙ্গারামের পৌত্র লালা শ্রীরাম ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জানাইয়াছেন, তিনি বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত এক শত লোককে পাঞ্জাবে আহার ও বাসস্থান দিবেন। ঐ সকল লোকের যাতায়াতের খরচও তিনি বহন করিবেন।

(আশ্বিন ১৩৫০)

যুক্তপ্রদেশের সাহায্য

গত ২৯শে আগষ্ট সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু 'লীডার' সংবাদ পত্রের মারফত দ্বিতীয়বার এক আবেদন জানাইয়া বাঙ্গলার এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গলার সকল লোককে সাহায্য করিবার জন্য যুক্তপ্রদেশবাসী সকলকে অনুরোধ করেন। ফলে ঐ দিন পর্য্যন্ত এলাহবাদস্থ সাহায্য ভাণ্ডারে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭ শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

কুমার গোকুলচন্দ্র লাহা

স্বর্গত রাজা কৃষ্ণদাস লাহার পুত্র গোকুল চন্দ্র লাহা বারাসতের নিকট আড়বেলিয়ায় ও ডায়মণ্ডহারবারের নিকট বালাখানিতে অন্ন বিতরণ কেন্দ্র খুলিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান সাতগাছিয়ায়

চাউল বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের কলিকাতাস্থ বাসগৃহেও প্রত্যহ খাদ্য বিতরণ করা হইতেছে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

পাইক পাড়া রাজবাটী

পাইক পাড়া রাজবাটীর কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতারা গত ২৯শে আগষ্ট হইতে তাঁহাদের বাড়ীতে অন্নদান কেন্দ্র খুলিয়াছেন। তাঁহারা আগামী ৪ মাস কাল প্রত্যহ ২ শ লোককে খাইতে দিবেন।

(আশ্বিন ১৩৫০)

বিরলা শিক্ষা ট্রাষ্ট

বিরলা শিক্ষা ট্রাষ্টের কর্ত্তৃপক্ষ ভদ্র পরিবারের দুই শত বাঙ্গালী বালককে (৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক) জয়পুর রাজ্যের জিলানীতে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষাদান করিবেন। আগামী ১ বৎসর কাল এই সাহায্য চলিবে এবং তাহাদের দেখাশুনার জন্য কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককেও লইয়া যাওয়া হইবে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

দিল্লীতে কমিটী গঠিত

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার জন্য দিল্লীতে বেঙ্গল রিলিফ এসোসিয়েসন নামক যে সমিতি গঠিত হইয়াছে—লেডী প্রতিমা মিত্র তাহার সভানেত্রী এবং ডাক্তার সুধীর কুমার সেন তাহার সাধারণ সম্পাদক হইয়াছেন। ১নং রেসকোর্স রোড, নিউদিল্লীতে সভানেত্রী কর্ত্তৃক সমস্ত সাহায্য গৃহীত হইতেছে।

(আশ্বিন ১৩৫০)

বাজারের অবস্থা

১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—(১) ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে পাবনার বাজারে চাল, ধান কিছুই নাই, (২) কুড়িগ্রামের বাজারে চাল নাই—পূর্ব্ব হইতেই আটা ও ময়দা ছিল না, (৩) ৯ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের বাজারে আদৌ চাল ছিল না, (৪) চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে বাগেরহাট বাজার হইতে চাউল একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, (৫) গভর্ণমেণ্ট-নির্দিষ্ট ২৬ টাকা মণ দরে কুমিল্লার বাজারে কোন চাল পাওয়া যায় না। ভাল আতপ চাল ৭০ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। (৬) চাঁদপুরের বাজারে চাল নাই, (৭) ভোলা মিউনিসিপ্যালিটি এ পর্য্যন্ত ৭০টি মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। ঐ সকল শব পথে পড়িয়াছিল—তাহাদের আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না। এইরূপ সংবাদ প্রত্যহই সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে খাদ্যশস্য বাঙ্গলায় আসিতেছে, তাহা কোথায় যাইতেছে?

(কার্ত্তিক ১৩৫০)

কলিকাতায় মৃত্যু

গত ১৬ই আগষ্ট হইতে ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কয়দিনে কলিকাতার পথে ৩৯২ জন এবং হাসপাতালসমূহে ২৭৩ জন লোক অনশন জনিত রোগে মারা গিয়াছে। গড়ে প্রত্যহ অনাহারে কলিকাতায় ৩৭জন লোক মারা যাইতেছে।

(কার্তিক ১৩৫০)

মফঃস্বলে চাউলের অভাব

যশোহর, বরিশাল, ঘাটাল, মুন্সিগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে তার যোগে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জানানো হইয়াছে যে কোন বাজারে আর টাকা দিয়াও চাল পাওয়া যাইতেছে না। এবিষয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের জানাইয়াও কোন কাজ হয় নাই। (১৫ই সেপ্টেম্বরের সংবাদ।)

(কার্তিক ১৩৫০)

কলিকাতায় জনসভা

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে এক জনসভায় বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের জন্য বর্তমান মন্ত্রিসভার কার্য্যের নিন্দা করা হইয়াছে। সভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ এ কে ফজলুল হক, ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা, মিঃ সামসুদ্দীন আহমেদ প্রভৃতি এবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় এই সমস্যা সমাধানের কথাও আলোচিত হইয়াছিল।

(কার্তিক ১৩৫০)

শ্রীমতী নাইডুর আবেদন

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় বিচলিত হইয়া নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের কর্ম্মীদের এ বিষয়ে তৎপর হইয়া কাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং নিম্ন ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইতে আবেদন করিয়াছেন—নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের সাহায্য সমিতির সম্পাদিকা—পি ৪৬৬ সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা।

(কার্তিক ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষে মৃত্যু সংখ্যা

বর্ত্তমান মন্বন্তরে মৃত্যু সংখ্যা লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। অন্য কোথাও নয়, খাস লণ্ডনে মিঃ আমেরি যে সংখ্যা দিতেছেন, তাহা শুনিয়া ভারতের লোক বিস্ময়াভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান সভ্য জগতের নিকট লজ্জিত হইবার ভয়েই যে এরূপ করা হইতেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা যে কত তাহা সরকার কেন, বাঙ্গালা সরকারও জানেন না। সে হিসাব রাখিবার বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। সারা বাঙ্গালা দেশের অবস্থা যে কি, তাহা প্রতি জেলা এমন কি, প্রতি

গ্রামের ভয়াবহ দৃশ্য ও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হইতে পাওয়া যাইতেছে। তাহার অধিক আর কিছুই হয়ত বলিবার নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কত সংখ্যক লোক অনশনে মৃত্যুবরণ করিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে। তদ্দারা কেবল যে বর্তমান গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে তাহা নহে, মৃত্যু সংখ্যা হইতে স্থান বিশেষের দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইলে সেই প্রদেশে অধিক মাত্রায় সাহায্য পাঠাইয়া বিপদ দূর করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। পল্লীর কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় গভর্ণমেণ্টের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও লণ্ডনস্থ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা না করিয়া পারা যায় না। ১৬ই ও ১৭ই আগষ্ট তারিখের হিসাব নকল করিয়া প্রকাশ করা হয়। দুই দিনে ১২৭ জন অনশনক্লিষ্টকে (তথাকথিত) হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহার মধ্যে ১২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ১২০ জনকে প্রকাশ্য রাজপথ হইতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই রাস্তায় বহু সংখ্যক মৃতদেহ পড়িয়া থাকিত, কিন্তু ২২শে জুলাই তারিখের পূর্ব্বে কোনও পত্রিকা তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই। দুই দিনের সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরই ১৮ই তারিখ হইতে রাজপথের মৃতদেহের সংখ্যা প্রকাশ বন্ধ করা হয়। হাসপাতালে স্থানান্তরিত রোগীর সংখ্যা ঐ দিন ১২৯ এবং তথায় মৃত্যু সংখ্যা ৯ জন। ২১শে হইতে ২৭শে (আগষ্ট) পর্য্যন্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত অনশনক্লিষ্টের সংখ্যা ১০০ অপেক্ষা কম থাকে, কিন্তু তাহার পর হইতে আর এত কম হয় নাই, প্রায়ই ২০০-এর সন্নিকটে থাকে, ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৩২৫ হইয়া যায়। ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে সংবাদপত্রে সমস্ত সংখ্যা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সম্ভবতঃ সরকার পক্ষ আশা করিয়াছিলেন সংখ্যা প্রকাশ বন্ধ করিলে দুর্ভিক্ষ সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। দুই দিন বন্ধ করিবার পর সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনার ফলে আবার সংখ্যা প্রকাশ আরম্ভ হয়। তখন ডাইরেক্টর অফ্ ইনফরমেশন মৃত্যুকারণ লইয়া শব বিভাগ করিয়া ফেলেন। তিনি বলিলেন "Death in the majority of cases was due to chronic ailments which had been neglected in the past " অর্থাৎ পুরাতন ব্যাধি অথবা অতীতে সেই সকল রোগ উপেক্ষিত হওয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্ধারিত হয়। 'পুরাতন ব্যাধি' কোন বাঙ্গালীর শরীরে নাই, তাহা বলা যায় না। কাহার হয়ত অত্যধিক মদ্যপানে যকৃত বিকৃতি রোগ আছে, কাহারও দেহে উপদংশ, কাহারও বা বাঞ্ছিত (নারী) রত্নলাভে বিফলতাহেতু হৃদয়যন্ত্রের বৈকল্য, কাহারও মেদ বৃদ্ধি হেতু উদর স্ফীতি, কাহারও অকস্মাৎ অর্থলাভে শিরোঘূর্ণণ, কাহারও ভাগ্যলক্ষ্মীর আবির্ভাবে কদলী বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গুলী-স্ফীতি প্রভৃতি রোগ আছে ; তাহাতে কেহ মরে নাই। সভ্য-জগতে প্রত্যেক শরীরে ক্ষয় জীবাণু এবং অপরাপর বহু রোগের জীবাণু অবস্থান করিতেছে ; ইহার উপর যদি দিনের পর দিন, অনাহার হেতু মৃত্যু ঘটে, তখন শব ব্যবচ্ছেদে যে সকল দৈহিক যন্ত্রের বিফলতা দৃষ্ট হয়, তাহাই মৃত্যুর কারণ বলিয়া বর্ণিত না হইয়া অনশনই মৃত্যুর কারণ বলিয়া ঘোষিত হওয়া উচিত। যাহাই হউক সরকারী আদেশ প্রচারিত হইবার পর কলিকাতায় অনশন ঘটিত মৃত্যু সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইল। রোগী মাত্রেই হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় নাই। তাহা সকলেই জানেন। যে সকল মূর্ত্তি সচরাচর পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিই সরকারী শুশ্রূষাবাসে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। তাহা না হইলেও কমবেশি ১২,০০০ রোগী তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪০০০ লোকের জীবনান্ত হইয়াছে (১৬ই আগষ্ট হইতে ২৭শে অক্টোবর)।

যেভাবে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হয় তাহাতে মৃত্যু সংখ্যার কোনও হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পথে পড়িয়া অনাহার ঘটিত একটা মৃত্যু সংখ্যা দেওয়া হইত; তাহাতে গড়ে ৩৫ জন পাওয়া যায়; তাহার পর হইতে হিন্দু সৎকার সমিতি ও আঞ্জুমান মফিউদুল ইসলাম যে সকল লোকের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করে তাহার সংখ্যা প্রকাশিত হয় (ইহাও কেবল 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় পাওয়া যায়)। ইহার মধ্যে হাসপাতালে মৃত লোকও আসিয়া পড়িয়াছে, কেহ হয়ত আত্মীয়-স্বজনের হাতে পড়িয়াছে। পুলিশ পক্ষে মৃতদেহ স্থানান্তর (Police Corpse Disposal Squad) করিবার এক ব্যবস্থা আছে; তাহারা মৃতদেহ লইয়া নিজেরাই সুব্যবস্থা করে কি না জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহার অধিকাংশই নিঃস্ব সৎকারীদিগের নিকট দেওয়া হইয়াছে। মোট সম্মিলিত সংখ্যা (২৭.১০.৪৩) ৬,৩০০।

বেশ চলিতেছিল, কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তা (Health Officer) বলিলেন—১লা আগষ্ট হইতে ১৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭,৯৬৪ জন নিঃস্ব (Pauper) কলিকাতা সহরে মারা গিয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের দেহ কেহ দাবী করে নাই, সম্ভবতঃ সরকারী ব্যয়ে তাহাদের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সকল লোকের অন্ন জুটিত না, তাহার উপর এই দুর্ভিক্ষের দায়ে তাহারা অনশনে মরিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

যদি কলিকাতার এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে মফঃস্বলের অবস্থা কিরূপ, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। কলিকাতায় অবশ্য অনেক লোক অন্নের আশায় আসিয়া পড়িল, তাহার মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা অনেক। কিন্তু সেখানে সরকারী হাসপাতালে অন্ততঃ ১২ হাজার লোক স্থান পাইয়াছে; কলিকাতার অধিবাসীরা অনেক পূর্ব্ব হইতেই অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং সরকারী ব্যবস্থাও কিছু কিছু হইয়াছে। সেই হিসাবে পল্লীর দিকে অনেক বেশী লোক মরিয়াছে; ভাল করিয়া সংবাদ কেহই রাখে নাই।

সরকারী হিসাবে সারা বাঙ্গালায় প্রতি সপ্তাহে আন্দাজ ১০০০ লোক মরিতেছিল, ডাঃ হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সমস্ত অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া বলেন যে একটা বড় মহকুমায় প্রতিদিন অন্ততঃ সহস্র লোকের জীবনাবসান ঘটিতেছে। শেষ পর্যন্ত বিব্রত হইয়া মিঃ আমেরী ২৮শে অক্টোবর তারিখে স্বীকার করিলেন কেবল সহরে গত ৮ সপ্তাহে অন্ততঃ ৮,০০০ লোক মরিয়াছে; পল্লীর সমস্ত সংবাদ কেহ জানে না। ইহাতে সভ্য জগতে কাহারও নিকট গৌবব নাই; কেবল মিঃ সুরাবর্দ্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তাহারা যে অপর ক্ষুধার্ত্তদিগের অন্নের জন্য জীবিতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহায্য করিয়াছে, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিয়াছেন। মৃতেরা কি সান্ত্বনা বা গৌরব পাইল, জানা যায় নাই।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

বাঙ্গালায় মৃত্যুর হিসাব

ভারত সচিব বিলাতে কমন্স সভায় জানাইয়াছেন যে প্রতি সপ্তাহে বাঙ্গালা দেশে এক হাজার বা কিছু বেশী লোক মারা যাইতেছেন। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' প্রকাশ করিয়াছেন যে সমগ্র বাঙ্গলায় প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ৪০ হাজার লোক মারা যাইতেছে। কোন্ হিসাবটি ঠিক জানি না। তবে মৃত্যুর সংখ্যা যে অত্যন্ত অধিক, তাহা আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

সংবাদ সরবরাহ বন্ধের প্রতিবাদ

ভারতে বর্ত্তমানে সংবাদপত্রসমূহকে সংবাদ সরবরাহ বন্ধ করার ব্যাপারে যে সরকারী নীতি চলিয়াছে, সে বিষযে গত ৩০শে অক্টোবর এক সভায় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয় বক্তৃতা করেন। তিনি বলিয়াছেন—যুদ্ধারম্ভের পর হইতে সংবাদ সেন্সার ব্যবস্থার আলোচনা করিলে ইহার তিনটি স্তর পরিদৃষ্ট হয়—(১) সত্যাগ্রহ আন্দোলন, (২) কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তারের পর হাঙ্গামা এবং (৩) বাংলার দুর্ভিক্ষ—এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে। দুর্ভিক্ষের ফলে রাজনীতিক কার্যকলাপ একরূপ বন্ধ হইয়াছে এবং দুর্ভিক্ষ কবলিত বাঙ্গলায় বাঁচিয়া থাকার প্রশ্ন ব্যতীত এখন আর অন্য কোন চিন্তা নাই। প্রত্যেকেই ইহা মনে করেন যে, অন্তত এই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে সংবাদ ও মন্তব্যাদি প্রকাশ—এমন কি অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে সমগ্র অধিবাসীদিগের উপর ইহার ফল কিরূপ মারাত্মক হইবে এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিবার জন্য সংবাদপত্রগুলিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়াই আবশ্যক। সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোভাবই এদেশের সেন্সার ব্যবস্থার মূল কারণ। নির্ব্বুদ্ধিতা, আত্মদৌর্ব্বল্য এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সঞ্জাত ঔদ্ধত্যই এই মনোভাবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলন বারম্বার ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

শ্রীমতী পণ্ডিতের বিবৃতি

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মেদিনীপুর জেলা ঘুরিয়া আসিয়া গত ২৫শে অক্টোবর নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন—খড়গপুর ও কাঁথির অঞ্চলে আমি তিনটি মৃতদেহ ও ৫টি নরকঙ্কাল দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কুকুরে একটি মৃতদেহ ইতিমধ্যেই ভক্ষণ শুরু করিয়াছে। শবের উদরের অংশ নাই। শকুন ও কুকুর দেহটিব দ্বাবা উদরপূর্ত্তি করিতেছে। অপর এক স্থানে আমি অপর এক বৃদ্ধের শব দেখিলাম। দেহটি তখনও সম্পূর্ণভাবে ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই। শবের কঙ্কালসার দেহ ও মুখের চেহারা এত বীভৎস যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। এক স্থানে একটি নারীর মৃতদেহ দেখিলাম। সে একখণ্ড মলিন ছিন্ন বস্ত্র ও একটি মাটির ভাণ্ড আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। পরলোকযাত্রার প্রাক্কালেও সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব ফেলিয়া যাইতে চাহে নাই। কতকগুলি স্থানে মৃতদেহ পথিপার্শ্বস্থ খানা ডোবা ইত্যাদিতে ফেলা হইয়াছে। ফলে ঐ অঞ্চলগুলি গলিত শবের পূতিগন্ধে বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র কৃষক ও মজুরেরা ২-৪টি পয়সা বা ২।১ মুষ্টি তণ্ডুলের বিনিময়ে নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দিয়া খাদ্যের আশায় সহরের দিকে চলিয়া যাইতেছে। হাটের দিনে পথিপার্শ্বস্থ দোকানগুলিতে গৃহস্থের পিতলের বাসনপত্র ও স্ত্রীলোকের রূপার অলঙ্কারাদি বিক্রয়ার্থ মজুত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।”

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

নারায়ণগঞ্জের অবস্থা

নারায়ণগঞ্জ ঢাকা জেলার মহকুমার সহর ও পূর্ব্ববঙ্গের একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র। গত আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে শহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহু লোক খাদ্যাভাবে ভিক্ষার জন্য সহরে

আসিয়া রাজপথে মারা গিয়াছে—ভিক্ষা পাওয়াও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে রাজপথ হইতে ৫৫৩টি বেওয়ারিশ মৃতদেহ উঠাইয়া দাহ করিতে হইয়াছে।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

পণ্ডিত কুঞ্জরুর অভিমত

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সম্প্রতি বাঙ্গালার দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্থানগুলি দেখিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস বাঙ্গালাদেশে প্রতি সপ্তাহে অনাহারে ৫০ হাজার করিয়া লোক মারা যাইতেছে। তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গালায় যাহা ঘটিতে দেওয়া হইয়াছে ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও তাহা ঘটা সম্ভব হইত না। তিনি বলিয়াছেন, গ্রামে কৃষকদের নিকট জমা ফসল নাই। তাহা হইলে গ্রামে এত খাদ্যের অভাব হইত না।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

রয়াল কমিশন নিয়োগ দাবি

গত ১লা নভেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—"যে খাদ্য সঙ্কটের জন্য বাঙ্গালায় এতগুলি লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি রয়াল কমিশন গঠন করিতে কর্পোরেশন ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের কাছে আবেদন জানাইয়াছে।" কমিশন বসাইয়া লাভ কি হইবে?

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

ত্রিপুরা জেলায় মৃত্যু

ত্রিপুরা জেলার গৌরীপুর ইউনিয়নের মধ্যে ২ মাসে ৫ শত লোক মারা গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৫০ জন কৈবর্ত্ত। শুধু গৌরীপুর বাজারে ২ শত লোক মারা গিয়াছে। সুন্দরপুর ইউনয়নে ১০০, দাউদকান্দি ইউনিয়নে ৫০০ ও ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নে ৩৬০ জন মারা গিয়াছে। নদী ও নালাগুলিতে মৃতদেহ ফেলিয়া দেওয়ায় জল দূষিত হইতেছে। দুর্গন্ধের জন্য নৌকা চড়িয়া যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

মৈমনসিংহ জেলার অবস্থা

মৈমনসিংহ জেলার পল্লী অঞ্চলের অবস্থা যেমন মর্ম্মন্তুদ, তেমনই ভয়াবহ। কচু গাছ ও আরও নানা লতাজাতীয় গাছ আজকাল গ্রামে খুব কমই দেখা যায়; গ্রামবাসীরা ইহাই তাহাদের বর্ত্তমানের একমাত্র সম্বল করিয়াছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেহই কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকায় না। রাস্তায় ঘাটে মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। নানাবিধ রোগও যেন সময় বুঝিয়া একে একে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কলেরা, স্থানে স্থানে বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। শত শত লোক প্রতিদিন এই জেলায় মারা যাইতেছে। সমস্ত জেলাটাই যেন শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

রয়াল কমিশন নিয়োগ দাবি

৪ঠা নভেম্বর লণ্ডনে কমন্স সভায় যখন ভারতের দুর্ভিক্ষের কথা আলোচনা হইতেছিল, তখন পার্লামেণ্টের ৫ শত সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩৫ হইতে ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের দরদ এই সংখ্যা হইতেই বুঝা যায়। পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ কোভ দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে রয়াল কমিশন দ্বারা তদন্তের দাবী করিয়াছিলেন।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

সরকারের কর্ত্তব্য কি?

বাঙ্গালার দুর্দ্দশা মোচনে সরকারের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকট নিম্নলিখিত বিষয় জানাইয়াছেন—(১) বর্তমানে গভর্ণমেণ্ট বা বড় কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোনও খাদ্যশস্য বিশেষতঃ আমন ধান্য ক্রয় করিবেন না। সৈন্য দল ও বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি (যাহাদের অধীনে বহু শ্রমিক কাজ করে) তাহাদের হাতে যদি উদ্বৃত্ত চাউল থাকে তবে তাহা যথাসম্ভব বাজারে বিক্রয় করিয়া দিবার নির্দ্দেশ দিতে হইবে। (২) অবিলম্বে বাঙ্গালা হইতে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য চালান দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। অন্যান্য স্থান হইতে বাঙ্গালায় খাদ্যশস্য আমদানীর সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টকে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের অসামরিক জনগণের খাদ্য সরবরাহের ভার লইতে হইবে। (৩) ধান কড়ারী ঋণ বা ধান দাদনের দেনা শোধ করা বন্ধ রাখিবার নির্দ্দেশ দিতে হইবে। (৪) কেবলমাত্র অনুমোদিত ব্যবসায়ীদেরই ধান চাউলের ব্যবসা করিতে দেওয়া হইবে। (৫) উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে ঘাটতি এলাকায় ধান চাউল সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে।

(পৌষ ১৩৫০)

ভারতের দুর্ভিক্ষে পার্ল বাক

মিসেস পার্ল বাক বর্তমানে আমেরিকায় নিউইয়র্কে বাস করেন। তিনি তথায় ভারতের দুর্ভিক্ষে সাহায্য কল্পে এক জরুরী কমিটী গঠন করিয়া যাহাতে সত্বর ভারতে খাদ্য প্রেরিত হয়, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধে আহতদের জন্য তথায় যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে ভারতকে ৫০/৬০ লক্ষ ডলার দিবার জন্যও তিনি অনুরোধ জানাইয়াছেন। মিসেস বাক সাহিত্যিক ও নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা হয়ত কতকাংশে সফল হইবে।

(পৌষ ১৩৫০)

প্রতি সপ্তাহে লক্ষ লোকের মৃত্যু

বাঙ্গালা পরিভ্রমণের পর দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু তথায় এক সভায় বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা দেশে প্রতি সপ্তাহে এক লক্ষ লোক মারা যাইতেছে। তিনি ভারত সচিব মিঃ আমেরীকে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া ২/৩ দিন থাকিয়া দেশের অবস্থা দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

(পৌষ ১৩৫০)

চট্টগ্রামে মৃত্যুর হিসাব

গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মোট ২৬৫৯ জন লোক মারা গিয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে মাত্র ৩৬৫ জন মারা গিয়াছিল। কক্সবাজার মহকুমার কুতুবদিয়া দ্বীপে মোট ৪২ হাজার লোকের বাস, গত অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তথায় কয় মাসে মোট ১০ হাজার লোক মারা গিয়াছে।

(পৌষ ১৩৫০)

স্টেটসম্যানের দুর্ভিক্ষ পুস্তিকা

বাংলার দুর্ভিক্ষ ও সরকারী ঔদাসীন্য সম্বন্ধে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় যে সকল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, ছবি, পত্রাদি ছাপা হইয়াছিল, সেইগুলি একত্রিত করিয়া উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষ Mal-administration in Bengal নামক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলার চরম দুর্দ্দশার দিনে রাজরোষের ভয়ে অথবা যে কোন কারণেই হউক, অন্যান্য ভারতীয় পত্রিকাগুলি যখন প্রায় নিঃশব্দ ছিল, তখন স্টেটস্‌ম্যান কাগজেই সর্ব্বপ্রথম বাংলার দুর্ভিক্ষ ও জনসাধারণের অন্নাভাবে শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ সচিত্র প্রকাশিত হয়। দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বাংলা সরকার, ভারত সরকার ও ভারত সচিব—ইহাদের সকলকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে দায়ী সাব্যস্ত করিয়া পুস্তিকাগুলিতে প্রত্যেকের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। যদিও ইহাতে কংগ্রেসী দল, হক্‌-শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীমণ্ডলী ও হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের উগ্র ভাষায় অহেতুক নিন্দা এবং ইউরোপীয় স্বার্থ সংরক্ষণসূচক সকল প্রকার সম্ভব প্রচেষ্টা দেখা যায় তবু জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা যে আন্তরিকতার সহিত স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা দেশে দেশে পৌঁছাইয়া দিয়া অগণিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহানুভূতি আদায় করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সংবাদপত্রের প্রাত্যহিক বিবরণ নূতন সংবাদের ভিড়ে চাপা পড়ে যায়, পুস্তিকাখানি প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থায় মানুষের সৃষ্ট এই সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

(ফাল্গুন ১৩৫০)

এ জাতি অনেক দিন আগেই ঘৃণিত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতো। কিন্তু তা কি হয়? চারিদিকে যখন দেখছ মৃতের আর শবের সমারোহ, জীবনের ও জীবিকার সন্ধান নেই কোথাও, তখন হে আমার কিশোর বন্ধুরা তোমরা কি করবে এ মৃতের আর শবের দেশে বেঁচে থেকে? তোমরা বেঁচে আছ তোমাদের প্রতিদিনকাব কাজের ভেতর দিয়ে, কিশোর চিন্তার ভেতর দিয়ে, ছোট ছোট সেবা কাজের ভেতর দিয়ে। আজকে এই অতি দুঃসহ দিনে প্রার্থনা করো যেন দেশ, জাতির কাছে আমাদের মতো তোমরা যেন মৃত ও শব ও জড়পিণ্ড বলে পরিগণিত না হও। শুধু প্রার্থনা নয়, সে প্রার্থনায় অন্তরের আন্তরিক যোগ ঘটাও। এই হোক আমাদের এ মাসের প্রার্থনা।

(ভাদ্র ১৩৫০)

ত্যাগ করো

যে যুগে তোমরা জন্মেছ, সে যুগ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগ—এবং ক্লিষ্ট যুগ। তোমাদের চোখের সামনে দিয়ে, তোমার আমার প্রতিদিনকার জীবনের ভেতর দিয়ে যে ইতিহাসের সৃষ্টি হচ্ছে তা কি উপলব্ধি করছো তুমি—আমি?

বাংলা দেশ—সোনার বাংলা—আজ তা শ্মশান হয়েছে। মানুষের মারে আর প্রকৃতির মারে এদেশ আজ মরে যেতে বসেছে। তোমাদের জীবনেও অভাবের অন্ত নেই জানি কিন্তু তবু বলব তুমি ভাল আছ, আমি ভাল আছি। এখনও বেঁচে আছি। দেশের জনসাধারণ যারা অসহায়ভাবে মারা যাচ্ছে তখন কি আমরা শুধু নিশ্চেষ্ট হয়ে দেখব, সরকার আর ভাগ্যকে দোষারোপ করেই সন্তুষ্ট থাকব? এই দুঃসহ দিনে তোমাদের সকলের কাছে আমার নিবেদন: এখনও যে বিলাসিতা, যে ব্যয় বাহুল্য, এখনও আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে আছে তাদের ত্যাগ করো নিজেদের প্রতিদিনের ব্যয় থেকে সামান্য কিছু বাঁচিয়ে. বা পল্লীর প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু কিছু সংগ্রহ করে বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে দান করো, এদের বাঁচার অবকাশ দাও। সিনেমায় বা থিয়েটারে বাজে খরচ এক মাস ত্যাগ করো এবং সংগৃহীত অর্থ পাঠাও যে কোন সাহায্য ভাণ্ডারে। এই হোক আমাদের এ মাসের ত্যাগ স্বীকার।

(ভাদ্র ১৩৫০)

এ মাসের প্রার্থনা

এ মাসে নতুন কি প্রার্থনা করবে তোমরা? দুঃসময়ে বেদনা আর অভাবের ভিতর দিয়ে কাটছে দিন এদেশের জনসাধারণের। সমস্ত বাংলাময় মৃত্যুর বিভীষিকা। পথের পাশে, চোখের সামনে, বাড়ীর দোর গোড়ায় আমাদের মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে মরছে এদেশের চাষী, তাঁতী, মজুর। যারা এককালে বাংলার মাঠে মাঠে সোনা ফলিয়েছে, আজকে তারাই দুটো অন্নের অভাবে অসহায় ভাবে মারা যাচ্ছে—এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক আর কি হতে পারে? এমনি দুঃসময়ে কি হবে আমাদের প্রার্থনা? সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে একদল লোক লাল হয়ে যাচ্ছে। প্রার্থনা করো, এদেশের ভাইবোনদের এমন করে বঞ্চিত করে অনাহারে রেখে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে যারা লাভবান হতে চায় এবং হচ্ছে তাদের যেন আমরা কোনদিন

ক্ষমা না করি। দেশের, জাতির স্বার্থ ও প্রাণ বিপন্ন করে যারা আজ নিজেদের স্বার্থটা বড়ো চোখে দেখে, যারা লাভবান হতে কার্পণ্য করে না, তারা দেশ ও জাতির শত্রু। দেশের ও জাতির এই দেশীয় শত্রুর শক্তির স্বার্থের ও লাভের খর্ব্বতা ঘটাতে হবে আমাদের। আমরা মনে প্রাণে যেন তাদের ঘৃণা করি—দেশীয় শত্রু বিনাশ করার শক্তি অর্জ্জন আমরা যেন করতে পারি—এই হোক আমাদের এমাসের প্রার্থনা।

(আশ্বিন ১৩৫০)

তোমরাও পার

তোমরা ভাবো তোমরা ছোট, শক্তি তোমাদের অল্প। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দুর্যোগে তোমরাও যে নানা কাজ করতে পারো তা কি ভেবে দেখেছ? চেষ্টা করে দেখেছ কোন দিন? মনে করো তোমাদের পাড়ার কথা, পল্লীর কথা—সেখানে নিরন্নের দল প্রতিনিয়ত হানা দিচ্ছে,—'খেতে দাও, খেতে দাও, প্রাণ বাঁচাও'। ছোট্ট চোখ তোমাদের জলে ভরে আসে না? ভাবো তোমাদের কাছে ভাঁড়ারের তো চাবি নেই বা টাকা কড়ি নেই, যা দিয়ে তোমরা এদের একটু খেতে দেবে। কিন্তু ভেবে দেখো তোমরাও পারো এদের খেতে দিতে, এদের দুঃখের জীবনে একটু স্বস্তি শান্তি দিতে কেমন করে? সেকথাই বলি শোন ; ভাতের ফেন ফেলে দাও, প্রায় সবাই দেয়। তোমরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রত্যেক বাড়ী থেকে ফেন যোগাড় করে এক জায়গায় এনে রাখো, কেউ আনো পাতি লেবু, নুন, যাদের অবস্থা ভালো তারা দিক কিছু ভাত (ফেনের সঙ্গে), তরিতরকারী, পয়সা- কড়ি—এমন করে প্রত্যেকের কাছ থেকে যে যে-টুকু পারো তা নিয়ে একত্র করে তোমরা এদের সাময়িকভাবে সেবা সাহায্য করতে পাবো। তোমরাও পারো তোমাদের প্রতিদিনের খরচ থেকে কিছু বাঁচিয়ে এদেব সাহায্য করতে। যাদের আছে অথচ এই দুঃসময়ে দান করার প্রবৃত্তি নেই, তোমরাও পারো তাদের দান করার শুভ ইচ্ছাকে জাগিয়ে দিতে। ছোট বলে, শক্তিহীন বলে, এ দুঃসময়ে তোমরা চুপ করে বসে থেকো না, যে যা পারো করো।

(আশ্বিন ১৩৫০)

এ মাসের প্রার্থনা

আবার ফিরে এলো শারদীয়া আকাশ, ফিরে এলো পূজা, উৎসব, লগ্ন। এ মাসে এমন দিনে, কি হবে আমাদের প্রার্থনা? সমস্ত বাংলার ওপর দিয়ে অভিশাপের ঝড় বয়ে চলেছে। যারা ছিল স্বল্পে তুষ্ট, জীবনের সাধারণ প্রয়োজনগুলো [মেটানোর জন্য] যারা দেবতাকে আর গাঁয়ের জমিদারকে দু হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতো, আজ তারা নিজেদের কোন ভুল ত্রুটির বা অপরাধের জন্য নয়—গ্রামের মায়া ছেড়ে শহরের পথে পথে মরছে। এদের সংসার আজ শতধা বিচ্ছিন্ন। বাংলার গ্রাম, বাংলার মাঠ আজ শূন্য ; মাঝে মাঝে অস্থিচর্মসার দেহধারীদের দেখা মেলে। মন্বন্তরের পূর্ব্বাভাস এ যে। চারিদিকের ঔদাসীন্য ও অবিবেচনা ক্রমশঃ সমগ্র বাংলা দেশকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলেছে।

এমন দিনে কি হবে আমাদের প্রার্থনা?

প্রতি বৎসরের মতো পূজামণ্ডপে দেবী দুর্গা আসবেন, তেমনি করে ঢাকঢোল কাঁসর ঘণ্টা

বাজবে ও পূজারতি হবে। কিন্তু সমস্ত পূজা আরাধনা ও আনন্দ উৎসবের মাঝে মন ও অন্তর তোমাদের কি যেন একটা অসহ অভাব বোধ করবে। মনে হবে সমস্ত আয়োজন হলেও কোথায় যেন একটু ত্রুটি রয়ে গেছে! দেশ যখন অনাহারে আর অব্যবস্থায় মরছে তখন কি আনন্দ উৎসবে প্রাণে সাড়া জাগে?

দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করো—দেশের যারা প্রাণ, দেশের যারা মর্ম্মস্থল, তাদের বাঁচাও। প্রার্থনা করো—এদের যেন আমরা ভালবাসা দিয়ে, আশা দিয়ে, কিশোর হস্তের সেবা সাহায্য দিয়ে বাঁচাতে পারি। ওরা বাঁচলে আমরা তবে বাঁচবো। বাংলা দেশের দুঃখের দিন যেন দেবী মহামায়ার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। কায়মনোবাক্যে এ প্রার্থনা করো।

(কার্তিক ১৩৫০)

মাসিক বসুমতী

সাময়িক প্রসঙ্গ

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি

বাংলায় চাউলের মূল্য ক্রমশঃ অতিশয় হইতেছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সাধারণ মোটা চাউলের মণও আট টাকায় উঠিয়াছে। এখন মফঃস্বলের কোন কোন স্থলে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। নিখিল বাঙ্গালায় ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার লোকের বাস। তন্মধ্যে গোধূম-ভোজীর সংখ্যা অতি অল্প। গোধূম অর্থাৎ আটা বা ময়দা এ প্রদেশের সাধারণ লোকের আহার্য নহে ; সাধারণতঃ উহা তাহাদের সহ্য হয় না। শহর অঞ্চলের কতকগুলি লোক একবেলা ময়দা খায়, তাহাদের সংখ্যাও অতি অল্প। ইহা ভিন্ন, ভিন্ন প্রদেশ এবং বিদেশ হইতে অনেক লোক বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা ময়দা ও চাউল উভয়ই ভোজন করে। ভারতের পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত অনেক লোকই বাঙ্গালায় আসিয়া কিছু ভাত ও কিছু রুটি খায়। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া যদি ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার লোক সকলেই চাউল ব্যবহার করে না—এইরূপ ধরা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালায় অবশিষ্ট ৬ কোটি লোক চাউল খায়, ইহা ধরিতে হয়। সুতরাং বাঙ্গালার পক্ষে বার্ষিক অন্ততঃ ৩০ কোটি মণ চাউলের প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন গৃহপালিত পশুর জন্যও চাউল ব্যবহার করিতে হয়। এখন বাঙ্গালায় ৩০ হইতে ৩৫ কোটি মণ চাউল উৎপন্ন হয় কি? তাহা হইতেই পারে না। রেঙ্গুনের চাউল কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলকাতা হইতেই আমদানী করা হইত। এখন রেঙ্গুনের চাউল পাওয়া যায় না—তাই দেশী চাউল কলিকাতা হইতে আমদানী করা হইতেছে। ইহাতে চাউলের দর চড়িতেছে। যাহাদের আয় অল্প, তাহারা এক বেলা খাইতেছে। আমাদের সন্দেহ হয় যে, মফঃস্বলে কতকগুলি মহাজন সম্ভবতঃ চাউল 'বাঁধি' করিয়া অর্থাৎ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। গত বৎসর ত ধান কম জন্মে নাই। আর যদি কিছু কমই জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও এখন ত ধানের এত অভাব হইবার কথা নহে। যাহারা আরও অধিক মূল্যে চাউল বেচিবে বলিয়া ধান 'বাঁধি' করিয়া রাখিয়াছে,—চাউলের মূল্য আর বৃদ্ধি পাইবে না জানিলে সেই ধান তাহারা বিক্রয় করিবে। অন্য দেশ এবং প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ভারতের সামন্ত রাজ্যগুলিও তাহাদের এলাকার বাহিরে চাউল রপ্তানী বন্ধ না করিলেও কতকটা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রকাশ, সুন্দরবন অঞ্চলে বহু ধান্য বিভিন্ন গুদামে সঞ্চিত ও মরাইজাত হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু নৌকাদি যানের অভাবে তাহা কলিকাতায় আমদানী করিবার উপায় নাই ; ভবিষ্যতে শত্রুপক্ষের

সুবিধা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সরকার সুন্দরবন অঞ্চল হইতে মহাজনী নৌকার গমনাগন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এদিকে পেট্রোলের অভাবে লরীর যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়, বিশেষতঃ রেলে মালগাড়ীর অভাবে পূর্ব্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ প্রভৃতি ধান্যোৎপাদক জিলা হইতে ধান্য চাউলের আমদানীও রহিত করিতে হইয়াছে। তাহার উপর বিভিন্ন স্থানের চাউলের আড়ত হইতে যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে চাউল রপ্তানী হইতেছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মের চাউল বাঙ্গালার ভরসার স্থল ছিল, তাহার অভাবেই চাউলের মূল্য অসম্ভব বর্দ্ধিত হইতেছে।

তদ্ভিন্ন, বাঙ্গালা সরকার চাউলের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত কেবল মোটা ও মাঝারি চাউলের সম্বন্ধ, সরু চাউলের মূল্য নির্দ্ধারিত হয নাই ; এবং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহতে চাউলের প্রকার (quality) সম্বন্ধে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং চাউল ব্যবসায়ীরা এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অধিক লাভবান হইলে তাহা নিবারণেরও কোন উপায় নাই। এই মূল্যনির্দ্ধারণে বাঙ্গালা সরকারের অভিজ্ঞতা শোচনীয়। ইহাব প্রতিকার প্রার্থনীয়। চাউলের মূল্য আর বাড়িতে দেওয়া কোনক্রমে সঙ্গত হইবে না।

(আষাঢ় ১৩৪৯)

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালায় সত্যসত্যই এবাব দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রকাশ, বাঙ্গালায় বহু স্থানে লোক অনাহারে মরিতেছে। চাউলের মূল্য মফঃস্বলে দিন দিন অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। কাজেই বহু লোক অন্নাভাবে কদন্নভোজন করিয়া উদরাময় প্রভৃতি রোগে মরিতেছে। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয় প্রধান সচিব মৌলভী ফজলুল হক ২১শে বৈশাখ দেশপ্রিয় পার্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন—"চাষীরা ক্ষুধার তাড়নায় বীজ ধান খাইয়া ফেলিয়াছে, ঘাস খাইয়া মরিতেছে। 'অন্ন চাই অন্ন চাই' রবে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। যে সকল জিলায় অধিক পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, সেই সকল জিলার দুর্গতি বর্ণনাতীত। কোথাও কোথাও লোক মরা গরু, ভেড়া প্রভৃতি খাইযা কোন প্রকারে জঠরের তীব্র জ্বালার উপশান্তি করিতেছে। ইহা অপেক্ষা ভীষণ অবস্থা আর কি হইতে পারে।" সার জন হার্ব্বাট নিজ প্রভুত্ব বলে এই সময়ে লীগ দলকে সচিবত্বের গদী দিলেন, কিন্তু এখন যদি সচিব-সঙ্ঘ এই দারুণ সমস্যার সমাধান করিতে না পারেন, তা হইলে তাঁহাদের ত আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না। অন্ন সমস্যার সমাধানে অসমর্থ বলিয়া যাঁহারা ভূতপূর্ব্ব সচিব-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বারবার আস্থাহীনতার প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যে এখন আপনাদের কথায় আপনারাই দোষী হইতেছেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের সচিব মিষ্টার সুবাবর্দ্দী সেদিন ডক্টর নলিনাক্ষ্য সান্ন্যালের উক্তির প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, "কৃষকগণ, বিশেষতঃ সম্পন্ন কৃষকগণ—বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের শস্য বাজারে বিক্রয় করিতেছে না। উহার কতকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, তাহারা দেখিতেছে যে, খাদ্যশস্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।" একথা কিছু সত্য হইতেও পারে। কিন্তু এইরূপ চাষী কযজন? এবং তাঁহারা কত চাউলই বা গোপন করিয়া রাখিয়াছে? আমাদের মনে হয়, চাষীদিগের হাতে এখন আর এত অধিক ধান নাই, যাহা বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিলে চাউলের মূল্য বিশেষভাবে কমিয়া যাইবে। মিষ্টার সুরাবর্দ্দী আরও বলিয়াছেন

যে, তিনি যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ধানের মূল্য হ্রাস পাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। এরূপ অবস্থায় এ সময়ে ঐ সকল কৃষকদের ধান বিক্রয়ার্থে বাজারে উপস্থিত করা উচিত। আমরাও সেকথা স্বীকার করি। কিন্তু যদি তিনি প্রভূত পরিমাণে ধান বা চাউল বাঙ্গালায় উপস্থিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালায় অচিরে উৎকট দুর্ভিক্ষের নরকঙ্কালচিহ্নিত বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে। সত্য বটে, বাঙ্গালার অনেক স্থানে সরকার নৌকা চালনায় বাধা অপসারিত করিয়াছেন, কিন্তু এখন অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে নৌকাযোগে আর ধান্য প্রেরণ নিরাপদ নহে। বহুস্থানে নৌকা হইতে ধান্য ও চাউল লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ১৬ই বৈশাখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে বাঙ্গালায় নানাস্থান হইতে চারিশতেরও অধিক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। খাদ্যশস্যের অভাবের জন্যই এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, এত ডাকাতি ত পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। ইহা ভিন্ন চাউল চুরি, তরকারী চুরি, এমন কি ভাত চুরি পর্যন্ত হইতেছে। সরকার শেষে নৌকা সেই ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু সময় থাকিতে দেন নাই। সম্মুখে এখন ঘোর দুঃসময়। সচিব মণ্ডলের এখন সর্ব্বাগ্রে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত ; নতুবা এবারকারের এই দুর্ভিক্ষের ভীষণত্ব ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরকে ছাপাইয়া যাইবে।

(বৈশাখ ১৩৫০)

শুধুই কি গর্জ্জন?

বর্ত্তমান সচিব সঙ্ঘের সাধারণ সরবরাহ বিভাগের সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ডাক দিয়া বলিতেছেন যে, বাঙ্গালায় যেরূপ উচ্চমূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে, তাহা হওয়া কোনমতেই সঙ্গত নহে। প্রধান সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন সচিবের তখত পাইয়াই বলিতেছেন, বাঙ্গালায় চাউল ত্রিশ হইতে চল্লিশ টাকা মণ বিকাইতেছে, ইহা সত্য ; কলিকাতার উপকণ্ঠে ২৪ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে মোটা চাউল ত্রিশ টাকা মণ দরেও পাওয়া যাইতেছে না। বাজারে চাউল অল্পই আছে। ইতোমধ্যেই লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে—শুনা যাইতেছে। অতএব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী—যথার্থই যদি উপকার করিতে চান—তবে ভাঁওতা ছাড়িয়া সত্বর প্রতিকারের সুব্যবস্থা করুন। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। উহার ফল অত্যন্ত ভীষণ হইবে।

দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ—বাঙ্গালায় চাউলের দর মণ ৩২ টাকা ৭ আনা ; আর পূর্ণিয়ায় (বিহার) ১৩ টাকা, বেরিলীতে ১০ টাকা ৪ আনা ৯ পাই, রায়পুরে ৮ টাকা ৬ আনা; বেজাওয়াদায়—৭ টাকা ১১ আনা ১ পাই, কটকে ৬ টাকা ৮ আনা. সিন্ধুতে ৬ টাকা ৪ আনা। এই বৈষম্যের কৈফিয়ৎ সত্বর প্রয়োজন।

(বৈশাখ ১৩৫০)

খাদ্য সমস্যা

বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা দিন দিন তীব্র ও জটিল হইয়া উঠিতেছে। প্রাক্তন সচিব সঙ্ঘের দোষ দেখাইয়া বা বর্ত্তমান সচিব সঙ্ঘকে দায়ী করিয়া সে সমস্যা সমাধানের আশা নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা রক্ষা পাইতে পারি, তাহাই বিবেচ্য। প্রাক্তন সচিব সঙ্ঘ বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্যের অভাব স্বীকার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সচিব সঙ্ঘ যতদিন পারিয়াছেন,

সেই সত্য গোপন করিয়াছেন—বলিয়া আসিয়াছেন—অভাব নাই। তাঁহারা এই মতের সমর্থনে হিসাবও দাখিল করিয়াছেন! কিন্তু সেই হিসাব যে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহা অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন—অভাব আছে এবং লোককে অল্প আহার করিয়া—দুই বেলা না জুটিলে এক বেলা খাইয়া বাঁচিতে হইবে! অথচ কি পরিমাণ আহার ব্যতীত দেহ কর্ম্মক্ষম থাকে না. তাহা তাঁহারা বলিতেছেন না এবং সেই আহার যোগাইতে পারিতেছেন না। তাহার পর তাঁহারা পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিতেছেন, কোন পরীক্ষাই সফল হইতেছে না। তাহাদিগের কোন্ কোন্ পরীক্ষায় কিরূপ ফল ফলিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া কাজ করা প্রয়োজন। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। খাদ্যসচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন, ভারত সরকার বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই প্রদেশ চতুষ্টয়ে "পূর্ব্বাঞ্চল" গঠিত করিয়াও তাহাতে খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত করিয়া খাদ্য-শস্য ক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে বলায় তিনি ইস্পাহানি কোম্পানীকেই সে ভার দিয়াছেন। তিনি ইস্পাহানি কোম্পানীর যত প্রশংসাই কেন করুন না—তিনি যে এ বিষয়ে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালীন শাসক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে এমন অভিযোগও উপস্থাপিত হইয়াছিল যে, তাহারা দেশে সমস্ত শস্য লইয়া দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহারা যে মূল্যে শস্য কিনিয়াছিল, তাহার আট দশ দ্বাদশগুণ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাহারা ইচ্ছামত মূল্য দিয়া কৃষকদিগের সামান্য সঞ্চিত লইয়াছিল,—যে সকল নৌকায় অন্যান্য প্রদেশ হইতে চাউল আসিতেছিল, সে সকল ধরিয়া চাউল লইয়াছিল, কৃষকদিগকে বীজ ধানও বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিল। সমগ্র সরকারের বিরুদ্ধে আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শস্যের ব্যবসা করার অভিযোগ শুনা গিয়াছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাই এই সকল অপরাধে অপরাধী ছিলেন।

এবার যাহাতে তাহা হইতে না পারে, সেজন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে? সে বিষয়ে বাঙ্গালা সরকার লোককে কিছুই জানান নাই।

কেন্দ্রীয় সরকার আশা দিয়াছিলেন, তাহারা দুর্দ্দিনে বাঙ্গালাকে সাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবেন না। কিন্তু সে আশা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহা কে বলিবে? ব্যবস্থা পরিষদে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাঞ্চল" সৃষ্টির পূর্ব্বের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালাকে ৫ লক্ষ টন খাদ্য শস্য (চাউল গম প্রভৃতি) প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহার কি হইয়াছে? সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। তাহার পর বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালার জন্য ৫ কোটি টাকা খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন। তাহা কোথায় সঞ্চিত হইয়াছে? চাউলের যখন অভাব থাকে না, তখনই বাঙ্গালায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন গমের প্রয়োজন হয়, এখন চাউলের যেরূপ অভাব, তাহাতে অনেক অধিক গমের প্রয়োজন অনিবার্য্য। অথচ সমগ্র ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাতে মোট প্রায় ২ লক্ষ ২৪ হাজার টন গম দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার এক চতুর্থাংশের অধিক গম পাওয়া যায় নাই। তদ্ভিন্ন বাজরা প্রভৃতি এ বৎসর মোট ২ লক্ষ টন দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট ১০ হাজার টনের অধিক ঐ সকল শস্য লাভ বাঙ্গালার ভাগ্যে ঘটে নাই।

মিষ্টার সুরাবর্দ্দী যখন এই হিসাবের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই, তখন ইহাই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে কি অবস্থা অনিবার্য্য? চাউলের আশা কোথায়? বিহার যে বাঙ্গালাকে সাহায্য করিবে—এমন আশা নাই বলিলেই হয়। উড়িষ্যায় চাউল রপ্তানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং উড়িষ্যার খাদ্যসচিব বলিয়াছেন, উড়িষ্যায় (খাস উড়িষ্যায় ও উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্য সমূহে) বাহিরে দিবার মত যে চাউল ছিল, তাহা ইতোমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। উড়িষ্যা আপনি উপবাস করিয়া অন্ন যোগাইবে না। ইতঃপূর্ব্বেই উড়িষ্যার প্রধান সচিব এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছিলেন, বাঙ্গালার জন্য ক্রীত বলিয়া বাঙ্গালার সচিব যে চাউল ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন, তাহা উড়িষ্যা সরকার প্রয়োজনে আটক করিয়াছিলেন। এই চাউল কে বা কাহারা কিনিয়াছিল এবং কি দরে কিনিয়াছিল?

আসামের ব্যাপারটি রহস্যাচ্ছন্ন। কারণ, আসাম সরকার বাঙ্গালা হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল কিনিয়াছেন এবং তাহার মূল্য বাঙ্গালা সরকারের মারফত প্রদান করা (মেসার্স সওয়ালেস কোম্পানীকে?) হইয়াছে। আবার আসামের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—আসামের যে অংশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই অংশে যে ইস্পাহানি কোম্পানী চাউল কিনিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে আসামের প্রধান সচিবের এক পুত্র কোম্পানীর লোকের সহগামী ছিলেন। সুতরাং কি হইবে?

সম্প্রতি শ্রীযুত বিমল চন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুত হরিচরণ ঘোষ যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখান হইয়াছে, বাঙ্গালার অভাবের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রয়োজন, তাহা পাইবার আশা নাই।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, সে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আনিতে যত মালগাড়ী প্রয়োজন, তাহাও সরকার যোগাইতে পারেন না। জ্বালানী কয়লার আমদানী সম্পর্কেও আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি। মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন, তিনি "জ্ঞানপাপী" হইলেও অপরাধী নহেন। কারণ অভাবের কথা বলিলে লোক ভয় পাইবে ও সঞ্চয়ে আগ্রহ করিবে বলিয়া তিনি অভাবের কথা বলিতেই চাহেন নাই এবং তিনি যে সংবাদ লইয়াছিলেন ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সরবরাহের যে আশা পাইয়াছিলেন, তাহাতে অনায়াসে বলিতে পারিয়াছিলেন অভাব নাই বা থাকিবে না। বিশেষ খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি তে লোকে অল্প আহার করায় অভাব হ্রাস পাইতেছে!

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি তে লোকের পক্ষে আহারের পরিমাণ হ্রাস করা যদি স্বস্তির কারণ হয়, তবে ত অনাহারে বহু লোকের মৃত্যুও আকাঙিক্ষত হইতে পারে। একেই ত সার চার্লস এলিয়ট মন্তব্য করিয়াছেন—"আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আমাদিগের (ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষের) কৃষকদিগের অর্দ্ধাংশের ক্ষুধা বৎসরে কখন পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না"—তাহার উপর আবার যখন খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি তে বহু লোক সেই স্বল্পাহারও স্বল্প করিতে বাধ্য হয়, তখন কি জীবিতগণ জীবন্মৃতই হয় না?

যাহারা জীবিত হইলেও জীবন্মৃত, তাহাদিগের দ্বারা কি অধিক শস্যোৎপাদনের শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে? সমগ্র জাতির অবস্থা তাহাতে কিরূপ হয়?

কলিকাতায় কতকগুলি দোকানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল ও আটা পাওয়া যায় ;কিন্তু যে স্থানে মাত্র সাড়ে চার শত লোক প্রতিদিন তাহা পাইতে পারে, তথায় প্রতিদিন সহস্রাধিক ক্রেতার সমাবেশ হয়। যাহারা মূল্য দিয়া খাদ্যদ্রব্য কিনিতে আসে, তাহারা ভিখারীর অধম কষ্টভোগ

করিতে বাধ্য হয়—জনতার মৃত্যু সংবাদও যে পাওয়া যায় না তাহা নহে।

মফঃস্বলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার আভাস ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমান সচিব সঙ্ঘের সমর্থক দলের সদস্য খাঁন বাহাদুর আব্দুল ওয়াহেদ খাঁনের বিবৃতিতে পাওয়া যায়, যে বরিশাল বাঙ্গালার ধান্যের গোলা বলিয়া বিবেচিত হয়, তথায় তিনি কয়টি স্থানে স্বয়ং দেখিয়াছেন ঃ বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে বিক্রয়ার্থ পটুয়াখালিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। কেহ কেহ স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছে। লোক খাদ্যাভাবে অখাদ্য—এমন কি মৃত গরুর মাংসও আহার করিতেছে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একবার লোক মৃত গরুর মাংস খাইতেছে বলায় মিষ্টার সুরাবর্দ্দী তাঁহার নিন্দা করিয়াছিলেন। এবার তিনি খাঁন বাহাদুরের উক্তির প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।

আর যে দেশে সভ্য সরকার বিদ্যমান, সেই দেশে লোক স্ত্রী-কন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহার ফলে লোক—"পুত্র কন্যা বিক্রয় করিয়াছিল—শেষে কিনিবার লোক পাওয়া যাইত না।" ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের কথা নহে—ইহা সরকারী দপ্তরের বিবরণ হইতে ইংরেজ ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বিবরণ। সে বার সেই দুর্ভিক্ষের পর ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহাদিগের বিক্ষোভের বহির্বিকাশ দেখা যাইতেছে না। তাহার কারণ, সার উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর স্বভাবই এই যে, বাঙ্গালী নিঃশব্দে সহ্য করে—বিশেষ ঘরের কথা পরকে জানিতে দিতে চাহে না। সেইজন্য ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতেও গৃহস্থ-গৃহে মহিলারা তিলে তিলে মরিয়াছেন— তথাপি বাহির হইতে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" রাজস্ব প্রদানের অক্ষমতা হেতু বর্দ্ধমানের মহারাজ নিজগৃহে নজরবন্দী অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বীরভূমের মহারাজ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের বৃদ্ধ রাজা কারগার হইতে মুক্তি লাভের পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন—তিনি গৃহবিগ্রহ "মদনমোহন" বন্ধক দিয়াও আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সে-বার বাঙ্গালার আর্থিক জীবনে বিপ্লব ঘটিয়াছিল ;এবার সামাজিক জীবনেও কি তাহাই হইতেছে না?

প্রাক্তন সচিব সঙ্ঘের যখন অবসান ঘটে, তখনই প্রদেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু তখন চাউলের যে মূল্য ছিল, এখন তাহার তিন গুণেরও অধিক হইয়াছে। তখনই প্রধান সচিব খাজা সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছিলেন, দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ কিরূপে বাঁচিয়া আছে, তাহা ভগবানই জানেন! আজ যদি বলা হয়, তাহারা অনাহারে মরিতেছে, তবে কি তাহা অত্যুক্তি হইবে?

প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সচিব সঙ্ঘের পরস্পরকে দোষ দিলে যে অবস্থার উন্নতি হইবে, তাহা নহে। আর ওদিকে ভারতবাসীর সহিত সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতিহীন ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী বিলাতের লোককে বুঝাইতেছেন—কৃষকগণ শস্য বাজারে ছাড়িতে অসম্মত হওয়ায় ও লোকের আয়বৃদ্ধিতে অধিক আহারে ভারতে খাদ্য সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অথচ তিনিই কিছুদিন পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হওয়ায় বাঙ্গালার অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়াছে। তাঁহার কোন্ কথায় লোক বিশ্বাস স্থাপন করিবে? আমরা পূর্ব্বেই সার চার্লস এলিয়টের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। সার উইলিয়ামস হাণ্টারও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তাহাতেই বুঝিতে

পারা যায়—কৃষকের ঘরে সঞ্চয় থাকে না। আর আমরা দেখাইতে পারি, ভারতে লোকের আয় ব্যয়ের তুলনায় বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাসই পাইয়াছে। তিনি বিলাতের লোককে যাহাই কেন বুঝাইবার চেষ্টা করুন না—অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা দেশের লোক বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছে।

তিনি কি এ বিষয়ে সরকারের (বৃটিশ সরকারেরও) দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন?

বাঙ্গালা সরকারের খাদ্যসচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন, লোক যাহাতে আতঙ্কিত না হয়, সেইজন্য তিনি অভাবের বিষয় আলোচনা করিতে চাহেন নাই। কিন্তু লোক কি অনাহারেও অভাব বুঝিতে পারিতেছেন না?

এ দেশে যে সকল য়ুরোপীয় শোষণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপ সহানুভূতিহীন তাহার পরিচয় ২১শে আষাঢ় ব্যবস্থা পরিষদে পাওয়া গিয়াছে। সেদিন যখন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "সরকারকে বাঙ্গালার জন্য বৃটিশ সরকারের ও ভারত সরকারের নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিতেই হইবে"—তখন য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠেন—"টোজো (অর্থাৎ জাপান) তোমার বন্ধু।" বিরক্ত হইয়া শ্যামাপ্রসাদবাবু বলেন,—"য়ুরোপীয় দিগের নিকট হইতে আমরা ঐরূপ উত্তরই পাইব, জানি। যদি য়ুরোপীয়দিগের সহিত ভারতের ১ শত ৭০ বৎসরের সম্বন্ধের পর বাঙ্গালাকে এইভাবে অনাহারে মরিতে হয়, তবে যে অন্ততঃ য়ুরোপীয়রা আমাদিগের বন্ধু নহে—তাহাতে সন্দেহ নাই।" য়ুরোপীয় সদস্যটির নিষ্ঠুর উক্তির নানারূপ ব্যাখ্যাও করা যায়।

যখন বাঙ্গালার এই অবস্থা, তখনও বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বীকার করিয়া লোককে—দুর্ভিক্ষকালীন—খাদ্য সরবরাহের ভার গ্রহণ করিলেন না। অথচ বাঙ্গালার গভর্নরের অনুমোদনে ১৩ জন সচিব ও ১৩ জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ও ৪ জন অতিরিক্ত "হুইপ" সরকারের ব্যয় বর্দ্ধিত করিয়া—"অননুমোদিত ভাবে" বেতন গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। ইহা যে গভর্নরের ও সচিবদিগের দেশের লোকের দুর্দ্দশায় সহানুভূতির পরিচয় নহে, তাহা বলিতে দ্বিধাবোধের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বাঙ্গালায় খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির যে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হইয়াছে, তাহার পরিচয়ও আমরা পাইতেছি না।

কাজেই ভবিষ্যতের অন্ধকারে আশার ক্ষীণ আলোকও প্রতিভাত হইতেছে না।

(আষাঢ় ১৩৫০)

খাদ্য-সমস্যা*

বাঙ্গালায় খাদ্য-সমস্যার সমাধান হওয়া ত পরের কথা, সে সমস্যা দিন দিন তীব্র হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা কলিকাতা কর্পোরেশনে বিবৃত একটি ঘটনায় বুঝা যায়। হিন্দু সৎকার সমিতি এক দিনে কলিকাতার রাজপথ হইতে ২৭টি শব শ্মশানে লইয়াছেন। ইহার সহিত যদি মুসলমান সৎকার সমিতির হিসাব যোগ করা যায়, তবে দেখা যাইবে—যে কলিকাতা বাঙ্গালার রাজধানী—যে কলিকাতায় বাঙ্গালার গভর্ণর বিরাজিত—সেই কলিকাতার রাজপথে যদি প্রতিদিন অনাহারে এইরূপ লোক মরিয়া পড়িয়া থাকে, তবে মফঃস্বলে অবস্থা কিরূপ হইয়াছে,

* লেখকের নামবিহীন বিশেষ প্রবন্ধ। 'সাময়িক প্রসঙ্গ'-র অন্তর্ভুক্ত নয়।

তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, কলিকাতায় লোককে চাউল ও গম দিবার—যেমনই কেন হউক না—ব্যবস্থা আছে জানিয়া মফঃস্বল হইতে লোক কলিকাতায় আসিতেছে—অনেকে যে পথেই মরিতেছে, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাঙ্গালা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ সচিব—মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী সচিব হইয়া বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব যদি থাকে, তবে তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে—থাকিলে সে অভাব অনায়াসে অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানীর দ্বারা পূর্ণ করা যাইবে। তাহার পর তাঁহার সুর ক্রমেই—অনাহার ক্লিষ্টের কণ্ঠস্বরের মত—ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—পাছে অভাবের উল্লেখ করিলে লোক ভয় পায়, সেই জন্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—অভাব নাই। অর্থাৎ তিনি মিথ্যা কথা বলিলেও তাহা খাঁটি মিথ্যা নহে!

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হয় নাই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য সার আজিজুল হক যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর উক্তির সহিত 'তুল্যমূল্য।" তিনি বলিয়াছেন—যখন অন্যান্য প্রদেশের আপত্তিতে খাদ্য-শস্যে অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থা বাতিল করিতেই হইল তখনও তিনি হাল ছাড়িলেন না। তিনি ও যান-সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল সব ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে লাহোরে গমন করিলেন। তথায় যখন তাঁহারা সব বাধা অতিক্রম করিবার উপায় করিতে পারিলেন—ঠিক সেই সময়ে—বাঙ্গালার এমনই দুরদৃষ্ট যে—দামোদরের বন্যায় রেলপথ ভাঙ্গিল। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টার ত্রুটি হইল না। তাঁহারা স্থলপথ না পাইয়া জলপথ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন—জাহাজে বাঙ্গালায় গম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। দুইখানি জাহাজে গম বোঝাই করাও হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ দুইখানিরই কল বিগড়াইয়া গেল: এখনও জাহাজের কল সংস্কৃত হইতেছে। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কেহ নিবারণ করিতে পারে না কিন্তু যে জাহাজে মাল বোঝাই করিবামাত্র তাহার কল অচল হয়, সে জাহাজ কোথা হইতে কে সংগ্রহ করিয়াছিল? এদিকে যে বাঙ্গালায় লক্ষ লক্ষ লোকের দেহের কল অচল হইতেছে—তাহার জন্য কি কেহ দায়ী নহে? মানুষের কাছে দায়িত্ব হইতে— কৈফিয়ৎ দিয়া—অব্যাহতি লাভ করা যায় বটে, কিন্তু ভগবানের কাছেও কি তাহা হইতে পারে?

সার আজিজুল হক যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে দামোদরে বন্যার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গম পাঠাইবার আবশ্যক ব্যবস্থাও হয় নাই?

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এবার বাঙ্গালার অবস্থার সহিত "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" সময়ে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন—এ যেন পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন হইতেছে।

যুদ্ধের জন্যই যে বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা প্রধানতঃ ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ঃ—

(১) যুদ্ধের জন্য (ব্রহ্ম অধিকারচ্যুত হইবারও পূর্ব্বে) ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছিল—এখন তাহা আমদানী হইতেই পারে না।

(২) ব্রহ্ম জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে বহু নরনারী তথা হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে—অনেকে বাঙ্গালার পথে মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে গিয়াছে।

(৩) সামরিক প্রয়োজনে বাঙ্গালায় বহু সৈন্য রাখিতে হইয়াছে।

এই সকল কারণেও যে বাঙ্গালা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা বলা বাহুল্য। কেন্দ্রীয় সরকার সে দায়িত্ব-বিষয়ে কি অবহিত হইয়াছেন?

বাঙ্গালায় যখন চাউলের অভাব, তখনও যে বাঙ্গালা হইতে চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিদেশ হইতে গম আনাইবার কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। মধ্যে যে বলা হইয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়া হইতে কয় জাহাজ গম ভারতে আমদানী হইয়াছে, তাহা সত্য হইলেও অর্দ্ধ সত্য। কারণ, ঐ গম ভারতের জন্য উদ্দিষ্ট ছিল না—ইরাকে বা ইরাণে—অথবা উভয় দেশে যাইতেছিল। সেই সময় ভারতে খাদ্যদ্রব্যের অভাব অত্যন্ত অধিক হওয়ায় (হয়ত বা সৈনিকদিগের প্রয়োজনে) জাহাজ কয়খানি ভারতবর্ষে আনিয়া গম লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে আবার গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঋণ শোধ করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে যদি ইরাকে বা ইরাণে গম পাঠান সম্ভব হয়, তবে ভারতেই বা হয় না কেন ; সে বিষয়ে কি আবশ্যক চেষ্টা হইয়াছে বা হইতেছে?

বাঙ্গালার যে খাদ্য-সচিব লোককে অভয় দিয়াছিলেন, চাউলের অভাব হইবে না ; তিনিই আজ তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—ভাত পাইবার সম্ভাবনা অল্প—সুতরাং ফেন খাইতে থাক। তিনি সরকারী সদাব্রত খুলিবার পূর্ব্বে সদাশয় ব্যক্তিদিগকে সদাব্রত খুলিতে আহ্বান করিতেছেন। দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন না। তিনি যে ফেনের কথা বলিতেছেন, তাহারও "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" ঠিক করিয়া দিবেন এবং কেহ বিতরণ করিতে চাহিলে সরকারী খানাঘরে তাহা কিনিতে পাইবেন। তিনি যেমন ভাবে বাঙ্গালা সরকারের পক্ষে চাউল কিনিবার ঠিকা মসলেম লীগের সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন মেসার্স ইস্পাহানিকে দিয়াছিলেন, তেমনই কি এই ফেন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিবার ঠিকাও কাহাকেও দিয়াছেন বা দিতেছেন?

তিনি তাঁহার ঐ ফেনের উপকরণের পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

"কলে পিষ্ট বা হাতে চূর্ণ করা জওয়ার, বাজরা, গম, চীনাবাদাম, নানারূপ ডাল এবং বহু পরিমাণে কুমড়া বা মিঠা আলু প্রভৃতির সঙ্গে ছিটাফোঁটা চাউল ফেলিয়া তাহার সঙ্গে পেঁয়াজ ও হলুদ—অবশ্য একটু লবণও দিয়া—সিদ্ধ করিলেই এই ফেন হইবে। তাহা কেবল বলকারকই নহে—পরন্তু মুখরোচকও বটে।"

ঐ ফেন ২ ছটাক— অভাবে দেড় ছটাক আত্মস্থ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

অবশ্য এ বিষয়ে পরীক্ষা সচিবরা আপনারা করিয়াছেন কি না এবং যে গভর্ণর সার জন হার্ব্বাট খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি তে প্রাক্তন সচিব সঙঘকে পদত্যাগ করাইয়াছিলেন তাঁহাকেও পরীক্ষা করিতে বলিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না।

তবে কলিকাতায় একটি সদাব্রত উদ্বোধন উপলক্ষে জাষ্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত অনেকেই একমত হইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের শোচনীয় ও লজ্জাজনক ভুলের জন্যই আজ এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

এই সকল ভুলের জন্যই আজ এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

এই সকল ভুলের জন্য দায়ী কে?

ভুল যে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন, প্রাদেশিক সরকারও তেমনই করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার পরিচয় আমরা দিয়াছি। কিন্তু ইহার প্রতীকারের উপায় কি?

আজও যে বাঙ্গালার গভর্ণর হইতে বাঙ্গালার সচিবরা কেহ কোন সাহায্যদান কেন্দ্রে তাঁহাদিগের বেতনের অনুপাতে সাহায্য দিয়াছেন, এমন কথা বাঙ্গালার লোক শুনে নাই।

যে দিন কেন্দ্রী[য়] পরিষদে খাদ্য-দ্রব্য সম্বন্ধীয় আলোচনা শেষ হয়, সেই দিনই ঘোষিত হয়, সার অজিজুল হক খাদ্য-সদস্যের পদ ত্যাগ করিবেন এবং পরদিন হইতেই সার জে, পি, শ্রীবাস্তব সেই পদের ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এ দেশে সরকারী কার্যে প্রায়ই দেখা যায়—হাকিম যাইলেও হুকুম বহাল থাকে। সেই জন্যই আজ আমরা তাঁহার উক্তির আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। সার আজিজুল বলিয়াছিলেন ঃ—

বোধ হয় কোন প্রদেশই দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। কেবল বাঙ্গলার দোষ নহে।

অবশ্য তাঁহার এই উক্তিতে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা সেই "দশে মিলি করি কার্য" হইতেছে। কিন্তু ইহাতে সকল প্রদেশের সরকারেরই যে ত্রুটি স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্য প্রদেশ যাহাই কেন বলুন না—তাহা সরকারের ব্যবস্থার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে। প্রদেশে খাদ্য-শস্যের অবস্থা কিরূপ, তাহাও না জানা যে কোন সরকারের পক্ষে লজ্জার কথা এবং যে ব্যবস্থায় তাহা হয় তাহার প্রতীকার প্রয়োজন। সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কি করিয়াছেন?

কেন্দ্রী[য়] সরকার বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই প্রদেশ চতুষ্টয় লইয়া "পূর্ব্বাঞ্চল" সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যয়বহুল নূতন পদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা এই "পূর্ব্বাঞ্চলে" খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথম কার্য্যের সমর্থনে সার আজিজুল বলেন, বাঙ্গালার অবস্থা প্রতীকারাতীত হইয়া উঠিতেছিল দেখিয়া উপায়ান্তর না থাকায় সরকারকে ঐ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

যদি তাহাই হয়, তবে কেন্দ্রী[য়] সরকার কি জন্য তাহা বজায় রাখিলেন না?

সার আজিজুল যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ত উহা বহাল রাখার প্রয়োজনই প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলিয়াছেন, ঐ অবস্থায় অভাবগ্রস্ত প্রদেশে খাদ্য-শস্য আমদানীতে আসন্ন বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ সম্ভব হইয়াছিল। যদি সে ব্যবস্থা রক্ষা করা যাইত, তবে কোন কোন স্থানে খাদ্য-শস্যের মূল্য কিছু বর্দ্ধিত হইলেও মূল্যের সমতা রক্ষিত হইত ও মূল্য, মোটের উপর হ্রাস পাইত। কিন্তু, অবাধ বাণিজ্যনীতি ঘোষিত হইবার পর হইতেই তাহার প্রচলন-পথে নানারূপ বাধা স্থাপিত হইতে থাকে— যে সকল মাল ক্রীত হইয়াছিল, সে সকল সরকারের জন্য গৃহীত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রীত মালের কতকাংশ অল্প মূল্যে দিতে ক্রেতাকে বাধ্য করা হয়; মজুদদারদিগকে ঝাঁপ বন্ধ করিতে আদেশ করা হয়, ব্যবসায়ীদিগকে মাল বিক্রয় করিতে, ষ্টেশন-মাষ্টারদিগকে মালগাড়ী দিতে ও গো-যানের চালকদিগকে মাল বহন করিতে নিষেধ করা হয়; ব্যবসায়ী এজেন্টদিগকে গ্রেপ্তার ও মামলাসোপর্দ্দ করা হয়—ইত্যাদি। কাযেই, অবাধ-বাণিজ্যনীতি রক্ষিত হয় নাই। একটি প্রদেশে সরকার গত জানুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত সস্তায় চাউল না কিনিলেও নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলেই আপনাদিগের প্রদেশের জন্য চড়া দরে চাউল কিনিয়া সঞ্চয় করিতে থাকেন।

সার আজিজুল কোন্ প্রদেশে এইরূপ হইয়াছে, তাহা বলেন নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালার খাদ্য-

সচিব মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী পূর্ব্বেই উড়িষ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে লোকের বিষয় অনুমান করিতে বিলম্ব হইবে না।

কিন্তু অবস্থা যখন এইরূপ—ভারতের এক প্রদেশ যখন অন্য প্রদেশের দুর্দ্দশায় এত উদাসীন তখন কি—

(১) কেন্দ্রী[য়] সরকার তাঁহাদিগের চরম দায়িত্ব বিবেচনা করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারেন না? তাঁহারা যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কথা উত্থাপিত করেন, তবে কি আমরা বলিতে পারি না—বহু ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে? ভারত সরকারই কি বাঙ্গালা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন?

(২) বাঙ্গালা সরকার কি—

(ক)* কেন্দ্রী[য়] সরকারকে যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত সৈনিক প্রভৃতির আহার্য্য যোগাইতে বলিয়াছেন?

(৩) উড়িষ্যা, বিহার বা আসাম বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় বাণিজ্য করিতে চাহিলে—বাঙ্গালীর শবের উপর আপনারা প্রাচুর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে সেই সকল প্রদেশের লোককে—সঙ্কটকালে—বাঙ্গালা হইতে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

উড়িষ্যায় ও আসামে যে সচিব সঙ্ঘ রহিয়াছে, তাহা সরকারের অনাগ্রহ ও সাহায্য ব্যতীত এক দিনও থাকিতে পারে না। সেই সকল সচিব সঙ্ঘ যখন বাঙ্গালার, অন্য প্রদেশের, দুর্দ্দশার উপর আমাদিগের স্থায়িত্ব রক্ষিত করিতে চাহেন, তখনও কি কেন্দ্রীয় সরকার অনুগ্রহ প্রত্যাহার করা প্রয়োজন ও সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। বিহারে ত তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনও নাই। তথাপি যদি সে প্রদেশ বাঙ্গালার দুর্দ্দিনে বাঙ্গালাকে আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল দিতে অস্বীকার করে, তবে কি সে জন্য গভর্ণরকেই দায়ী করিতে হয় না?

সার আজিজুল হক বলিয়াছেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য সম্বন্ধে অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করিতেছেন। তাহা কি সার জে, পি, শ্রীবাস্তব সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিবেন? আর যদি তাহা হয়, তবে যত দিনে সে ব্যবস্থা হইবে, ততদিনে বাঙ্গালার কত লোক অনাহারে মরিয়া খাদ্য-সমাধান-পথ পরিষ্কৃত করিবে?

গত ২৭শে শ্রাবণ কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল, ইণ্ডিয়ান, মুসলিম ও মাড়বারী বণিক্‌সঙ্ঘ-চতুষ্টয় কেন্দ্রী[য়] সরকারকে তার করিয়াছিলেন—তাঁহারা শুনিয়াছেন, সম্প্রতি দেশ হইতে বহু পরিমাণ চাউল দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ করা হইয়াছে। বণিক্‌সঙ্ঘ-চতুষ্টয় ইহাতে আপত্তি করিয়া জানাইয়াছেন, যে সময় এ দেশে চাউলের একান্ত অভাব এবং সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—ভারতবর্ষের কোন স্থান হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী করা হইবে না, সেই সময় এই রপ্তানী বিশেষ অসঙ্গত। আর যে দক্ষিণ আফ্রিকা আজ তথায় ভারতীয়দিগকে মনুষ্যের অযোগ্য অপমানে লাঞ্ছিত করিতেছে—সেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাউল দিয়া সাহায্য করা ভারতবাসীর জাতীয় আত্মসম্মান-জ্ঞানে দুরন্ত আঘাত করা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবাসীর সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহা ভারত সরকারেরও অবিদিত থাকিবার কথা নহে। এক বার দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার খনিতে

* (ক) ব্যতিত আর কোনো উপবিভাগ নেই।

ভারতীয় শ্রমিকদিগের প্রতি কুব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—সে দেশ হইতে যে কয়লা আসিবে, তাহা বেত্রাহত ভারতবাসীর রক্তে সিক্ত।

এখন যদি সেই দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্যার্থ ভারতবর্ষের নিরন্ন নরনারীর মুখের গ্রাস প্রেরণ করা হয়, তবে আর বলিবার কি থাকিতে পারে?

কেন্দ্রী[য়] সরকার চেম্বার অব কমার্স সমূহের কথার আংশিক প্রতিবাদ ২১শে শ্রাবণ করিয়াছেন। তাঁহারা এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন—দক্ষিণ আফ্রিকায় এ দেশ হইতে চাউল রপ্তানী হইয়াছে এ কথা সত্য, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প—বর্ত্তমান বৎসরে মাত্র ৭ শত ২৭ টন—কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়াছে—আর সে-ও ভারতীয় নাবিকদিগের জন্য। যদি তাহাই হয় তবে কি আমরা বলিতে পারি না—এ দেশে যে লক্ষ লক্ষ বৃটিশ ও মার্কিণ সৈনিক আছে এবং বড়লাট ও জঙ্গীলাট হইতে সার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল, সার এডওয়ার্ড বেন্থল প্রভৃতি ইংরেজ মজুদ আছেন, এই সময়ে তাঁহাদিগের জন্য তাঁহাদিগের দেশ হইতে— অন্ততঃ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে গম প্রভৃতি আনান হউক? যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় চাউল পাঠান সম্ভব হয়, তবে ভারতবর্ষের বাহির হইতে ভারতে গম প্রভৃতি আমদানী করাই কি অসম্ভব?

গত জানুয়ারী মাসেও পারস্যোপসাগরে ২ হাজার টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। কেন? পারস্যোপসাগরেও কি "অন্নভোজী" ভারতীয় আছে? যে সময় বাঙ্গালায় এক সের চাউলেও এক জনের জীবন একাধিক দিন রক্ষিত হইতে পারে, সেই সময় এই ২ হাজার টনের মূল্য কি অল্প?

সরকারী বিবৃতিতে কেবল কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানী চাউলের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে আরও বন্দর আছে। সে সকল হইতেও চাউল রপ্তানী হয় নাই ত?

কেন্দ্রী[য়] সরকার আপনাদিগেব কার্য্যের সমর্থনকল্পে বলিয়াছেন ঃ—

"১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে মোট ৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশে পাঠান হয়। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে তাহার পরিমাণ—৫৫ হাজার টন হয়; ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহা ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন হয়। এই ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টনের অর্দ্ধাংশ সিংহলে প্রেরিত হয়। তথায় ৮ লক্ষ ভারতীয় কার্য করিতেছে এবং ব্রহ্ম ও মালয় জাপানের হস্তগত হওয়ায় তাহাদিগকে চাউলের জন্য ক্রমেই ভারতবর্ষের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পারস্যোপসাগরে, আরবে, ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে ও আফ্রিকার বন্দরসমূহেও চাউল গিয়াছে। সে সকল স্থানে ভারতীয় সম্প্রদায় আছে এবং দীর্ঘকাল ভারতের সহিত ব্যবসা ও রাজনীতিকসূত্রে বদ্ধ সম্প্রদায়ও বিদ্যামান।"

১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে যে রপ্তানী খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়াছিল তাহা ভারতবাসীর কল্যাণকল্পে—তাহাদিগের খাদ্যাভাব মোচনের জন্য, কি সমুদ্রপথে জাহাজের পক্ষে সঙ্কটসঙ্কুল বলিয়া তাহা প্রকাশ নাই। বৃটেন বহুদিন ভারতের সহিত বাণিজ্য ও রাজনীতিক সূত্রে বদ্ধ। সেই কারণে কি বৃটেনেও চাউল রপ্তানী সমর্থিত হইতে পারিবে?

সিংহলে যে ৮ লক্ষ ভারতীয় কার্য করিতেছে—তাহারা কাহাদিগের কার্য করিতেছে? তাহাদিগের জন্য চাউলের ব্যবস্থা করা কি তাহাদিগের নিয়োগকারীদিগেরই কর্ত্তব্য নহে? সে জন্য ভারত সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ কি, তাহাই কি ভারতবাসীর জিজ্ঞাস্য নহে। সিংহলের সরকার ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সদ্ব্যবহার? না—অসদ্ব্যবহার? সেই সিংহলে ভারতীয়গণের জন্য ভারতবর্ষ অনাহারে থাকিয়া চাউল পাঠাইবে কেন?

যদি বিদেশে ভারতবাসীকে খাওয়াইবার দায়িত্ব ভারত সরকারের থাকে, তবে এ দেশে ইংরেজ ও মার্কিণীদিগকে খাওয়াইবার জন্য কি বৃটেন ও মার্কিণ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা সঙ্গত বলা যায় না?

সার ব্যারণ জয়তিলক এ দেশে চাউলের সন্ধানে আসিবার পূর্ব্বে এ দেশের লোক সিংহলকে চাউল প্রদানজন্য ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতির বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। সে কথা কি জন্য গোপন রাখা হইয়াছিল? সামরিক প্রয়োজনই কি তাহার কারণ?

এ দেশে কি দক্ষিণ আফ্রিকার লোক নানা কারণে নাই? যদি থাকে, তবে তাহাদিগের জন্য কি দক্ষিণ আফ্রিকা খাদ্য-দ্রব্য প্রেরণ করিতেছে?

ভারত সরকারের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—ভারতীয় খালাসী ব্যতীত আর কাহারও জন্য এখন আর ভারত হইতে খাদ্য-শস্য রপ্তানী করা হইতেছে না। যখন বাঙ্গালার লোককে চাউলের অভাবে বাজরা, জওয়াবও খাইতে বাধ্য হইতে হইতেছে, তখন কি বিদেশে ভারতীয় খালাসীদিগকে সেই সেই দেশের খাদ্য-দ্রব্য প্রদান করা অসম্ভব?

এ দিকে বাঙ্গালার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ বৈঠকের পর বৈঠক বসাইয়া "বিবেচনা" করিতেছেন। যদি বৈঠক ও বিবেচনায় নিরন্নের অন্নাহার হইত, তবে বাঙ্গালী আজ অতিভোজনে অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইত। এই সকল বৈঠকে ও বিবেচনায় বুঝা যায়—তাঁহারা কি কর্ত্তব্য তাহা জানেন না—অন্ধকারে পথের সন্ধানমাত্র করিতেছেন। শেষ নির্দ্ধারণ—"চাউলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, সরকারের নিয়ন্ত্রণে যে সকল স্থানে অধিক চাউল আছে, সে সকল স্থান হইতে অভাব-পীড়িত স্থানে চাউল আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর সে জন্য অবিলম্বে বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া এক কমিটি গঠিত করা হইবে।"

এই সকল বিশেষজ্ঞকে কোথা হইতে কে আমদানী করিবেন? আমরা দেখিয়াছি বে-সরকারী সরবরাহ বিভাগ পুলিস হইতেও লোক বাছাই করিয়া লইতেছেন। পুলিসে চাকরীয়ারা কি খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন? সে অভিজ্ঞতা কিরূপ?

পূর্ব্বাঞ্চলে (বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ চতুষ্টয়ে) যে অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বাতিল হইয়াছে। কিন্তু এখনও কি মেসার্স ইস্পাহানি বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে চাউল কিনিবার ঠিকা সম্ভোগ করিতেছেন না? মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ইহাদিগের যোগ্যতার পরিচয়ে বলিয়াছিলেন—ইহারা মসলেম লীগের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন। তাহাও কি যোগ্যতার পরিচায়ক?

মেসার্স ইস্পাহানিকে বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে কত টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের সহিত কি চুক্তি হইয়াছে, তাহা কি প্রকাশ করা হইবে? মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছেন, বাঙ্গালার গভর্ণর বিনাচুক্তিতেই কোন ঠিকাদারকে চাউল সম্বন্ধে যে ঠিকা দিয়াছিলেন, তাহাতে সরকারের অনেক টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা। এবার যদি কোন চুক্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার সহিত বাঙ্গালার লোকের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, তাহারা তাহা জানিতে চাহিলে তাহা তখনই অসঙ্গত বলা যায় না।

কেন্দ্রী[য়] পরিষদে যান-সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল বলিয়াছেন, তিনি কলিকাতায় ও হাওড়ায় খাদ্য-শস্য সরবরাহের জন্য অসাধারণ ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বলিয়াছিলেন—কলিকাতা ও হাওড়াই সমগ্র বাঙ্গালা দেশ নহে। কিন্তু কলিকাতায় ও হাওড়ায় আমরা

লোকের যে দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাও কি তাঁহার ও খাদ্য-সদস্যের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?

পাঞ্জাব সরকার না কি ১০ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী করিতে দিতে সম্মত হইয়াছেন। যদি পাঞ্জাবে এখনও—অপরকে প্রদানের উপযোগী—এত চাউল মজুত থাকে, তবে এত দিনেও তাহা বাঙ্গালায় আনিবার ব্যবস্থা না করা কি "বাসা থাকিতে বাবুই পাখী ভিজার" মতই বলা যায় না?

বড় দুঃখেই কি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বলেন নাই—যে অব্যবস্থা আমরা লক্ষ্য করিতেছি, নির্ব্বোধ ও দুষ্টবুদ্ধিরা ব্যবস্থা করিবার ভার পাইলেও তদপেক্ষা অধিক অব্যবস্থা করিতে পারিত না। বলা বাহুল্য, তিনি ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দোষারোপ করেন নাই।

এখন কি হইবে?

ভারতের (বিশেষ বাঙ্গালার) খাদ্য-সমস্যা যে বিলাতেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিলাত হইতে আমরা সাহায্য পাই নাই—সহানুভূতি পাইয়াছি এবং তাহাতে যে আমাদিগের অভাব ঘুচিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিরূপ সংবাদ বিলাতে পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, বিলাতের সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত মন্তব্য পাঠ করিলে মনে হয় তথায় লোক এই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ হয় বুঝিতে পারে নাই, নচেত—তাহার সম্মুখীন হইতে চাহিতেছে না।" 'টাইমস্' যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিতে হয়, "নাচে ভাল—পাক দেয় খারাপ।" 'টাইমস্' বলিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সরকার ও জিলার রাজকর্ম্মচারীরা আপনাদিগের (প্রদেশের বা জিলার বা মহকুমার) কৃষকদিগের স্বার্থের নিকট জাতির ও দেশের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহাদিগের কাজ নিন্দনীয়। লোককে ভয় দেখাইয়া সঞ্চিত শস্য বাহির করান সম্ভব নহে। কিন্তু কিসে তাহা সম্ভব হয়, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। প্রত্যেক প্রদেশে প্রকৃত প্রতিনিধি দলে গঠিত সচিব সঙ্ঘ গঠিত করিয়া তাঁহাদিগের উপর ভার দিলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে—নহিলে নহে।

আর একখানি পত্র (ইয়র্কশায়ার পোষ্ট) ভারতে বিরাটত্ব হইতে জাতিভেদ পর্য্যন্ত অসুবিধায়ই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই দুর্ভিক্ষের পরেও ভারতের অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হইবে না। বর্ত্তমানে তাহার সহিত অন্যান্য দেশের যোগ না থাকায় সে বিপন্ন—ব্রহ্ম, মালয়, চীন প্রভৃতি যে সকল দেশ আজ জাপানীদিগের দ্বারা অধিকৃত, সে সকলের সহিত সংযোগ না ঘটিলে ভারতের উন্নতির আশা নাই। সে সংযোগ স্থাপিত হইলেও ভারতের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। যত দিন ভারতবর্ষ আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ অধিকার লাভ না করিবে—তত দিন কিরূপে তাহার দারিদ্র্যের মূল কারণ দূর হইতে পারে?

সে পরের কথা। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ইংরেজ সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে নীতিতে বৃটেন কিরূপ উপকৃত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই—পরে বৃটেন—এই যুদ্ধে অর্থ ব্যয়ের বিষয় মনে করিয়াও তাহার পরিবর্ত্তন করিবে কি না, তাহার আলোচনা আজ আর আমরা করিব না।

আজ সম্মুখে কর্ত্তব্য—লোককে অনাহারজনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করা। নূতন খাদ্য-সচিব কেন্দ্রী[য়] ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন—তিনি সকলের সহযোগ চাহেন। কিন্তু তিনি সহযোগ লাভের সদুপায় অবলম্বন করিবেন কি?

(শ্রাবণ ১৩৫০)

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালায় যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কলিকাতায় প্রতিদিন রাজপথে বহু মৃতদেহ পতিত থাকিতেছে—বহু মুমূর্ষু লোক রাজপথে পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস টানিতেছে। পুলিস প্রতিদিন যে সকল শব লইয়া যাইতেছে, কেবল তাহারই হিসাব প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দু সৎকার সমিতি এবং মুসলমান দিগের শব সমাহিত করিবার সমিতি যে সকল শব দাহ বা সমাহিত করিতেছে, তাহার সঠিক হিসাব প্রকাশিত হয় নাই। হাসপাতালে মুমূর্ষ লোকের স্থানাভাব।

যাহারা কলিকাতার রাজপথে মরিয়া পড়িয়া রহিতেছে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় খাবি খাইতেছে, তাহারা সকলে না হউক--অনেকেই মফঃস্বলের গৃহস্থ সম্প্রদায়ের। ইহারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য রাজার সহর কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু হতাশ হইয়া তাহারা নিরাশ্রয় ও অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতেছে। যাহারা একটু সাহসী ও শক্তিশালী, তাহারাই কলিকাতায় আসিতেছে, অবশিষ্ট সকলে গ্রামে ও পল্লীগ্রামে থাকিয়া মরিতেছে। এরূপ মৃতের সংখ্যা যে কত, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সরকার নিয়ন্ত্রিত দরে যে চাউল বা আটা দিতেছেন তাহা পর্যাপ্ত নহে, উহাতে অর্দ্ধাশনও হয় না এবং একদিন দেওয়া হয় ত তিন দিন দেওয়া হয় না। মফঃস্বলে কোন কোন স্থলে শুনিতেছি, কোন পরিবারে যত লোকই থাকুক না কেন, কাহাকেও সপ্তাহে তিন সেরের অধিক চাউল দেওয়া হইবে না,—যাহাদিগকে চাউল দেওয়া হইবে, তাহাদিগকে আটা বা ময়দা দেওয়া হইবে না নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অথচ মোটা বেতনের সচিবরা বলিয়া আসিতেছিলেন—ভয় নাই চাউল যথেষ্ট আছে। এ সকল মিথ্যা বাক্য দ্বারা লোককে প্রতারিত করিবার সার্থকতা কি? মৌলভী ফজলুল হকের অদৃষ্ট ভাল, তাই তিনি পদত্যাগে বাধ্য হইয়া, এই সহস্র সহস্র লোকের জীবনত্যাগের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

কেন্দ্রী[য়] সরকারের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সচিব সার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইবার সময় বলিয়াছেন,—"প্রকৃত কথা এই যে, আমরা সকলেই ভুল করিয়াছি।" পাইকারী হিসাবে এক সময় সকল কর্ম্মচারীই কেন ঠিক একই ভুল করিলেন, সার জওলাপ্রসাদ সে কথা বলেন নাই। যাঁহারা সরকারী নোকরি করে নাই,—বা করেন না, তাঁহাদের কিন্তু ঠিক ঐরূপ ভুল হয় না। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত কিন্তু সকলেরই একই রকম হইতে দেখা যায় না। যদি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার কোন কারণ আছে।

সে কারণ কি, তাহা সার জওলাপ্রসাদ যদি বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন, "আসুন আমরা এখন একযোগে যাহা কর্তব্য তাহা যথাসাধ্য করি।" আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সরকারী পুরুষরা যে ভ্রান্তির মালা গাঁথিয়া আসিতেছেন, এবার তাঁহারা সেই মালায় আরও যে কয়েকটা ভ্রান্তির ঘেঁটুফুল সংযোগ করিবেন না, কে বলিতে পারে? যাঁহারা সরকারী নোকরি করেন না, তাঁহাদের সহিত তাঁহারা যে একমত হইবেন, তাহার প্রমাণ কি? আসল কথা, যেরূপভাবে সরকারী কর্ম্মচারীরা নির্ব্বাচিত এবং কাজে নিযুক্ত হন, তাহাতে তাঁহাদের ভুল হইবেই। সার জওলাপ্রসাদ কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন,—বাঙ্গালায় কি কারণে এই জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল? ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যুদ্ধের জন্য দুর্ম্মূল্যতা তীক্ষ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেও বাঙ্গালার মত এত সাংঘাতিক হয় নাই কেন? বাঙ্গালায় যখন খাদ্যশস্যের দারুণ অভাব

উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া জনসাধারণের মধ্য হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সরকাবকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন,—তখন বেসরকারী ইংরেজ দল বাঙ্গালায় এই খাদ্য সমস্যার প্রতিকার করিতে বদ্ধ পরিকর না হইয়া উহাকে তদানীন্তন লোকের কতকটা আস্থাভাজন সচিবসঙ্ঘকে অপসারিত করিবার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন কেন? সার জওলাপ্রসাদ কি নির্ভীকভাবে বলিয়া দিবেন যে, পাঞ্জাবের ব্যেপার মণ্ডল যখন বলিয়াছিলেন, যদি সরকার মাল চালান নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলি শিথিল করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা বাঙ্গালায় প্রভূত পরিমাণে চাউল চালান দিতে পারেন, তখন সে কথা শুনা হয় নাই কেন? লাহোরের আর্য্য প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা, রাওয়াল পিণ্ডির ব্যবসায়ী দল ঐরূপ সর্ত্তে বাঙ্গালায় চাউল ও গম পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন,—সিন্ধু ও বোম্বাই অঞ্চল হইতেও ঐরূপ সর্ত্তে বাঙ্গালায় চাউল ও গম পাঠাইবার প্রস্তাব আসিয়াছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঙ্গালা সরকার উহাতে সম্মত হন নাই কেন? বাঙ্গালায় এবারের এই দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যুক্তপ্রদেশের চল্লিশের মন্বন্তর এবং উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষকেও অতিক্রম করিবে বলিয়া শঙ্কা হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য, ভগবানের বিচারে এ ভুলের কি মার্জ্জনা মিলিবে?

(ভাদ্র ১৩৫০)

সরকারী কন্‌ট্রোলের দোকান

বাঙ্গালা সরকারের বে-সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ভাগ্যবান কর্ত্তা মিষ্টার সুরাবর্দ্দী কলিকাতা ও মফঃস্বলের স্থানে স্থানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য শস্যাদি প্রদানের যে দোকান খুলিতেছেন, তাহা লোককে প্রকৃত সাহায্য দানের জন্য খোলা হইতেছে কি-না সন্দেহ! কারণ নিয়ম করা হইয়াছে যে, কোন পরিবারকে সপ্তাহে তিন সেরের অধিক চাউল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দেওয়া হইবে না এবং যাহাকে চাউল দেওয়া হইবে তাহাকে আর আটা দেওয়া হইবে না। ইহার অর্থ কি? ইহাতে কি গৃহস্থের খাদ্যাভাব ঘুচিতে পারে? যে পরিবারে ৬ জন লোক, সেই পরিবাবের একদিনে তিন সের চাউল কুলায় না। সাত দিন উহাতে চলিবে কি প্রকারে? যাহাদের পরিবাবে ৩ জন মাত্র লোক, তাহাদের তিন সের চাউলে বড় জোর দুই দিন চলিতে পারে,—আর পাঁচ দিন তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে? এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে তিলে তিলে মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য কি? গতবার অজন্মা হয় নাই। কিছু শস্য নষ্ট হইলেও উহাতে এত অভাব হইতে পারে না। বেসবকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগ এক এক স্থানে দুই তিন শত মন চাউল দিয়া তাহা দশ সহস্র দুঃস্থ লোকদিগের মধ্যে বণ্টনের নির্দ্দেশ দিতেছেন। ইহা কি সম্ভব? এদিকে লোক ত মরিযা উজাড় হইয়া যাইতেছে। মফঃস্বলে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সরকারী সরবরাহ বিভাগের মূল্য নিযন্ত্রণ ব্যবস্থা একটা লোক দেখান ভান মাত্র। যাহাদের পয়সা নাই,—তাহারা ত নগদ মূল্য দিয়া খাদ্য কিনিতে পায় না। তাহাদেব উপায়? সর্ব্বত্র লঙ্গরখানা নাই। যাহা আছে তাহা এতই একাকার ব্যাপার যে সকলে সেখানে যাইতে চাহে না—যাহারা যায়, তাহাদেরও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া খাদ্য দেওয়া হয় না। দুই বা তিন ছটাক মাত্রায় যে মণ্ড বিতরিত হয় তাহা সুরাবর্দ্দী-সুধা নামে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। উহাতে জঠর জ্বালা নিবৃত্ত না হইয়া মহামারীর বিস্তারে ভবজ্বালার অবসানই ঘটাইতেছে। যত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহাতে অজন্মা হেতু খাদ্যশস্যেবই অভাব হইয়াছে এবং মূল্য বাড়িয়াছে। এবার সকল জিনিষের মূল্যই অতিশয় অধিক। চারি আনার সাগু না হইলে

একজন রোগীর একবেলার পথ্যও সম্ভব হয় না। তাহাও দুষ্প্রাপ্য। সমস্যা সঙ্গীন। অমর না হইলে এই সুরাবর্দ্দী-মার্কা সুধাপানে বলক্ষয়ের ফলে ধীরে ধীরে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

(ভাদ্র ১৩৫০)

অনাহারে মৃত্যু

কলিকাতার রাজপথে প্রত্যহ বহু লোকের মৃত্যু হইতেছে। কত লোক এই প্রকার শোচনীয়ভাবে মরিতেছে, তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। ২৯শে শ্রাবণ হইতে ২৬শে ভাদ্র পর্য্যন্ত কলিকাতার রাজপথে ৫৫০ জন লোক মরিয়া পড়িয়াছিল এবং ২৮০৫ জন হাসপাতালে নীত হইয়াছিল -সেখানে ৬১১ জন মরিয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় এ পর্য্যন্ত অনশনে মৃতের সংখ্যা ৯০৪২ বলিয়া অসম্পূর্ণ হিসাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' এবার ভীষণ মরণের কয়েকখানি চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের পোঁ-ধরা লোকেরা 'স্টেটস্‌ম্যান'কে তীব্রভাবে তিরস্কার করিয়াছেন। যাহাদের কৃপায় রাজপথ শ্মশানে পরিণত হইতেছে, তাহাদের কোন দোষ নাই, যে তাহা দেখে বা দেখায়, তাহারই যত দোষ! ইহাই সাম্রাজ্যবাদীদের গণতন্ত্র নিষ্ঠার স্বরূপ। গণতন্ত্রের কাছে রাজা ও রাখালের প্রাণের মূল্য সমান। কিন্তু সাম্রাজাবাদীরা এ দিক্‌টার মর্ম্ম কতখানি বুঝেন, তাহা এই বীভৎস ব্যাপারেই সুপ্রকাশ। দেশের লোক এই দুঃসময়ে সার্ব্বভৌম দুর্ম্মূল্যতার চাপে অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইলেও স্বদেশবাসীদের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীগণ, বিদেশী সওদারগণ, বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী এবং বেসরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কর্ম্মচারীরা এ ব্যাপারে এক কপর্দ্দকও দিয়াছেন বলিয়া এ পর্যন্ত শুনি নাই!

মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী এখন বেশ সপ্রতিভভাবে বলিতেছেন,—চাউলের মন ৩৩ টাকা হউক আর ৪০ টাকা হউক, উহা যে লোক কিনিতে পাইতেছে, ইহাতেই তাঁহার কেরামতি শত-সূর্য্য-সম তেজে ভাস্বর! আজ যদি হকের সচিবমণ্ডলী থাকিত, তাহা হইলে তাহাও পাইতে পারিত না। একমাত্র লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ ত্রিভুবন বিজয়ী হইতে চায়। পল্লী অঞ্চল হইতে ৮০ হাজার ক্ষুধার্ত লোক অন্নের আশায় কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহাদের ৪০ হাজার নিঃস্ব ও ১৮ হাজার লোক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সরকারী হিসাবে প্রকাশ। নিরন্ন লোকদিগকে কলিকাতা হইতে সরাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। কলিকাতায় লোক মরিলে তাহা একেবারে চাপা দিবার উপায় নাই। তাই কি মফঃস্বলে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহাদিগকে সরাইবার চেষ্টা হইতেছে? ইহাদিগের অধিকাংশকেই ২৪ পরগণা (প্রায় ৩১ হাজার) আলমডাঙ্গা শিবিরে লইয়া যাওয়া হইবে। তদ্ভিন্ন হাওড়া, ডোমজুড়, জগদ্বল্লভপুর, পতিহাস, মুন্সিরহাট প্রভৃতি ১১টি স্থানে ৫২ হাজার ২ শত লোককে কলিকাতা হইতে সরাইয়া পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধ শ্যাম বন-বিটপি-বহুল, ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত অঞ্চলে লইয়া যাওয়া হইবে। ইহাতে কলিকাতায় এই কুদৃশ্য কতক ঢাকা পড়িতে পারে, কিন্তু আরও লোক যে অন্নাভাবে কলিকাতায় আসিবে না তাহার প্রমাণ কি? এখনও যাহারা হাতা-কাঁথা বেচিয়া অন্নের জোগাড় করিতেছে,—তাহা ফুরাইলে তাহাদের কি হইবে? নূতন আমন ধান উঠিলেই যে এই সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নহে। তখন সিংহলও থাকিবে—দক্ষিণ আফ্রিকাও থাকিবে। থাকিবে না কেবল বাঙ্গালীর গোলায় ধান! আর ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি? হনোজ দিল্লী দূরান্ত! যে সময়

বাঙ্গালায় মানুষের সহিত কুকুরের খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি হইতেছে, অন্নের জন্য জননী সন্তানকে বিসর্জ্জন দিতেছে, তখন সেইসব মৃত্যুপথযাত্রীর অর্থে যে সচিবমণ্ডলী মোটা বেতন ও ভাতা লইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না, দেশের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক আছে কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। এ বেতন গ্রহণ কি আইনসঙ্গত লুণ্ঠন নয়?

(ভাদ্র ১৩৫০)

কলিকাতায় বুভুক্ষুদিগের মৃত্যু

সরকারী বিবরণে জানানো হইয়াছে যে, ২৬শে ভাদ্র হইতে ৮ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ৩ হাজার ৪৩৯ জন অনশনজীর্ণ মরণাপন্ন নরনারীকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে ৯১৪ জন হাসপাতালে মারা গিয়াছে এবং পুলিস পথ হইতে ৬৮১ জনের মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় অনশনে মৃত্যুর যে অসম্পূর্ণ বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই সময় মধ্যে ২২১৪ জন হতভাগ্য বাঙ্গালীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ সকল বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, সরকারী ও বেসরকারী কোন ব্যবস্থাই মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিতেছে না। কর্পোরেশন হেলথ কমিটির বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কলিকাতার বিভিন্ন শ্মশানে যত মৃতদেহ দাহ করা হইতেছে, তাহার মধ্যে ৬০।৭০ জনই বুভুক্ষু দুঃস্থ ব্যক্তির। শ্মশানে মৃতদেহ প্রত্যহ স্তূপাকারে পড়িয়া পচিতেছে—দাহ করিবার স্থানাভাব। কলিকাতায় অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শ্মশানের প্রসারবৃদ্ধি ও এইসব মৃতদেহ রাখিবার সুব্যবস্থা হওয়া অচিরে কর্ত্তব্য নয় কি?

(আশ্বিন ১৩৫০)

এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

পার্লামেণ্টে ভারত সচিব বলিয়াছেন—বাঙ্গালা দেশে চাউলের মূল্য কমিয়াছে। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণের পর যে বাঙ্গালা দেশের বাজার হইতে চাউল একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে—সে সংবাদ ভারত বিদ্বেষী ভারত সচিব পান নাই। তিনি তাঁহার দেশের 'নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশন' পত্রের অভিমত পড়িয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিতেন। 'নিউ স্টেটসম্যান' লিখিয়াছেন—"কলিকাতার জনসাধারণের অবস্থার যে বিবরণ আমরা পাইতেছি, তাহা যেন মধ্যযুগের মহামারীর কলঙ্ককাহিনী। সরকাব এই সর্ব্বনাশের প্রতিকারার্থ কি করিয়াছেন? ভারত শাসনের দায়িত্ব আজ প্রকৃতপক্ষে কাহার উপর অর্পিত? বড়লাটের শাসন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ভারতীয় হইলেও তাঁহারা বড়লাটেরই মনোনীত ব্যক্তি। ইহাদের কোন দল নাই। প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত হইলেও অধিকাংশ প্রদেশে এ শাসন অচল। পাঞ্জাব ব্যতীত যে সকল প্রদেশ সচিবসঙ্ঘ-নিয়ন্ত্রিত, সে সব প্রদেশেরও সচিব-সভা প্রতিনিধিমূলক নহে। ভারতের দুইটি বৃহৎ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি দল (মোসলেম লীগ) হিন্দুস্থান হইতে মোসলেম প্রধান প্রদেশগুলিকে পৃথক করা লইয়া ব্যস্ত ; অপর দলের (কংগ্রেসের) সকল নেতাই কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ ; সুতরাং অভিমত প্রকাশ সুযোগ বর্জ্জিত।" ভারতের এ-হেন পরিস্থিতিতে নিরন্ন, বিপন্ন, মরণাচ্ছন্ন বাঙ্গালা তথা ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য কাহার প্রাণ কাঁদিবে? ইংরেজ সরকার যুদ্ধ লইয়াই ব্যস্ত।

ভারতের এই আভ্যন্তরীণ সর্ব্বনাশের প্রতিকার-ভার যাঁহাদিগের উপর, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ শক্তি সমরায়োজনে ব্যাপৃত ; সুতরাং ক্ষুধার্ত্ত দেশবাসীকে নিরন্ন দেশবাসীর অকিঞ্চিৎকর সাহায্য পাইয়াই তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

বাঙ্গালার এই নিরন্ন অবস্থা কি দুর্ভিক্ষ? ৭ই আশ্বিন বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার একটি প্রস্তাবে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়া সরকারকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণকে অন্নদান করিবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাবটি অবশ্য নাজিমুদ্দীন-সুরাবর্দ্দী কোম্পানীর ভোট প্রাবল্যে অগ্রাহ্য হয়। খাদ্য বিভাগের সচিব সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ হয় নাই, চাউলের মূল্য একটু বাড়িয়াছে মাত্র। নিরন্ন বাঙ্গালীর ছিন্ন ঝুলি হইতে তাহাদের শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া যাহারা মোটা বেতনভোগী মনসবদার হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তণ্ডুলের ৮/১০ গুণ মূল্য বৃদ্ধি অকিঞ্চিৎকর নয়। আর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, সার জগদীশ প্রসাদ, বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ, মার্কিণ সাংবাদিকগণ সকলেই বাঙ্গালার অবস্থাকে দুর্ভিক্ষই আখ্যা দিয়াছেন। সরকারী ফেমিন কোডে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ এই ঃ—(১) খাদ্য-পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ; (২) খাদ্য শস্য ব্যবসায় অতিরিক্ত চাঞ্চল্য ; (৩) লোকের স্থান ত্যাগের আধিক্য; (৪) অস্বাভাবিকভাবে জনতার ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা; (৫) ভিক্ষার অভাবে স্থানীয় ভিক্ষুকদিগের দূর দূরান্তরে গমন ; (৬) সমাজের আভ্যন্তরীণ চাঞ্চল্য, অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি। খাদ্য সচিব সুরাবর্দ্দী বোধ হয় এ সকল কেতাবের পৃষ্ঠাও উল্টান নাই! রাজনীতিক ধুরন্ধর অবাঙ্গালী জিন্না এবং অর্থনীতিক রসদদার অবাঙ্গালী ইস্পাহানী কোম্পানী এবং নিজস্ব বাঙ্গালী বৃত্তি, বুদ্ধি, সামাজিকতা ও স্বাদেশিকতার অভাব না হইলে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর এমন সর্ব্বনাশে নির্ম্মম উপহাস করিতেন না!

(আশ্বিন ১৩৫০)

দুর্গত দূরীকরণ

কলিকাতা হইতে সোৎসাহে দুর্গতদিগকে বলপূর্ব্বক দূর করা হইতেছে। লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় আসিবেন, এই সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে এই কার্য্যে অধিক তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে, তাহা "কাকতালীয়বৎ" কি না—কে বলিতে পারে? আমরা স্বয়ং যে সকল দৃশ্য দেখিতেছি, সে সকল স্মরণ করিতেও কষ্ট হয়। সরকার অনায়াসে বলিয়াছেন এ কার্যে স্বল্প বলপ্রয়োগের নৈতিক সমর্থনও তাঁহাদিগের আছে। তাঁহাদিগের নীতি কি, সে সম্বন্ধে ২ জন মহিলার বিবৃতি হইতে আমরা একাংশ উদ্বৃত করিতেছি ঃ—

"দুর্গতগণ ভীতিবিপ্লব হইয়াছে এবং যাহারা নিজ নিজ গ্রামে যাইতেছে তথায় তাহারা—আগামী ফসল না পাওয়া পর্য্যন্ত অনাহারে বা কুখাদ্য খাইয়া মরিবে, মনে করা যায়। তাহারা ভয়ে সেতুর নিম্নে, লোকের বারান্দার তলে ও বস্তিতে লুকাইয়া থাকিতেছে এবং পাছে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় সে ভয়ে বাহির হইতে না পারায় অনাহারে মরিতেছে।"

তাঁহারা বলিয়াছেন—শিশুদিগকে মাতার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হইতেছে—স্বামীকে স্ত্রীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইতেছে। এরূপ নির্ম্মম কার্য কাহার বা কাহাদিগের কল্যাণকল্পে করা হইতেছে? ইহা কি কোনরূপ সমর্থিত হইতে পারে?

(কার্ত্তিক ১৩৫০)

বাংলার খাদ্য-সমস্যা

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে বাঙ্গালার খাদ্য সমস্যার আলোচনায় অনেক নিন্দাজনক ব্যবস্থার পরিচয় প্রকট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার আবদুল হানিফ গজনভী ব্যবস্থা পরিষদে ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু রাষ্ট্রীয় পরিষদে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে—এই খাদ্য সমস্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার ফল নহে—মানুষের সৃষ্ট। এই যে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু, ইহার জন্য ভারত সচিব আমেরী প্রাকৃতিক উপদ্রবকে ও বড়লাটের শাসকপরিষদের অন্যতম সদস্য সার সুলতান আমেদ যুদ্ধকে দায়ী করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মিষ্টার আমেরী প্রথমে বাঙ্গালার মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়া পরে—প্রাকৃতিক কারণকে দায়ী করিতে চাহিয়াছেন, আর সার সুলতান আমেদ জাপানকে "চাউল চোর" আখ্যা দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগকে যেমন বাঙ্গালায় চাউলের অভাবের জন্য দায়ী করা যায় না—তেমনই ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হওয়াও সেই দুর্গতির প্রধান কারণ বলা যায় না। প্রকৃত কারণ অমনোযোগ, অব্যবস্থা, অযোগ্যতা।

ইহাও প্রমাণিত যে, কেবল বাঙ্গালা সরকারই যে পঞ্জাব হইতে বাঙ্গালার দুর্গতদিগের জন্য ক্রীত খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যে প্রভূত লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে ; পরন্তু ভারত সরকারও লাভ করিতে বিরত হয়েন নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-সদস্য বলিয়াছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার লাভ করেন নাই—লাভ হইয়াছে প্রমাণ হইলে এক টাকায় দশ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। ভারত সরকারের লাভ প্রতিপন্ন হওয়ায় পাঞ্জাবের সচিব সর্দ্দার বলদেও সিংহ বলিয়াছেন—অর্থ-সদস্য সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন কি?

রাষ্ট্রীয় পরিষদে সরকার পক্ষ হইতেই স্বীকার করা হইয়াছে—লোক আস্থা হারাইয়াছে, তাহা বলা না হইলেও কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যখন বাঙ্গালায় খাদ্য দ্রব্যের অভাব, তখন "অভাব নাই" বলিয়া লোককে প্রতারিত করা। দুর্গতদিগের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে লাভ করা, বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের পঙ্গপালের দলের মত চাকরীয়া লইয়া অর্থব্যয়—এ সকলের কথা অনেকেই বলিয়াছেন। আবার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকারের মনোনীত সদস্য শ্রীমতী রেণুকা রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে কোন সরকারের পক্ষে বিশেষ লজ্জাজনক। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

নিখিল ভারত মহিলা কনফারেন্সের কলিকাতা শাখার সাহায্য দান কেন্দ্রের জন্য মধ্যপ্রদেশ হইতে এক মালগাড়ী বোঝাই সরু চাউল প্রেরিত হইয়াছিল। গত ২০শে নভেম্বর প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা রেল ভাড়া দিয়া (এই চাউল দান এবং সেইজন্য ইহার ভাড়া সরকারের প্রদান করিবার কথা) চাউল আনিবার জন্য লরী প্রেরণ করেন। সেদিন ডিরেক্টরের দর্শন পাওয়া যায় নাই। দিনের পর দিন ঘুরিয়া ৪ঠা নভেম্বর জানা যায়, চাউল শালিমার হইতে বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের (এজেন্টের) গুদামে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ৮ই নভেম্বর তারিখে জানা যায়, ভাড়া বাবদ প্রায় ৩ গুণ ভাড়া দাবী করা হয়। ৯ই নভেম্বর নগদ টাকা লইতে অস্বীকার করা হয়। ১১ই নভেম্বর রামকৃষ্ণপুরে এজেন্ট এম, কে, আকবরের গুদামে যাইয়া মাল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তখন সরু চাউল মোটা হইয়া গিয়াছে? কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গুদামের লোক এক পত্র

দেখায়—বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ সরু চাউলের পরিবর্ত্তে মোটা চাউল দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

এই সকল অভিযোগ এতই লজ্জাজনক যে এই সকলের তদন্ত ও তদন্তে সকল অভিযোগ প্রতিপন্ন হইলে যাহারা দায়ী, তাহাদিগের সকলকে এমন দণ্ড প্রদান করা সঙ্গত যে, ভবিষ্যতে আর কেহ এমন অন্যায় করিতে সাহস না করে।

কিন্তু এ বিষয় যে কেন হইয়াছে, তাহাও বাঙ্গালার লোক জানিতে পারে নাই। যে চাউল বাঙ্গালার নিরন্নদিগকে অন্নদান জন্য দয়াদত্ত দান হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা কেন শালিমার হইতে রামকৃষ্ণপুরে সরাইয়া ব্যয় (তথা এজেণ্টের কমিশন?) বাড়ান হইল, কেন রেল ভাড়ার টাকার অতিরিক্ত ভাড়ার টাকা লওয়া হইল, কেন চাউল দিতে কয়দিন বিলম্ব করিয়া সাহায্য দান কার্য্যে বাধা দেওয়া (এবং হয় ত সরু চাউল মোটা করিবার সুযোগও দেওয়া) হইল,—এ সকল বিষয় কি ব্যক্ত করা হইবে? সর্ব্বোপরি কথা—একথা কি সত্য যে, বে-সরকারী বিভাগ সরু চাউল লইয়া মোটা চাউল দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন?

বাঙ্গালায় যে সকল অধিবাসী অনাহারে মরে নাই, তাহাদিগের খাদ্য সমস্যার সমাধান প্রকৃতির কৃপায় হইতেছিল—আমন ধান্যে প্রচুর ফলন হইয়াছে। কিন্তু এখনই সরকার কি করিবেন সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট কথা না বলায় এবং মধ্যে মধ্যে চাউল কিনিবার কথা বলায় লোকের যেটুকু আস্থার উদ্ভব হইতেছিল, তাহাও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

কলিকাতার ও শিল্প কেন্দ্র অঞ্চলের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন—সে বিষয়ে বাঙ্গালার সচিব সঙ্ঘ শোভার্থ মাত্র। আবার কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালার খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যবস্থার কতকটা ৩ জন সামরিক কর্ম্মচারীকে দিয়া বাঙ্গালা সরকারের ক্ষমতা আরও সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়াছেন।

এ অবস্থায় আবার যেন দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হয় এবং বাঙ্গালার লোক আবার অনাহারে মৃত্যুমুখগামী না হয়।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

বলপ্রয়োগ

যে সকল দুর্গত অন্নাভাবে কলিকাতায় আসিয়া ভিক্ষা করিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছিল, বাঙ্গালা সরকার সহসা তাহাদিগকে কলিকাতা হইতে দূর করিতে উৎসাহী হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাহাদিগকে অপসারিত করিবার জন্য "মৃদু" বলপ্রয়োগের অধিকারও তাহাদিগের আছে। কিন্তু যে বল প্রযুক্ত হয়, তাহা যে সর্ব্বত্র মৃদু নহে—বিশেষ স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গে হস্তক্ষেপ যে কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না—তাহা বলিলেও সরকার সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ডাক্তার মুঞ্জে ঐ কার্য্যে যে অনাচার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা সংবাদপত্রে বিবৃত করিলে সরকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—কর্ম্মচারীটি নির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কেন তাহা হয়? আর দুর্গতদিগকে কলিকাতা হইতে বাহিরে যে সকল "আশ্রয়ে" পাঠান হয়, সে সকলের কোন কোনটি যে আশ্রয়ই নহে, তাহা মেজর পি বর্দ্ধন ডোমজুরের আশ্রমের বর্ণনায় দেখাইয়াছেন।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

আবার আশঙ্কা

অস্থায়িরূপে বাঙ্গালার গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সার টমাস রাথারফোর্ড দুইটি কথা বলিয়াছিলেন ঃ—

(১) জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় চাউলের মূল্য ১০ টাকা কম হইবে ;

(২) আমন ধান সংগৃহীত হইলেই বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ দূর হইবে।

দুঃখের বিষয়, সেই দুই কথার একটিও সত্য হয় নাই। তিনি সম্পূর্ণ আশা লইয়া মিষ্টার কেসীকে কার্য্যভার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এখন বাঙ্গালার অবস্থা মেজর জেনারেল স্টুয়ার্ট গত ১১ই জানুয়ারি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

(১) দুর্ভিক্ষ ও তাহার পরবর্ত্তী কালে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি গার্হস্থ্য ব্যাপারের শিল্পীরা অনেক স্থলে নিশ্চি হ্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদিগের শূন্য স্থান পূরণ করা দুষ্কর।

(২) সমর বিভাগ দক্ষিণবঙ্গে ১৭টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়া পীড়িতদিগের চিকিৎসা করিতেছেন। ৪০টি যাযাবর চিকিৎসাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এক লক্ষ ৩০ হাজারের অধিক লোক এই সকলের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে—রোগীদিগের ১ লক্ষ ২০ হাজার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। প্রতি গৃহে ম্যালেরিয়ায় লোক মরিয়াছে বা শয্যাগত রহিয়াছে।

(৩) কুইনাইনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। কলেরা এখন কমিয়াছে, কিন্তু বসন্ত দেখা দিয়াছে।

এই শোচনীয় অবস্থার সহিত আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয় সমগ্র ভারতে যে এক কোটি গবাদি পশু নিহত করা হইয়াছে, বাঙ্গালায় তাহার ভাগ অনুল্লেখযোগ্য নহে। লোকের অভাবে এবং গৃহপালিত পশুর অভাবে কৃষিকার্য্যে বিশেষ অসুবিধা অনিবার্য্য। দুগ্ধের অভাব যে অত্যন্ত অধিক তাহা বলা বাহুল্য।

বিলাতের "নিউজ ক্রনিকল" পত্রের দিল্লীস্থ প্রতিনিধি লিখিয়াছেন—যদিও এবার আমন ধান্যের ফসলের অসাধারণ অধিক ফলন হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালার অপূর্ণাহার দুর্ব্বল ব্যাধি-জর্জ্জরিত জনগণের আবার, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইবার অশঙ্কা হইতেছে। এবার দুর্ভিক্ষ আরও ভয়াবহ হইবে। কয় সপ্তাহ পূর্ব্বে যে আশা করা গিয়াছিল, বিপদের অবসান হইয়াছে, সে আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। গতবার যে সব কারণে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, এবার সেই সকল কারণই সপ্রকাশ হইতেছে— লোকের আস্থার অভাব ঘটিয়াছে—যে ব্যবসার পথে খাদ্য শস্য লোকের নিকট আসিত সে পথ বন্ধ করা হইয়াছে। যে সকল দুর্গতকে কলিকাতা হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল, তাহারা আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছে—গ্রামে তাহাদিগের জীবিকার্জ্জনের উপায় নাই। বাঙ্গালা সরকার যে কটি "এজেন্ট"—ধান্য ও চাউল ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যবসার বাজারে সুপরিচিত হইলেও চাউলের ব্যবসায় অনভিজ্ঞ।

বাঙ্গালার সচিবসঙেঘর পক্ষ হইতে এই বিবৃতির প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই বিবৃতিতেও বহু ত্রুটি সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস দৃঢ় করিতে পারে।

সচিবরা কলিকাতার ও বাঙ্গালার সাধারণ ব্যবসায়ীদিগকে বাদ দিয়া যে ৪ জন "এজেন্ট" নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মেসার্স শ ওয়ালেস কোম্পানী বিদেশী, মেসার্স দৌলৎরাম

রাউৎমল মাড়বারী এবং সরকারই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পরে আর চাউলের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন না।

অবশিষ্ট—(১) মেসার্স ইস্পাহানি কোম্পানী, (২) ভাগ্যকুলের রায়গণ।

মেসার্স ইস্পাহানি কোম্পানীর পক্ষে মীর্জ্জা আব্দুল ওহাবাব গত বৎসর ১৮ই জুন হইতে ১৮ই আগষ্ট ২ মাসের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণাদেশ লঙ্ঘন করিয়া বেআইনী ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার চাউল কিনিয়া মজুদ করায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও এক হাজার টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হইয়াছে। মজুদ চাউল বাজেয়াপ্ত করার আদেশ হইয়াছে। সে বলিয়াছিল, সে বাঙ্গালার দুর্গতদের জন্য চাউল ক্রয় করিয়াছিল। বিচারক বলিয়াছেন, সে লাভের জন্য তাহা করিয়াছিল এবং সেইজন্য বিশেষভাবে দণ্ডার্হ। এই চাউল সে মেসার্স ইস্পাহানির জন্য কিনিয়াছিল কিনা, সে সম্বন্ধে সরকার কোন বিবৃতি প্রদান করেন নাই।

ভাগ্যকুলের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায়-পরিবার যে বড় ব্যবসায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রচার সচিব যে বলিয়াছেন, তাঁহারা ৬/৭ বৎসর পূর্ব্বেও চাউল ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহা মিথ্যা কথা। তাঁহারা অন্ততঃ ২০ বৎসর সে ব্যবসা করেন নাই। এই মিথ্যা ইচ্ছাকৃত কিনা, কে বলিবে?

'নিউজ ক্রনিকল' সচিবদিগের বিবৃতি উপেক্ষণীয় ধরিয়া লইয়াছে।

ওদিকে পার্লামেণ্টে ভারত সচিব বলিয়াছেন—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ৫ মাসে দুর্ভিক্ষ ও রোগে অতিরিক্ত মৃত্যু সংখ্যা ১০ লক্ষ অতিক্রম করে নাই। তাঁহার হিসাব নির্ভরযোগ্য নহে—কারণ তিনিই স্বীকার করিয়াছেন—নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় নাই। এদেশের লোকের বিশ্বাস, মৃত্যু সংখ্যা অনেক অধিক। কিন্তু যদি তাহা ১০ লক্ষই হয়, তথাপি—এই মৃত্যুর জন্য কি সচিবসঙ্ঘ বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার জন হার্ব্বাট, লর্ড লিনলিথগোর সরকার ও বৃটিশ সরকার দায়ী নহেন?

'নিউজ ক্রনিকল' যে আশঙ্কার কথা বলিয়াছেন, তাহা যাতে সত্যে পরিণত হইতে না পারে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গতবার যে সচিবরা খাদ্যদ্রব্যের অভাব জানিয়াও যে অভাব নাই বলিয়া মিথ্যায় লোককে ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন এবং সেজন্য লজ্জানুভবও করেন নাই, যদি সেই সচিবরা আবার সতর্ক হইতে বাধ্য না হয়েন, তবে বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে।

বাঙ্গালার বিপদ যে এখনও ঘুচে নাই, তাহা কোন কোন ইংরেজ ও বহু ভারতীয় বলিয়াছেন। এই ভারতীয়দিগের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত দুর্ভিক্ষ যে মানুষের সৃষ্ট তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এবার বাঙ্গালায় আমন ধানের ফসল ভাল হইয়াছে এবং কলিকাতা ও শিল্প কেন্দ্র অঞ্চলের ভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই এবার মানুষের ত্রুটি না হইলে বাঙ্গালায় খাদ্যাভাব হইতে পারে না। যাহাতে মানুষ ত্রুটি করিতে না পারে, তাহাই করিতে হইবে।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বাঙ্গালা সরকারকে "ঘর গুছাইবার" জন্য কয় মাস সময় দিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকার সে কায করিতেছেন? ইতোমধ্যে যে অস্থায়ী গভর্ণর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কি বাঙ্গালায় বর্ত্তমান সচিব সঙ্ঘের স্থিতি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন? নূতন গভর্ণর মিষ্টার কেসী এদেশের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাঁহার আবশ্যক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে বিলম্ব

হইবে। কিন্তু তাহার মধ্যে অবস্থা প্রতীকারাতীত হইতে যে পারে না, তাহা নহে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এখনই বিশেষ সতর্কতাবলম্বন প্রয়োজন।

সচিব সঙ্ঘের গভর্ণরের কার্য্য বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের উপর নির্ভর করা সঙ্গত কিনা তাহা বুঝিতে হইবে।

বিশেষ লর্ড ওয়াভেল ভারত সচিব মিষ্টার আমেরীর মত অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন—খাদ্য সমস্যা প্রাদেশিক সরকারের ব্যাপার নহে ; তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের কায। সুতরাং বাঙ্গালায় যাহাতে আবার খাদ্য-দ্রব্যের অভাব নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত সচিব সঙ্ঘের কার্য্য ফলে আবার দুর্ভিক্ষ না ঘটে, তাহা সময় থাকিতে করা কর্ত্তব্য।

(মাঘ ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষে মৃত্যু

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষজনিত নানা ব্যাধিতে মোট কত লোকের জীবনান্ত হইয়াছে, তাহার কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব সরকার দেন নাই। ভারত-সচিব পার্লামেণ্টে যে হিসাব দিয়াছিলেন, তাহা এতই অসম্ভব যে, তাহা যে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ যে আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে সংগৃহীত হইলেও তাহা দেখিয়া বিলাতী সরকার শিহরিয়া উঠিয়াছেন এবং বিপদ বুঝিতে পারিলে উষ্ট্রপক্ষী যেমনভাবে বালুকায় মস্তক লুকাইয়া মনে করে, কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, সেইভাবে পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন,—বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের যে হিসাবে অনুমিত হয়, বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষজনিত ব্যাধিতে অতিরিক্ত ৩৫ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা যখন ৮টি জিলায় মোট ৮ শত ১৬টি পরিবারে (মোট লোকসংখ্যা ৩ হাজার ৮ শত ৪০) অনুসন্ধানের ফল, তখন তাহা সমগ্র বাঙ্গালার আনুমানিক হিসাব বলা যায় না। কিন্তু সেই সময় যে বৃটিশ সরকারের পক্ষে বলা হইয়াছিল—"এখনও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মৃত্যু তালিকা সম্পূর্ণ হয় নাই"—তখন ইহা ইচ্ছাকৃত সত্য গোপন কিনা, তাহা বুঝা যায় না। কারণ, ২রা মার্চ যখন পার্লামেণ্টে এই কথা বলা হয়, তাহার পূর্ব্বে—২৪শে ফেব্রুয়ারি ভারতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছেল—"খাদ্য সঙ্কটে কলিকাতার ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে মোট মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে সরকারের কোন সংবাদ নাই। বাঙ্গালা সরকার এখন সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। ভারত সচিব যে বলিয়াছিলেন, ১৩ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সে সংবাদ বাঙ্গালা সরকারই সরবরাহ করিয়াছিলেন ;কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছিলেন, ঐ সংবাদ অনুমানমূলক।"

আর কেন্দ্রী[য়] সরকার এই কথা বলিবার ২ দিন পরেই, বাঙ্গালা সরকারের সচিব পক্ষে বলা হইয়াছিল—

(১) স্থানীয় সার্কেল অফিসারদিগের নির্দ্দেশানুসারে মফঃস্বলে সব অনাহারে মৃত্যু (অনাহারে মৃত্যু না লিখিয়া) "অন্যান্য কারণে মৃত্যু" বলিয়া দেখান হইয়াছ কিনা, তাহা সবকার জানেন না।

(২) চৌকীদাররা যে "ফরমে" মৃত্যুর হিসাব রাখে, তাহাতে "অনাহারে মৃত্যুর ঘর নাই" এবং অনাহারে মৃত্যু "অন্যান্য কারণে মৃত্যু" বলিয়া লিখিতে হয়। অনাহারে মৃতের সংখ্যা জানিবার কোন উপায় নাই।

এমন কি চৌকীদারদিগের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টাও সচিবরা করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা যায়, "কেহ কেহ অনাহারে মরিয়াছে"—ইহার অতিরিক্ত সংবাদ বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ লয়েন নাই। আর কেন্দ্রীয় সরকারও সে বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েন নাই।

ফলে মৃত্যুর সংখ্যা অজ্ঞাতই রহিয়া যাইবে। অথচ প্রত্যেক গ্রামে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লোকসংখ্যা কত ছিল তাহার সহিত বর্ত্তমান লোক সংখ্যা তুলনা করিলে সরকার অনায়াসে অনাহার বা অনাহারজনিত ব্যাধিতে মৃতের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন।

সরকার যখন তাহা করিতেছেন না, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগ বিজ্ঞানানুমোদিত পদ্ধতিতে যে হিসাব করিয়াছেন,তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না। নৃতত্ত্ব বিভাগের বিবৃতিতে সরকারী হিসাবের ভুলও দেখান হইয়াছে। নদীয়া জিলার কোন গ্রামে সরকারী হিসাবে গত বৎসর অনাহারে মৃতের সংখ্যা ৭ দেখান হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অনুসন্ধান করিয়া দেখেন—অনাহারে ঐ গ্রামে ৩২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ভুল দেখাইয়া দিবার পর সরকারী হিসাব পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

নৃতত্ব বিভাগের বিবৃতিতে দেখান হইয়াছে, স্থান ভেদে মৃত্যুর হার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম পরীক্ষা করিয়া হিসাব করা হইয়াছে। সেই হিসাবের ফলে দেখা যায়—স্বাভাবিক সময়ে মৃত্যু সংখ্যা যেরূপ হয়, দুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা ৩৫ লক্ষেরও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

এই বিবৃতিতে দেখান হইয়াছে—শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় থাকিতে পারে না। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের ফল আলোচনা করিয়া সার উইলিয়াম উইলসন হাণ্টার দেখাইয়াছেন:—

"দুর্ভিক্ষের পরবর্ত্তী ১৫ বৎসর কাল লোকক্ষয় বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। দুর্ভিক্ষকালে শিশুরাই সর্ব্বাগ্রে অধিক বিনষ্ট হয় এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃদ্ধদিগের মৃত্যু হইলে তাহাদিগের শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার কেহ থাকে নাই।"

দুর্ভিক্ষের পরে যে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের ব্যাপ্তি ঘটে, তাহা জানিয়াও বাঙ্গালার সচিব সঙ্ঘ তাহা নিবারণের কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নাই। অথচ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়াই বড়লাট (৭ই নভেম্বর) যে "রেজলিউশন" প্রচার করেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

"খাদ্যদ্রব্যের অভাবহেতু নানারূপ ব্যাপক ব্যাধির বিস্তার ঘটিতে পারে। কাযেই অভাবগ্রস্ত জিলাসমূহে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য।"

ঐ বৎসর সার বার্টন ফ্রিয়ার লিখিয়াছিলেন:—জ্বর ও নানারূপ ব্যাপক ব্যাধি বিস্তারে মৃত্যুর সংখ্যা দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু সংখ্যারই মত হইতে পারে।

এবার দুর্ভিক্ষের পরে নানারূপ ব্যধির প্রকোপ কিরূপ হইয়াছে, তাহা গত ১১ই জানুয়ারী তারিখে সমর বিভাগের মেজর জেনারেল ডগলাস স্টুয়ার্ট দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

(১) দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষের পরবর্ত্তী ফলে বহু মৃত্যু হইয়াছে। বহু গ্রামে সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতির মৃত্যুতে লোকের জীবনযাত্রা বিঘ্নাভূত হইয়াছে।

(২) ৪০টি যাযাবর চিকিৎসাকেন্দ্রে ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ৩৩ হাজার লোক চিকিৎসিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার ম্যালেরিয়া-পীড়িত।

(৩) কলেরা ও বসন্তও সংক্রামক আকারে দেখা দিয়াছে।

(৪) স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ৪।৫ গুণ অধিক। তিনি যে গৃহেই গিয়াছেন, প্রায় তাহাতেই হয় লোক ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে—নহে ত লোক ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত।

এই সকল বিবেচনা করিলে মনে করা অসঙ্গত নহে—মৃত্যু সংখ্যা স্বাভাবিক সময়ের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা ৫০ লক্ষ অধিক হইবে।

অথচ এবার দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কারণে ঘটে নাই এবং তাহা প্রতীকার সাধ্যই ছিল কেবল মানুষের ত্রুটিতে প্রতীকার সাধিত হয় নাই।

আমরা মনে করি, মৃতের সংখ্যা স্থির করিবার উপায় এখনও আছে এবং যাহারা প্রতীকার করিতে ত্রুটি করিয়াছে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া সেই সংখ্যা স্থির করা সরকারের কর্তব্য।

(ফাল্গুন ১৩৫০)

লজ্জার বিষয়

নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদকের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"দুর্ভিক্ষের পর ব্যাপক রোগের ফলে জনগণের যে দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির সামাজিক জীবননাশের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। বিশেষ আমাদের যে সকল দুর্ভাগা ভগিনী সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থাভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশেষভাবে কষ্টে পড়িয়াছেন। দুর্গতির জন্য বাধ্য হইয়া কেহ কেহ পাপ পথের পথিক হইয়াছেন এবং নানাস্থানে—বিশেষ সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে যৌন ব্যাধির ব্যাপ্তি ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে।"

সচিবরা স্বীকার করিয়াছেন—"লোকে দুর্গত নারীর দুর্গতির সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত করিতেছে—ব্যবসা করিতেছে।" দুর্গতদের জন্য আশ্রয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনও স্বীকার করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহারা বলিয়াছেন—"তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন—সেই নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ হইতেছে কি না বলিতে পারেন না।"

তাহার পর কি হইয়াছে?

ফরিদপুরে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—"মুসলমানদিগের জন্য অনাথশ্রম প্রতিষ্ঠা হইতেছে—হিন্দুদের জন্য পরে তাহা হইবে।" সুবিচার বটে!

বিবৃতি ইংরেজীতে লিখিত। আমরা বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসীকে—যদি তিনি এখনও ইহা না পড়িয়া থাকেন—তবে ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

যে সচিব সঙ্ঘের অবসান সার জন হার্ব্বার্ট ঘটাইয়াছিলেন, সেই সচিব সঙ্ঘ সমুদ্রকুলস্থ স্থান সমূহে দুর্গতদিগকে সাহায্য দিয়া রক্ষা করিতেই ব্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠনের ব্যাপক পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সচিব সঙ্ঘ সেই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করেন নাই, অথচ তাঁহারা বর্ষাধিক কাল সময় পাইয়াছেন। ফলে সমুদ্রকুলস্থ স্থানসমূহের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে।

ইহার পরও কি মিষ্টার কেসী এই সচিব সঙ্ঘকে সমর্থনযোগ্য বলিবেন, যাহাদের কার্য্য সভ্য

সমাজে উল্লেখ করিতে লজ্জা বোধ হয়। এই লজ্জাজনক অবস্থার দায়িত্ব তিনি কাহার বা কাহাদিগের উপর আরোপ করিবেন?

(জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১)

দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব

বাঙ্গালার 'স্মরণকালের মধ্যে শোচনীয়তম' দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব হইতে কেন্দ্রীয় সরকার, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এবং সমাজ কাহাকেও দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন (উডহেড কমিশন) রেহাই দেন নাই। প্রাক ওয়াভেল যুগের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। বৎসরের প্রথম দিকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা যখন ঘনাইয়া আসিতেছিল তখন বাঙ্গালার গভর্ণর ও মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে এবং বিভিন্ন পরিচালক বিভাগ, গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার ছিল অভাব। দুর্ভিক্ষ যখন সত্যই দুয়ারে আসিয়া হানা দিল তখনও গভর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইল না। সমাজও দরিদ্র লোকদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। দুর্ভিক্ষকে মূলধন করিয়া অপরিমিত লাভ করা হইয়াছে। প্রাচুর্য্যের মধ্যে যাহারা বাস করিতেছিল, বহু লোকের অনাহার মৃত্যু সত্ত্বেও ঔদাসীন্য তাহাদের দূর হয় নাই। শাসনযন্ত্রের ন্যায় নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। "পাইওনিয়র" পত্রিকার নয়াদিল্লীস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টের প্রথম অংশের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই দুর্ভিক্ষের উল্লিখিত কারণগুলির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আরও জানা যায়, সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া কমিশন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ যখন সত্য সত্যই দেখা দিয়াছিল তখনও সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার দ্বারা দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিণামকে নিবারণ করা বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা কি দেখিয়াছি? অন্নাভাবে যখন লোকসকল মরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনও বাঙ্গালার তৎকালীন অসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ হয় নাই বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে দেখিয়াছি, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে দুর্ভিক্ষ ঘোষণার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি, বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এ সত্য যখন আর ধামাচাপা দেওয়া গেল না, নাজিম মন্ত্রীমণ্ডলী তখন হক-মন্ত্রিসভার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া নিজেরা সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বমুক্ত হইতে চাহিয়াছেন, বাজারে চাউল না পাওয়ার জন্য দায়ী করিয়াছেন বিরোধী সদস্যদিগকে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন খাদ্যসচিব সার আজিজুল হক ভরসা দিয়াছিলেন, "বাঙ্গালায় এখনও চাউলের অভাব নাই,—সপ্তাহকালের মধ্যে চাউলের দর অনেক কমিবে।" প্রচার সচিব সার সুলতান আহমেদ খাদ্যাভাবকে বিরাট ভ্রান্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কলিকাতার রাজপথে মৃতদেহ পড়িয়া থাকাকে মিঃ কনরান স্মিথ নাটকীয় অতিরঞ্জন বলিয়াই উড়াইয়া দিলেন। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষকে এইভাবে লঘু করিবার চেষ্টাকে শুধু অব্যবস্থিতচিত্ততা বলিয়া স্বীকার করা যায় কি? কেন তাঁহারা এইরূপ লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়া বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষকে ভীষণ হইতেও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কি সত্যই বিবেচনার বিষয় নয়? ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যখন নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিতে চাহিলেন, তখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট

তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন কেন? বস্তুতঃ ঐ সময়ই বাঙ্গালার অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছিল যে, বাহির হইতে খাদ্য আনিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসেই বুঝা গিয়াছিল যে, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ প্রশমনে অসমর্থ হইয়াছেন। সেই সময় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদিগকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কেন গ্রহণ করে নাই? যথাসময়ে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে চাউল ও গম চালান দিবার ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট করেন নাই। আরও অনেক পূর্ব্বে বৃহত্তর কলিকাতায় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করা কি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল না? খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অযথা অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বাঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গঠন করাও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের একটা গুরুতর ভ্রান্তি! বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যেমন অসমর্থ হইয়াছেন, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টও তেমনি দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যায়, কমিশন বঞ্চনা নীতির ফলে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পণ্য চলাচল ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার এবং সম্পদ উপকূল অঞ্চলের ধীবর প্রভৃতি শ্রেণীর বিশেষ কষ্ট হওয়ার কথাও আলোচনা করিয়াছেন। বঞ্চনা নীতি গ্রহণ করার সত্যই কোন প্রয়োজন ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত, রিপোর্ট প্রকাশিত হইলেই আমরা জানিতে পারিব।

সরবরাহ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই এবং কতগুলি ক্ষেত্রে ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য এজেণ্ট নিয়োগ অন্যতম একটি ভ্রান্তি। বস্তুতঃ সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ যদি খাদ্য শস্য ক্রয়ের ব্যবস্থা হইত, বড় বড় উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীদিগকে যদি সমঝাইয়া দেওয়া হইত যে, তাহারা সরবরাহ বন্ধ করিলে সরকার তাহাদের সমস্ত খাদ্যশস্য গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে বাজারে খাদ্য শস্যর অভাব হইত না, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। খাদ্য শস্যের সরবরাহ যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বন্টন করা হয় নাই। কন্ট্রোল দোকান সম্বন্ধে তো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই আছে। বস্তুতঃ দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থায় খাদ্যশস্যের যে সরবরাহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে বন্টন করা হয় নাই বলিয়াই কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতেও অযথা বিলম্ব হইয়াছে। অর্থাভাবের অজুহাতে সাহায্যদান পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়াও সাহায্য দেওয়া যে উচিত ছিল, কমিশনের ঐ অভিমতের সহিত সকলেই একমত হইবেন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনানুযায়ী না হওয়ায় ভয় এবং লোভ বাঙ্গালার খাদ্য পরিস্থিতিকে আরও ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার উপর দুর্নীতির বাতাসে অতিলাভের যে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, দুর্ভিক্ষ কমিশনের মতে তাহাতে ১৫ লক্ষ লোক পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। কি কি প্রমাণ মূলে দুর্ভিক্ষে মৃত্যু সংখ্যা ১৫ লক্ষ বলিয়া কমিশন সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে জানিতে পারিব। কিন্তু রিপোর্টে বলা হইয়াছে, অতিলোভী ব্যবসায়ীরা তবুও চাউলের ব্যবসা হইতেই ১৫০ কোটি টাকা লাভ করিয়াছিল। ব্যবসায়ীদিগকে প্রতি হাজার টাকা অতিলাভ যোগাবার জন্য একজন করিয়া লোককে অনাহারে

প্রাণ দিতে হইয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়ীদের অতিলোভ বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের জন্য যে কতখানি দায়ী তাহা বুঝাইয়া বলা নিস্প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতার দেশ এই বাঙ্গালার ব্যবসায়ীরা 'নাল্পে সুখমস্তি' উপনিষদের এই বাণী উপলব্ধি করিয়া, ''ভুমৈব সুখম্' এই বাণী সার্থক করিবার জন্য অর্থাৎ অত্যধিক লাভ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। সরকারী অব্যবস্থা এবং ব্যবসায়ীদের অতিলোভ মিলিয়া বাঙ্গালায় এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া গেল, কিন্তু যাহারা অর্দ্ধমৃত হইয়া বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

(বৈশাখ ১৩৫২)



শিশুসাথী

সম্পাদকীয়

...এ নববর্ষকে আমরা কিভাবে আহ্বান করব জানি না। যে দেশব্যাপী হাহাকার, অসীম দুঃখ ও বিরাট দৈন্য নিয়ে এবার নববর্ষ এসেছে, হয়ত তারই পিছনে লুকিয়ে আছে সমস্ত শুভ। তবে আমাদের চলতে হবে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে, অর্জ্জন করতে হবে দুঃখ দৈন্য সইবার প্রচণ্ড শক্তি, জীবনের সবকিছু বাহুল্য বর্জ্জন করে চলতে হবে। কাউকে কিছু হেলা করলে চলবে না, তবেই দুঃখ ও দৈন্যের ভিতর দিয়ে আসবে সুখ ও সম্পদ।...

(বৈশাখ ১৩৫০)

...বাংলার অন্ন সমস্যা এখন পর্য্যন্ত বিশেষ জটিল রয়ে গেছে। অবশ্যই সরকার সমস্যার সমাধানের জন্য মজুদ খাদ্য শস্যের পরিমাণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করছেন, এবং এজন্য ঘরে ঘরে খাদ্য অনুসন্ধানের বিরাট ব্যবস্থাও হয়েছে, কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হবে কিনা, এ বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করছেন।...

(আষাঢ় ১৩৫০)

...বাংলার খাদ্য সমস্যা আগামী তিন মাসে বিশেষ জটিল হবে বলে সরকার আশঙ্কা প্রাকাশ করছেন। তার লক্ষণ তো চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। তবে বিভিন্ন শহরের স্থানে স্থানে লঙ্গরখানা স্থাপন করে সরকার হতে দরিদ্রদিগকে খাদ্য বিলাবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এতো সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মতো, গ্রামে গ্রামে এ ব্যবস্থা প্রসারিত করা দরকার। এ বিষয়ে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়।...

(ভাদ্র ১৩৫০)

...বাংলায় আজ অন্নাভাব দারুণ হয়ে উঠেছে, এর পরিণতি যে কোথায় দাঁড়াবে কে জানে!...

(আশ্বিন ১৩৫০)

...বাংলার এক ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে আমরা এবার পূজাবকাশ নিলুম। দারুণ দুর্ভিক্ষ আজ সোনার বাংলাকে তিলে তিলে গ্রাস করছে। বাংলার চারিদিকে আজ দেখা যায় শুধু অনশন ক্লিষ্ট নরনারীর কঙ্কালবিশিষ্ট দেহ, শোনা যায় তাদের করুণ আর্ত্তনাদ, সেই ক্ষীণ কণ্ঠটুকুও স্তব্ধ হয়ে যায় মৃত্যুর তুষার শীতল স্পর্শে! এই তো বাংলার রূপ আজ।

এর মধ্য দিয়ে মা আসবেন এবার বাংলায়। আনন্দময়ী তিনি, তিনিই জানেন এ শ্মশানে কি আনন্দ তিনি পাবেন,—কি আনন্দ তিনি মুমূর্ষু সন্তানদের বিলিয়ে যাবেন!

আশাবাদী আমরা—তাই এ করুণ প্রার্থনা মায়ের পায়ে জানাচ্ছি,—সম্বরণ করুন তিনি এই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রী তিনি, বাংলাকে তিনি রক্ষা করুন, বাংলার সোনার ছেলেমেয়েদের তিনি অভয় মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুলুন! মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাক বাংলার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা! বাংলা আবার শস্য সম্পদে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে উঠুক!...

(কার্তিক ১৩৫০)

...যে গুরুতর পরিস্থিতির ভিতর দিয়া আমরা চলেছি, তাতে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া তো দূরের কথা, কায়ক্লেশে বেঁচে থাকাই একটা মস্তবড় সমস্যা। বাস্তবিক এই পূজাবকাশের ভিতর বাংলা-মায়ের কত আদরের দুলাল যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে তার সমস্ত সংখ্যা আজ পর্য্যন্তও নির্ণয় করা যায় নি।

এর ভিতরে লর্ড লিনলিথগোর স্থলে লর্ড ওয়াভেল বড়লাট হয়ে বসেছেন এবং নিজে কলকাতার অবস্থা দেখেও গিয়েছেন। সেই প্রাসাদ-নগরীর শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি ছোটখাটো শহর ও পল্লী অঞ্চলের অবস্থা বুঝে নিতে পেরেছেন। তার শুভচেষ্টার একটু ফল এরি মধ্যে দেখা যাচ্ছে।...

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

শনিবারের চিঠি

সংবাদ সাহিত্য

১৩৫০। অন্নবস্ত্রের অভাব ইতিমধ্যেই ভীষণ হইয়াছে, এই বৎসরে তাহা হয়তো ভীষণতর হইবে, আমাদের জাগতিক দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না, আত্মীয়-বান্ধবের বিয়োগ-দুঃখ দিন ও রাত্রির মত আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটিও আমরা যেন মনে রাখিতে পারি যে, এই সকল অভাব দুঃখকে অতিক্রম করিবার শক্তি আমাদের মধ্যেই আছে। যে দানব আমাদের মৃত্তিকাগর্ভে গোপনে আশ্রয় লইয়া আমাদের জীবন জলধারা শোষণ করিয়া লইতেছে, সেই দানবকে তাহার গোপন আশ্রয় হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হনন করিতে হইবে। সে আজ আমাদের কল্যাণের মুখোশ পরিয়া আমাদের মাঝখানেই বসিয়া আছে, তাহার আপাত মনোহর কাজে আমাদেরই ভুল হইতেছে, উদঘাটন করিতে হইবে তাহার স্বরূপ—১৩৫০ বঙ্গাব্দে আমাদের তাহাই কাজ। ওঠ, জাগো, শ্রেয়কে বরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রদ্ধেয়কে নিধন কর।

(বৈশাখ ১৩৫০)

যক্ষরূপী ধর্ম্মের "আশ্চর্য্য কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, জীবগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাইতেছে ইহা দেখিয়াও মানুষেরা যে নিজেদের অমর ভাবে ইহাই আশ্চর্য্য। মহাভারতের পাঠকেরা জানেন, যুধিষ্ঠির এই উত্তর দিয়া ফুল মার্কস পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য্যের চরমতম প্রকাশ বর্ত্তমানকালে আমাদের চারিদিকে যেমন দেখিতেছি, তেমনটি আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। গবর্মেণ্ট স্বীকার না করিলেও আমরা অনুভব করিতেছি, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ভয়াবহ মূর্ত্তিতে প্রতিদিন আত্মপ্রকাশ করিতেছে; অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা প্রত্যহ বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, দেশের অবস্থা যেরূপ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে বোধ ১৩৫০-৫১ [যদ্দৃষ্ট] সালের মন্বন্তর ভয়াবহতায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকেও ছাড়াইয়া যাইবে। আকাশে বাতাসে তাহার আভাস পাইতেছি—মৃত্যুদূতেরা তাহাদের করালদ্রংষ্ট্র বাহির করিয়া আমাদেরই আশেপাশে ওত পাতিয়া আছে; আমাদেরই অন্ততঃ শতকরা পঁচিশ জন যে তাহাদের কবলে পড়িব, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। চেতাবনীকথিত কলিযুগ সমাপ্তি, এবং সত্যযুগার্বিভাব লইয়া যতই হাস্য পরিহাস করি না কেন, অপরিমিত মৃত্যুস্নানের মধ্যে যে একটা যুগশোধন হইতে চলিয়াছে, তাহতে সন্দেহ নাই।

(শ্রাবণ ১৩৫০)

দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ ঃ—

৩১ শ্রাবণ,১৩৫০,মঙ্গলবার,"কলিকাতা রাজপথে মুমূর্ষুব্যক্তি: ষাটজন হাসপাতালে স্থানান্তরিত ঃ চারিজনের মৃত্যু ও অধিকাংশের অবস্থা আশঙ্কাজনক।"

১লা ভাদ্র, ১৩৫০, বুধবার, "মঙ্গলবার ক্যাম্বেল হাসপাতালে এবং এ. আর. পি. হাসপাতালে মোট ৮১জন অনশনক্লিষ্ট রোগীকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। ক্যাম্বেল হাসপাতালে মঙ্গলবারে ৯ জন অনশনক্লিষ্ট রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। বেহালা এ. আর. পি. হাসপাতালে আরও ১ জন মারা গিয়াছে।"

১লা ভাদ্র, ১৩৫০ বুধবার, "মাদারীপুর, ১৫ই আগষ্ট—গত তিন সপ্তাহে রাস্তায় ৫০টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, এগুলির কেহ দাবীদার ছিল না।"

২রা ভাদ্র, ১৩৫০, বৃহস্পতিবার, "১৮ই আগষ্ট, ১১ জন হাসপাতালে নীত, ৯ জনের মৃত্যু।'

(ভাদ্র ১৩৫০)

ডক্টর আর শ্যামশাস্ত্রী-অনুদিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একটি প্রসিদ্ধ বই। ইহার চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় "জাতীয় সর্ব্বনাশের প্রতিকার" সংক্রান্ত। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ দিতেছি ঃ

"ঈশ্বরের অভিশাপ নানাভাবে একটি দেশের উপর বর্ষিত হইতে পারে—অগ্নি, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ।...

"দুর্ভিক্ষের কালে রাজা শস্যবীজাগার ও খাদ্য ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রজার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন।

"সর্ব্বনাশ-সমুৎপন্নে যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহা সকলই করিবেন; নিজ সঞ্চয় বণ্টন করিবেন; প্রজাদের মধ্যে যাহারা ধনী তাহাদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ প্রজাসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিবেন অথবা প্রয়োজন হইলে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

"অতিরিক্ত কর চাপাইয়া কর্ষণ-রীতির প্রয়োগে অথবা পীড়ন করিয়া দমন-রীতির দ্বারা ধনীদের অস্বাভাবিক স্ফীতি হ্রাস করাও চলিতে পারে।"

ঈশ্বর না করুন, আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে যদি সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে এখানকার ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিভূ সার জন হার্বার্ট, বর্ত্তমান রাজপ্রতিভূ সার টমাস রাদারফোর্ড, খাজা নাজিমুদ্দিন, মিঃ ইস্পাহানী প্রভৃতিকে এক এক খণ্ড কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র খরিদ করিয়া দেওয়া যাইবে তো। বালাই, মিথ্যা ভাবিতেছি—সোনার বাংলায় এরূপ ঘটিবে কেন?

(আশ্বিন ১৩৫০)

বাংলাদেশের সর্ব্বত্র শহর এবং মফস্বলে দুর্ভিক্ষপীড়িত ও অনাহারক্লিষ্ট দুর্গতজনগনের সাহায্যার্থ শতাধিক আর্ত্তত্রাণ সমিতি খুব নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতেছেন। ভারতবর্ষের চারি প্রান্ত হইতে প্রত্যহ হাজারে হাজারে এবং লাখে লাখে টাকা আসিতেছে ;পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশের ধনী ব্যক্তিরা আশ্চর্য্য তৎপরতা দেখাইতেছেন। ভারতবর্ষের বাহির হইতেও সাহায্য আসিতেছে। এই দুর্দ্দিনে মানুষের হৃদয়ের সৎবৃত্তিগুলি যে অনেক ক্ষেত্রেই অবিকৃত আছে, ইহা অত্যন্ত আশার কথা। মনে হইতেছে, মানুষের করুণার দৃষ্টি যেভাবে আমাদের উপর পতিত হইতেছে, তাহাতে

আমাদের ক্ষতি খুব অধিক এবং ক্ষত খুব গভীর না হইতেও পারে। ইতিপূর্ব্বে বাংলাদেশে যে সকল মন্বন্তর ঘটিয়াছে তাহার মুদ্রিত ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিতেছি—স্বদেশীয় সাহায্যই শেষ পর্যন্ত চরম ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিল, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ঐতিহাসিকের দোষ এই যে, ইহারা শতাধিক বর্ষ পরে সত্য কথা বলেন। আমাদের এই যুগের ইতিহাস যখন এক শত বৎসর পরে ইংরেজ ঐতিহাসিকই লিখিবেন, তখন আমরা দেখিতে পাইব, দুই-চারিজন পাপিষ্ঠ মিরজাফর ও রেজাখাঁয়ের সাহায্যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিই অপরিমিত লাভ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বাংলাদেশের জনসাধারণকে কৌশলে দোহন ও শোধণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই মৃত্যুকে রোধ করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট অগ্রসর হইয়া আসেন নাই, সমগ্র দেশের প্রাণ কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সমাজ অথবা কয়েকজন মহৎ লোককে কেন্দ্র করিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া অবাধ মৃত্যু কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সত্য ইতিহাস জানিবার জন্য আমরা বাঁচিয়া থাকিব না।

★ ★ ★

তাই বর্ত্তমানের বিচার আমরা অতীতের সাহায্যে করিতে চাহিতেছি। এদেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলিতে দেখিতে পাইতেছি, পুরাতন "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"কে বারংবার টানিয়া আনা হইতেছে। গত ভাদ্রের মাসিক বসুমতীতে প্রধান সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে"র বিস্তৃত বিবরণ (পৃ. ৪৩২-৪৪০) বিশেষ মুন্সিয়ানার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন; 'কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটে'ও শ্রীযুক্ত অমল হোম অনেক পুরাতন তথ্য আমাদিগকে শুনাইতেছেন ;কিন্তু নূতন মৃত্যুর চিত্র-প্রতিলিপির পাশে এই সকল পুরাতন কাহিনীর কি কোনও দাম আছে? আজিকার বাস্তব ঘটনার সহিত সেই পুরাতন ইতিহাসকে পাশাপাশি রাখিয়া ইহাই লজ্জার সহিত অনুভব করিতেছি যে, আমাদের কাপুরুষতা ও অসহায়তা বিগত দুই শত বৎসরেও বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই ; ক্ষমতাপন্নদের বর্বর শোষণ-প্রবৃত্তি অক্ষুণ্ণ আছে, যাহা ঘটিয়াছিল তাহা যখন আবার ঘটিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের স্বর্গীয় ঘোষণা বিফলে গিয়াছে, কোহিনুর কল্পিত ময়ূর-সিংহাসনে বসাইয়াও ভারতবর্ষ জামাইকে ঘর-জামাই করিতে পারে নাই।

পুরাতনকে টানিয়া আনিয়া লাভ কি? আজও ইংলন্ডের 'নিউ স্টেট্স্ম্যানে'র কণ্ঠে জন শোরের (পরে সার্ জন শোর এবং লর্ড টেন্‌মাউথ) কাব্যোচ্ছ্বাস শ্রুত হইতেছে। এ দেশের সংবাদপত্রেও শুনা যাইতেছে—

If you ask a Britisher what is on the debit side in the Pacific zone of this war he will tell you the loss of Malaya with its rich rubber estates, its prolific tin mines, the probable loss of the Naval Base, the sinking of the Prince of Wales, if you ask an American he will say the devastation that was wrought at Pearl Harbour, if you ask a Burmese he will acclaim the oilfields of Burma not to mention the ruby mines ; if you ask an Indian there can be only one reply–the loss of life. Lives not slain swiftly and mercifully, on the battle-field but taken away in a lingering the terrible death through starvation–

through the loss of rice to India from the Aracan coast...When it comes to squaring accounts...India will have the heaviest bill to present...bill of flesh and blood...The life of innocents. Rubber trees can be grown again. New sources at tin, oil and rubies can be explored but men, women and children who are daily dying in the streets at Calcutta and in Bengal cannot be resurrected when the shining hour of victory is trumpeted.

Strange! Bengal steeled itself for air-raids. It was prepared for the worst and then-overtaken by femine. Lack of food is taking a daily toll of more deaths than what it would be possible for Japan to take with her deadliest bombs. Think this over!

★ ★ ★

ইহাই বর্ত্তমানের কথা এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবের কথা। এই বাস্তবকে বিস্মৃত হইয়া দুই শত বৎসর পিছু হাঁটিয়া আমরা কি ইহা অপেক্ষা বীভৎসতর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে পারিব? আসল ঘটনার এক শতেরও অধিক বর্ষকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনানেত্রে সেদিনকার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন...

দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়াব মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। তখন সেইরূপ আর একটি ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আর একটি আসিল। তারপর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহাবা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়-অন্ধকার গৃহ। নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

আমরা আমাদের আবাস গৃহের সম্মুখে, কলিকাতার অলিতে গলিতে প্রত্যহ নিশাগমে এই দৃশ্য দেখিতেছি ;কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা মরিবার জন্য সমবেত হইতেছে, বাঁচিবার জন্য নয়।

★ ★ ★

কিন্তু মানুষ অক্ষম হতভাগ্য ও ঘৃণ্য হইলেও তাহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করাটা কোনও গবর্মেণ্টের পক্ষেই বুদ্ধি মানের কাজ নয়। যে মনস্বী এডমাণ্ড বার্কের সুযুক্তিপূর্ণ সতর্কবাণী সময়ে না শুনিয়া ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুতাপ করিতে হইয়াছিল, তিনি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে উইলিয়ম পিটের নিকট প্রেরিত বিখ্যাত বিবৃতির প্রারম্ভে লিখিয়াছিলেন—

Of all things, an indiscreet tampering with the trade of provisions is the most dangerous and it is always worst in the time when men are most disposed to it: that is, in the time of scarcity.

এই বিবৃতি তিনি শেষ করিয়াছিলেন এই বলিয়া—

Tyranny and cruelty may make men justly wish the downfal of abused powers, but I believe that no government over yet perished from any other direct cause than its own weakness. My opinion is against an over-doing of any sort of administration, and more especially against this most momen-

* তৃতীয় বন্ধনী [] মূলানুগ।

tous of all meddling on the part of authority ; the meddling with the subsistence of the people.

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাহাই হউক, বিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে বার্কের উপদেশ স্মরণে রাখিয়াই বাংলাদেশ সম্বন্ধে হয়তো ব্যবস্থা করিতে পারেন। বাংলাদেশে সত্যকার দুর্দ্দশা কতখানি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া দিতেছি ঃ—

বর্তমানে পৃথিবীর এই যুদ্ধকালীন রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় বিয়োগান্ত নাটক এখানে [ভারতবর্ষে]* অভিনীত হইতেছে। অভিনয় করিতেছে এই কৃষ্ণকায় বিশীর্ণ শবেরা—অনাহার জনিত নির্ম্মম মৃত্যুর যন্ত্রণায় ইহাদের মুখমণ্ডল বিকৃত।... ইহাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যু সংবাদপত্রের শিরোনামায় একটি সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি মাত্র এবং হয়তো ওই একই স্তম্ভে আর একটি ফুড কনফারেন্সের বিবরণী ঘটা করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। দৈনিকের বিবরণী সচরাচর অত্যন্ত অতিরঞ্জিত এবং অতিবর্ণিত হইয়া থাকে ; কলিকাতার দুর্দ্দশার যে বাস্তব চিত্র ইহারা অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা এতই ভয়াবহ যে, আমার ভারত ভ্রমণকালে আমাকে সর্ব্বত্রই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে—যাহা বর্ণিত তাহা সত্য কিনা। সত্য তো বটেই, আসল অবস্থা বর্ণনাকেও পরাস্ত করে।...কলিকাতার রাস্তাসমূহ ক্ষুধিত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদের দ্বারা আকীর্ণ। ইহারা সাধ করিয়া কেহই শহরে আসে নাই। শূন্য উদর ইহাদিগকে তাড়া করিয়া আনিয়াছে। তাহারা অর্থ চায় না, খাদ্য চায়। অর্থের আর খরিদ ক্ষমতা নাই। আমি ৩০ জুলাই তারিখে কলিকাতা ত্যাগ করি। শুনিলাম ১লা সেপ্টেম্বর হইতে খাদ্যদ্রব্যের উপর কন্ট্রোল বসিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র বাজার হইতে চাউল শূন্যে সম্পূর্ণ অন্তর্ধান করিল—রাতারাতি এই ব্যাপার ভারতীয় রোপট্রিককেও (দড়ির খেলা) হার মানাইয়া দেয়। শনিবার যে বস্তু প্রচুর পরিমাণে ছিল, রবিবারে সে বস্তু এককণাও ছিল না। গেল কোথায়?... ইহা যে মজুদ বিশারদদের কীর্ত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মজুদের ব্যাপারটাই এই প্রশ্নের পুরা জবাব নয়। ইহা গবর্ণমেণ্টেরও সেফ্‌টিভালভ—গবর্ণমেণ্ট কি ইহার ব্যবহার না করিয়া ছাড়িয়াছেন?

It (Hoarding) is a good unloading platform for Government's sins of omission and commission. The pity is that the food question has developed into a paramount political question (which it should not be). It is the shuttlecock of politics. Every move in the foodgame in Bengal is a political move. *The chessboard in the jutefields of Bengal. The pawns are the starving people.*

কলিকাতা আজ বহু বিচিত্রের (পরস্পরবিরোধী) সমন্বয় ক্ষেত্র। একদিকে দেখ, ক্ষুধার তাড়নায় মুমূর্ষু শত শত লোক ফুটপাথে পড়িয়া আছে, অন্যদিকে ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রেস্তরাঁয় প্রবেশ কর—ত্রিশপদী ডিনারের পদগুলি হইতে রুচিমাফিক ডিশ বাছাই করিতে তুমি হয়রাণ হইবে। হোটেলের মালিকরা বিনীতভাবে নিবেদন করিবেন, ত্রিশের অধিক ডিশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই—যুদ্ধের বাজার কিনা। এরূপ অবস্থা শোচনীয়। বিহার এবং কোয়েটার ভূমিকম্পেও মানুষের এত দুর্দ্দশা হয় নাই। সেক্ষেত্রে মৃত্যুর যন্ত্রণা ক্ষণস্থায়ী ছিল। দীর্ঘকাল স্থায়ী তিলে তিলে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু অপেক্ষা তাহা ভাল ছিল।

★ ★ ★

উপরে লিখিত সুগভীর চিন্তাজালে আচ্ছন্ন ছিলাম, হঠাৎ গোপালদার আগমনে চমক ভাঙ্গিল। খুব উত্তেজিত ভাব—একটা যেন যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়াছেন। মুখচোখ প্রদীপ্ত। আসিয়াই আমার স্বল্পপরিসর পিঠে একটি বিরাট থাবা মারিয়া বলিয়া উঠিলেন, ছেড়ে দিয়ে এলাম গোলামি, এ সরকারের চাকরি আর করব না।

বিপন্ন বোধ করিলাম, গোপালদা এ. আর. পি.তে থাকার দরুণ তবু চালটা-আটাটা কন্ট্রোল মূল্যে পাওয়া যাইত, আবাব কি তবে কলির নরক— কিউয়ে দাঁড়াইতে হইবে?

গোপালদার যেন কি হইয়াছিল। আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া পকেট হইতে দুটি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ খেলার মার্বেলবৎ বর্ত্তুলাকৃতি পদার্থ বাহির করিয়া একটি আমার হাতে দিলেন এবং নিজে একটি হাতে লইয়া আমার বালক ভৃত্যকে দুই গ্লাস জল আনিতে বলিলেন। জল আসিলে নিজের গুলিটি মুখে পুরিয়া জল খাইতে খাইতে আমাকে অনুরূপ প্রক্রিয়া করিতে বলিলেন।

আমার প্রশ্নাতুর দৃষ্টি গোপালদাকে চকিতে সচেতন করিয়া দিল, বলিলেন, গায়ে স্বাধীনতার বাতাস লাগল ভায়া, তাই একটু সেলিব্রেট করলাম। খেয়ে দেখ, আনন্দ পাবে। আনন্দ পূর্ব্বেও পাইয়াছি, সুতরাং আপত্তি করিলাম না।

গোপালদা কোটের বুক পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ এবং আর এক পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিতে পরিতে বলিলেন, একটা কবিতাও লিখে ফেলেছি আজকে— শেষ হয়নি, যতটুকু লিখেছি শোন।

★ ★ ★

গোপালদা পড়িতে লাগিলেন, ভৃত্য চা ও কিছু মিষ্টান্ন আনিয়াছিল, আমি সেগুলির সদ্গতি করিতে করিতে শুনিতে লাগিলাম—

মৃত্যু যেথা বরণীয়, পরাধীন কলঙ্কিত দেশে
সেথায় অন্যের দ্বারে মোরা নিত্য অন্ন ভিক্ষা মাগি ;
হে দেবতা, ক্ষমা কব, আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় ;
ক্ষমা কর মোহগ্রস্ত, আতঙ্কিত, দিগ্‌ভ্রান্ত জনে।
যুগ-যুগান্তর ধরি অভিশপ্ত জীবন মোদেব ;
স্বাধীনতা-অপহারী বিদেশীর পদতলে বসি
আমরা লয়েছি পাঠ মৃত্যুধর্ম্মী নব সভ্যতার।
আমাদের বক্ষপীঠে তাহাদের সিংহাসনখানি
সযত্নে ধরিয়া আছি ; বহু প্রেমে করি যে লালন
মেদমজ্জামাংস দিয়ে আত্মসুখপরায়ণ জনে।
আপনা বিস্মৃত মোরা, দাসত্বের বিভীষিকা আজো
অহিফেন-মুগ্ধ চিত্তে তোলে না শঙ্কিত শিহরণ :
দাসত্বেরি গর্ব্ব করি—বিজাতীয় আত্মপ্রতারণা!
যে শিক্ষা মানুষে টানে তিলে তিলে পাতালের পানে,
সে শিক্ষার অভিমানে আত্মহারা শিখেছি আমরা
ঠেলিয়া ফেলিতে দূরে নিজ জনে ঘৃণ্য তিরস্কারে।

আপন ঐতিহ্য-গর্ব্ব ভুলে গিয়ে পরের নকলে
মানুষে মানুষে ভেদ গ'ড়ে তুলি নব পদ্ধতিতেঃ—
জাতির ঐশ্বর্য্য যারা তিলে তিলে করিয়া লুণ্ঠন
মুদ্রিত মুদ্রার লোভে সারা দেশে করিয়া সঞ্চার
কিনিয়া করিছে পঙ্গু কর্ম্মক্ষম সকল মানুষে ;
সবল সতেজ প্রাণ শাসনের নিষ্পেষণ তলে
আইনের বেড়া-পাকে যারা করে নিষ্প্রাণ প্রত্যহ—
তাহাদের প্রাণশক্তি আমরাই যোগাইয়া চলি
আত্মক্ষয়ে আত্মবঞ্চনায়। আমরা পরান্নজীবী—
আপনার গৃহে বসি পরের উচ্ছিষ্ট খুঁটে খাই—

বুঝিলাম গোপালদার ব্যথাটা জোর বাজিয়াছে। মনে মনে হাসি পাইল, তবু গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলাম, থামো থামো, গোপালদা, এ ডাহা সিডিশন হচ্ছে। ব্যাপারটা কি বল তো? ভাগে বনল না বুঝি ওই কবীরউদ্দীনের সঙ্গে?

গোপালদা কোন জবাব দিলেন না, চায়ের পেয়ালাটা ডিস হইতে মুখে তুলিলেন। এই পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিলাম। হঠাৎ সদর দরজার কাছে ব্যথিত নারীকণ্ঠের "ওগো বাবু, আজ তিনদিন কিছু খাই নি গো" বিলাপধ্বনি কানে আসিল। তাহার পরই কেমন যেন বিপর্যয় হইয়া গেল। গোপালদাকে আর দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার স্থলে সহস্র শিখায় প্রজ্জ্বালিত একটি অগ্নিকুণ্ড দৃষ্টিগোচর হইল। তাজ্জব ব্যাপার, সদর দরজার ভিখারিনী পাখা গজানো পিপীলিকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই কুণ্ডের দিকেই আগাইয়া আসিতেছে দেখিলাম। সে একা নয়, তাহার পশ্চাতে এক, দুই, দশ, বিশ, হাজার লক্ষ পিপীলিকা, সদ্য উদ্গত পাখায় ভর করিয়া পঙ্গপালেব মত আকাশে উড়িতেছে, সমবেত পক্ষধ্বনিতে একটা গুঞ্জন উঠিয়াছে।

এই পিপীলিকা-যজ্ঞের আয়োজন আমার ভাল লাগিল না। আমার চক্ষের সম্মুখে এই লক্ষ লক্ষ প্রাণী পুড়িয়া মরিবে, আর আমাকে তাহা চুপ করিয়া দেখিতে হইবে? আমি চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে গেলাম।

★ ★ ★

গোপালদার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। বলিলেন, মরিতে দাও ভায়া। না ম'রে ওদের উপায় আছে? যে কোটর থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছে, সে কোটরে আর ওরা ফিরে ঢুকতে পারবে না। ওদের মরতেই হবে।

মরতেই হবে! তা হ'লে এত রিলিফ, এত লঙ্গরখানা, এত—

অন্তর্জ্জলীর আহার ভাই, তোমাদের দয়া ধর্ম্মটাই অক্ষয় হয়ে থাকবে, এরা বাঁচবে না।

বাঁচবে না?

কদিন ভিক্ষা-অন্নে বাঁচিয়ে রাখবে এদের? ঘরের ঠিকানা হারিয়ে তবে বাইরে বেরিয়েছে। বেরিয়েছিল অনেকেই, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পরস্পর, পাখা খ'সে দেখ অনেক ওই ধুলোয় দাঁড়াচ্ছে, আগুনে পুড়ে মরছে কয়েকটা। অন্ধ হয়ে গেছে চোখ। ফেরবার উপায় নেই।

তা হ'লে—

★ ★ ★

বসিয়া বসিয়া ছবি দেখিতেছি। দিগন্ত প্রসারী মাঠ, চাষের ক্ষেত। বর্ষা উত্তীর্ণ হয়, তবু জমিতে লাঙ্গল পড়ে নাই, আগাছা জন্মিয়াছে। চাষ করিবার মানুষ নাই। মানুষ যাহারা আছে, তাহারা ললাটে করাঘাত করিতেছে। তাহাদের 'নাস্তা' আনিবার লোক হারাইয়াছে। চাষ করিবে? কাহার জন্য? বাড়ি ফিরিলে বাচ্চাটা দুইটি কচি হাত প্রসারিত করিয়া কাছে ডাকিত। কোথায় সে? গরু নাই। লাঙ্গল নাই। ফসলের প্রয়োজন কি?

মানুষের অবহেলায় ভূমি বিমুখ হইয়া আছেন, যত্ন করিয়া মাটির অভিমান ভাঙাইবার লোক নাই। শুধু কি নিজেদেরই আহার্য্য প্রার্থনা করিত তাহারা? তোমার আমার রামের শ্যামের। সংসারের চোরাবালিতে তাহারা কোথায় তলাইয়া হারাইয়া গিয়াছে। তোমার আমার রাম শ্যামের কি হইবে? এক বৎসর-দুই বৎসর—

★ ★ ★

একটা "ল পয়েণ্ট" লইয়া বিচার চলিতেছে। জজেরা সকলে গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন। রেসের ঘোড়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে জখম হইলে তাহকে গুলি করিয়া মারা হয়। ভবিষ্যতে ক্ষেপিতে পারে, এই ওজুহাতে কুকুরকে ঠেঙাইয়া মারিতেও দেখিয়াছি। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, ওই ভাবে প্রাণী হত্যায় যদি পাপ না থাকে, যে মানুষ নিশ্চিত মরিবে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলে পাপ হয় কেন? শেষ পর্য্যন্ত অঘটন ঘটিতে পারে বলিয়া? সম্মুখের দলটাকে মারিবার হুকুম দাও হুজুরেরা, পিছনে যাহারা রহিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করি। যাহাদের নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য অকারণে শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করিবার সময় এ নয়। বিস্তর মানুষ এখনও অর্দ্ধমৃত হইয়া আছে। দোহাই তোমাদের, মুমূর্ষু মানুষকে ঠেঙাইয়া অথবা গুলি করিয়া মারিলে যে অপরাধ হয় না, বরঞ্চ পুণ্যই হয়—এই সহজ কথাটা আইনের ভাষায় আমাদিগকে বলিয়া দাও। দেখ, এই দুর্ভিক্ষ আমরা নিবারণ করি। যাহা বিলম্বে ঘটিবে, তাহাই অবিলম্বে ঘটাইবার অধিকার দাও। সময় সংক্ষেপ কর প্রভুরা।

★ ★ ★

কাহারা কোথা হইতে চিৎকার করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছিল, বুঝিতে পারিলাম না। কেমন একটা অজ্ঞাত অস্বস্তিকর ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। গোপালদা সামনে বসিয়া, তাঁহার চা পান তখনও শেষ হয় নাই।

গোপালদা বলিলেন, একটা রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি খুলেছে, দেখেছ কাগজে? সমস্ত বাংলা দেশজুড়ে যে যে সমিতি কাজ করছেন, তাঁদের কাজ যাতে এলোমেলো হয়ে না যায়, এক জায়গায় মাত্রাধিক এবং অন্যত্র নামমাত্র সাহায্য যাতে না প্রেরিত হয়, এই সব ব্যবস্থা এই কো-অর্ডিনেশন সমিতি করিবেন। যে রকম ভাবে টাকা আসছে এবং যে রকম ভাবে নানা খ্যাত ও অখ্যাত প্রতিষ্ঠান এই কাজে এগিয়ে আসছেন তাতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে।

আমার কানে এসব কথা কিছুই যায় নাই। আমি গোপালদা প্রদত্ত ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মার্বেলাকৃতি পদার্থের কথা চিন্তা করিতেছিলাম।

(কার্তিক ১৩৫০)

এই ১৩৫০ বঙ্গাব্দের সূত্রপাত হইতে যে মহামন্বন্তর বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে দেখা দিয়াছে, তাহার চরম পরিণতি আমরা এখনও প্রত্যক্ষ না করিলেও এই ব্যাপক

মৃত্যু, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত আমরা কি দেখিলাম? দেখিলাম—ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের শুভপ্রভাবে ভারতীয় জনগণের মহনীয় অহিংস রূপ। প্রাচীন উপনিষদ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের বুদ্ধ ও জৈব ধর্ম্মের পার্শ্বনাথ মহাবীর প্রমুখ জৈনগণের বাণী, উড়িষ্যা-বাংলার চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং বিংশ শতাব্দীর মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ ভারতের সাধারণ নিম্নস্তরের লোককেও প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের এমন একটি উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছে, যাহা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি সম্ভব হয় নাই। এখানেই ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব। আমাদের সাধনা অতীত ও অজ্ঞাত, কিন্তু বর্ত্তমান সিদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া পৃথিবীর আধুনিক সকল সভ্য জাতিই বিস্ময়বিমূঢ় হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত যে সকল সুসভ্য জাতি পার্থিব শক্তিতে অপরিমেয় শক্তিশালী হইয়া অবিশ্রাম যুদ্ধ বিগ্রহ রক্তপাতের মধ্যে নিমগ্ন আছে, তাহারা ভবিষ্যৎ শান্তির কামনাতেই এরূপ করিতেছে। তাহাদের চরম লক্ষ্য পরিণামে পরস্পর অহিংসা। যে নিদারুণ জাতি বৈরের প্রদাহে তাহারা নিরন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, তাহা কল্যাণকর তো নহেই ; পরন্তু ঘৃণ্য, হেয় ও বর্জ্জনীয়—একথা তাহারা কাজে স্বীকার না করিলেও মুখে স্বীকার করিতেছে, ও সে তত্ত্বকে সত্য জানিয়াও জীবনে মানিতে পারিতেছে না, তাহাকে সম্মান দিবার জন্য তাহারা লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কবি বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকের মত শান্তিমন্ত্রের উপাসকেরাও নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। বারংবার সমবেত প্রাণ-বলিদানের দ্বারা শান্তি-প্রতিষ্ঠায় অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত ইহারা করিতেছে এবং হিংসামূলক মৃত্যুর মধ্যে অহিংসাবাদকে ইহারা জয়যুক্ত করিতেছে। মনীষী টলস্টয়, কার্ল স্পিট্‌লার ও রম্যা রলাঁ হিংসার নিরর্থকতা প্রচার করিয়া খ্যাত হইয়াছেন। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, ভারতের জগতে হিংসা অনুসৃত হইলেও অহিংসাই আদর্শ।

★ ★ ★

ভারতবর্ষের কথা স্বতন্ত্র, এখানকার অহিংসাবাদের বনেদিয়ানা বিরাট, ভিত্তি সুগভীর। নিখিল জগতের কাম্য অহিংসা আমাদিগকে সকল প্রলোভনের মধ্যেও শুষ্ক শান্ত অপাপবিদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে। পৃথিবীর কুত্রাপি এমনটি আর ঘটে নাই। গত মাসাধিককাল মধ্যে বাংলাদেশে তাহার সহস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অন্য সকল দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী অজ্ঞানী, স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর মানুষ ক্ষুধার্ত্ত হইলে পরদ্রব্যে লোভ করে, উত্তেজিত এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্মত্ত হইয়া হাঙ্গামা বাধায়, তাহাদিগকে ঠেকাইতে গিয়া রক্তপাত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু এই মহামন্বন্তরের মধ্যেও বাংলা দেশে আমরা কি দেখিলাম! অহিংসার অপূর্ব্ব অভাবনীয় মহিমা! ধন্য আমাদের মহাপুরুষগণের শিক্ষা, ধন্য আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি! ক্ষুধায়, অনাহারে, এক-আধজন নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ তিলে তিলে নির্জ্জীব ও অসাড় হইয়া পড়িতেছে, মৃত্যু আসিয়া পদনখ হইতে অতি মৃদুগতিতে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে, হাত বাড়াইলেই আহার্য্য অর্থাৎ জীবন—নিরাবরণ প্রহরীহীন গৌরবে আশেপাশে সর্ব্বত্রই তাহা থরে থরে বিরাজ করিতেছে—লক্ষ লক্ষ মানুষ মরিয়া গেল, রাজপথে বাজার-হাটে আহার্য্য দ্রব্যের মনোহারী মাধুর্য্যের ব্যত্যয় হইল না, কিন্তু সেই ঋষিকল্প মহাপুরুষগণের উপযুক্ত বংশধরগণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই ; শীর্ণ করাঙ্গুলি ললাট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, কিন্তু সহজলভ্য আহার্য্যপাত্রের দিকে ভ্রান্তিবশেও তাহা উত্তোলিত হয় নাই।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)



দীপালী

বণ্টন প্রহসন

গত বৃহস্পতিবার, ৮ই এপ্রিল নিখিল ভারতীয় বেতার কেন্দ্র হইতে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার মহোদয় বলিয়াছেন, কয়েকদিনের মধ্যে খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যে ব্যাপকতর ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা জনসাধারণের গোচর করা হইবে। তিনি আরও বলেন, ধান চাউল ও গম প্রচুর পরিমাণে কলিকাতায় আসিতেছে এবং শীঘ্রই বাংলার অন্যত্রও এগুলি আমদানী করা হইবে। ধারাবাহিকভাবে এগুলির আমদানীর ফলে বর্তমানে খাদ্যশস্যের স্বাভাবিক বেচাকেনার পথে যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর হইয়া মূল্য প্রায় স্বাভাবিক পর্য্যায়ে পৌছিবে।

সম্প্রতি কিছুদিন হইতে আমারও সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, সুদীর্ঘ রেলপথ বাহিয়া পরস্পরশৃঙ্খলিত বিরাট ওয়াগণশ্রেণী ভারে ভারে শস্য লইয়া কলিকাতায় পৌছিতেছে। সংবাদপত্রের দৌলতে চাউল বোঝাই ওয়াগণগুলির ছবিও মুদ্রিত হইতেছে। সম্প্রতি গদীচ্যুত মন্ত্রিমণ্ডলের খাদ্যসচিব মিঃ পি. এন. ব্যানার্জী বিদায়ের প্রাক্‌কালে জানাইয়াছিলেন যে, খাদ্যমূল্যের নিম্নগতি কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করা যাইবে।

ইহার পরেও কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। কলিকাতার চাউলের বাজার হইতে আমরা কোনপ্রকার আশ্বাস আহরণ করিতে পারি নাই। অবস্থা পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। এখনও ২৫ টাকা মূল্যের চাউল কিনিয়া সাধারণ ভদ্র সন্তান কপর্দ্দকশূন্য হইতেছেন। তবে ইতিমধ্যে কনট্রোলের দোকানগুলিতে শ্রেণীবদ্ধ স্ত্রী-পুরুষের বিরাট লাইন ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইতেছে। আহার্যের জন্য এই বুভুক্ষু মনুষ্য শ্রেণীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আশাহত চেহারা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই। খাদ্য বন্টনের সরকারী ব্যবস্থার জয়গান করিতে এই যে প্রত্যহ প্রাণান্ত অভিনয়ের পালা চলিতেছে তাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, ইহাদের বাহাদুরী আছে বটে। দুঃখে ব্যথিত আমরা বলিতেছি যে, এই নিয়ন্ত্রণ মূল্যের দোকানগুলিতে মানুষ পশুর মর্যাদা পাইতেছে। স্ত্রীলোকও উদরান্নের জন্য শ্রীলতাহানি বরণ করিতেছেন। বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থার ইহা হইতে চমৎকার ভাষ্য আর কি হইতে পারে!

বর্তমানে গভর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত কনট্রোলড ব্যবস্থা পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। যেটুকু চাউল প্রত্যহ এই বিশ্রী হট্টগোল প্রথায় বিতরণ করা হইতেছে তাহার দ্বারা কলিকাতায় সত্যকারের কোন অভাব মোচন হয় নাই। সহস্র সহস্র দরিদ্র ও ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে।

(১ বৈশাখ ১৩৫০)

খাদ্যাভাবের দুর্গতি

ইউরোপীয় ও শাসক মহলের আস্থাভাজন নাজিমুদ্দিন সাহেবের প্রত্যাবর্তনের পর বাংলার খাদ্য পরিস্থিতির অপ্রত্যাশিত অবনতি ঘটিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর খাদ্য সচিব হিসাবে যে কয়েকটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে মজুতদারদিগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল। সাধারণ দশজনকে আশ্বস্ত করিবার একটা প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু দিন যতই যাইতেছে জনসাধারণের সম্মুখে গণবিভীষিকা ও আতঙ্কের ছায়া দীর্ঘতর হইয়া একটা ভাবী অকল্যাণের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কিছুদিন পূর্বে সুরাবর্দী সাহেব বাংলার সাংবাদিকগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কয়েকটি প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাংলার পত্রিকাগুলিকে আতঙ্কিত হইতে নিষেধ করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এখনও বাঙলাদেশে যে মজুদ খাদ্য রহিয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় তাহা মোটেই কম নয় বরং বেশি। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে খাদ্য শস্যের আমদানী করিলে খাদ্যাভাব ও খাদ্য মূল্যের যথেষ্ঠ উন্নতি ঘটিবে।

সুরাবর্দী সাহেবের এই কথায় ভরসা করিয়া দীর্ঘদিন আশা ও আশঙ্কায় বাঙালী কোন মতে কাটাইয়াছে। কিন্তু ইদানিং যে অবস্থা হইয়াছে তাহাকে অসহনীয় বলিলে বোধ হয় ঠিক সত্যের মর্যাদা থাকে না। খাস কলকাতা শহর—সেখান হইতে সরকারের আইন ও শৃঙ্খলার শত বিধি-নিষেধ প্রতি মুহূর্তে জারি হইতেছে, সেখানেই চাউল ৩০ টাকা ৪০ টাকায় উঠিয়াছে এবং এই মূল্য দিয়াও চাউল সংগ্রহ করা যাইতে পারে সেরূপ ভরসাও পাওয়া যাইতেছে না। ইহাকে আমরা একটা নিদারুণ দুর্বিপাকের লক্ষণ বলিয়াই মনে করিতেছি।

শুধু চাউল কেন, আটা, চিনি, ডাল প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুও বাজার হইতে বেমালুম অদৃশ্য হইয়াছে। অথচ মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সরকারী বিবৃতিতে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিয়া বলা হইয়াছিল যে, আটা ও ময়দা কয়েক মাস প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত পরিমাণে বাংলায় মিলিবে।

বর্তমানে অবস্থা হইয়াছে যে, চাউল, ডাল, আটা, চিনি ও অন্যান্য খাদ্যবস্তুর স্বাভাবিক বেচাকেনার বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার যে কোন বাজার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে কন্ট্রোলের দোকান ভিন্ন যে দোকানগুলি রহিয়াছে তাহাতে কেনাবেচা নাই বলিলেই হয়, অন্তত এই সকল দোকানে কোন জিনিস চাহিলে মেলে না। ইহা সাধাবণ অভিজ্ঞতার ব্যাপার।

বর্তমানে এইরূপ শোনা যাইতেছে যে, কনট্রোলের দোকানগুলিতেও উপযুক্ত পরিমাণে চাউলের সরবরাহ সরকার করিতে পারিতেছে না। আগে যাহারা দুই সের করিয়া চাউল পাইত আজ তাহাদিগকে এক সের করিয়া চাউল লইতে হইতেছে এবং তাহাও প্রত্যহ নয়। কারণ দৈনিক এই এক সের চাউল পাওয়ারও কোন নিশ্চয়তা গভর্ণমেন্ট কাহাকেও দিতে পারে না। প্রায়ই খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় ক্ষিণ্ন ও ক্ষিপ্ত নরনারীর মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটিতেছে—এইরূপ সংবাদ নিত্য পাইতেছি। এই এক সের চাউল সংগ্রহ করিয়া উদরাগ্নির নিবৃত্তি করিতে মানুষকে যে কোথায় নামিতে হইয়াছে সে সংবাদ লইতে আমরা খাদ্য সচিব সুরাবর্দী সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি।

সাধারণ ভদ্রলোক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের পক্ষে গুণ্ডামী, ইতরতা ও দুর্গতির লীলাক্ষেত্র এই কনট্রোলের দোকানগুলি হইতে একমুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। স্বাভাবিক বাজারও আজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহারা কোথায় যাইবে? ইউরোপীয় দল পরিচলিত বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল এই দিকে কতটুকু চিন্তা ও বিবেচনা করিতেছেন, তাহার প্রমাণ দীর্ঘদিনেও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বিফল ও অন্তহীন অপেক্ষা ও সহনশীলতারও একটা প্রতিক্রিয়া আছে তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

(২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)

খাদ্য সংকটে বাংলা সরকার

সম্প্রতি রোটারী ক্লাবে বাংলার খাদ্যমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী দুর্গতির পীঠস্থান স্বরূপ কণ্ট্রোলের দোকানগুলি তুলিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়েছেন। ইহার পরিবর্তে নাকি খাস কলিকাতা শহরে চারিশত ও শহরতলীতে চারিশত মোট আটশত সরকারী নিয়ন্ত্রিত খাদ্যদ্রব্যের দোকান খোলা হইবে। কণ্ট্রোল্ড ব্যবস্থায় যে ভাবে চাউল প্রভৃতি বিতরণ করা হয় তাহার নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের প্রতি মন্ত্রিমহোদয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বিলম্ব হইলেও ইহা ভরসার কথা। তবে আশঙ্কা এই যে, এই আশ্বাস কার্য্যে পরিণত হইলে হয়।

গত কয়েকমাস ধরিয়া আমরা কণ্ট্রোল প্রথায় বন্টন ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। শুধু আমরা নয় বাংলা দেশের সমস্ত পত্রিকা সমস্বরে এই ব্যবস্থার ব্যর্থতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা শুধু পত্রিকায় আলোচনার ব্যাপার নয়। কন্ট্রোলের লাইনগুলিতে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া একটি অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিবার যে দৃশ্য প্রত্যহ চোখের উপর ঘটিতেছে ইহাই যথেষ্ট। এক সের চাউল পাইবার জন্য এত কৃচ্ছ্র সাধন ও হীনতা বরণ করিতে হয়, ইহা জনসাধারণ তাঁহাদের জীবিতকালের অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজিয়া পাইবেন না।

দেখিয়াছি, সন্ধ্যা হইতে না হইতে ক্ষুধিত নরনারীর দল কণ্ট্রোলের সারিতে যে যাহার স্থান সংগ্রহ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া ছুটিয়াছে। ছেঁড়া মাদুর, কাঁথা, শেষ পর্যন্ত ইট সাজাইয়া বা খড়ির দাগ দিয়া যে যাহার জায়গা চিহ্নিত করিয়া লইয়াছে। সারা রাত্রি পথে যাপন করিয়া সকালে খাদ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার প্রচেষ্টায় মানুষের আকুলতার অন্ত নাই। তাহার পর অনাহার অনিদ্রায় যাপিত সুদীর্ঘ রাত্রির পর প্রতীক্ষিত মুহূর্ত হয়ত আসিল ; কিন্তু তখন ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিবার সময় নাই। ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করিতেই হইবে। বিক্ষুব্ধ জনতা যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে। একটা দস্তুরমত হাঙ্গামা বাঁধিয়া যায়। সেই বিরাট হট্টগোল ও হাঙ্গামায় কোথায় থাকে বালক ও বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অসহায়। কে কাহার কথা বিবেচনা করে। দৈহিক কসরতের উন্মত্ততায় এক সময় তাহারা কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে যে দুর্ঘটনাও না ঘটে এমন নয়।

সেদিন দেখিলাম, একজন ভদ্রলোক একটি আট দশ বৎসরের বালককে কাঁধে লইয়া চলিয়াছেন। আশেপাশে ছোট খাট একটি ভীড়ও সচল হইয়া ভদ্রলোকটিকে অনুসরণ করিয়াছেন। দেখিলাম বালকটির ঘাড় লটকাইয়া পড়িয়াছে, মুখের দুই ধার দিয়া টাটকা রক্তের ধারা বহিতেছে।

বালকটির ক্ষীণ রক্তাক্ত মুখ অদ্ভুত দেখাইতেছে। বেশীক্ষণ তাকাইতে গেলে যেন সারা শরীর ঝিমঝিম করিয়া উঠে।

দু-একজনকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, অতি ভোরেই নাকি ছেলেটি মায়ের কথায় কন্ট্রোলে চাউল আনিতে গিয়াছিল। তাহার পর ধ্বস্তা-ধ্বস্তির মধ্যে বালকটি নিজেকে সামলাইতে পারে নাই, অচৈতন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ভূলুণ্ঠিত বালককে কেহ তুলিয়া লইবার পূর্বেই ক্ষতি যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম পেটে ও বুকে আঘাত লাগিয়াছে অত্যন্ত বেশী। পরস্পরের গ্রাস ছিনাইয়া লইবার উৎসাহে উন্মত্ত মানুষের পদরজঃ দেহে ধারণ করিয়া ছেলেটি চলিয়াছে। কিন্তু কাহার অপরাধে শিশুটিকে এ মূল্য দিতে হইল?

পরে সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলাম যে, বালকটি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। ঘটনাটি অতিরঞ্জিত বা কষ্টকল্পিত নয়। আমরা চাক্ষুষ যাহা দেখিয়াছিলাম বা সন্ধান করিয়া যেটুকু জানিয়াছি তাহারই বর্ণনা করিলাম মাত্র।

কিন্তু মানুষ চাক্ষুষ কতটুকুই বা দেখিতে পায়, সন্ধান লইয়াই বা কতখানি জানে? আমাদের দেখা বা জানার বাহিরে নিত্য কত রোমাঞ্চেরই না সৃষ্টি হইতেছে! কিন্তু তাহার লিপিকার কেহ নাই।

(২৩ আষাঢ় ১৩৫০)

মহানগরী

কলিকাতার পথে ঘাটে মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখা যাইতেছে। অনাহারের জ্বালা চরমে উঠিয়া মানুষকে পশুর অপেক্ষাও হেয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে বাধ্য করিতেছে। ক্রমশঃ আমরা এই অবস্থার সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছিতেছি। ইহার পর অনাবিল শান্তি ও পূর্ণতার কল্পলোক। মহাকবির ভাষায় বলিতে গেলে যে লোক হইতে আর কেহ ফিরিয়া আসে না। শহরের পথে ঘাটে আজ একাধিক অনশনে মৃত্যু ঘটিতেছে। লোকের চলার পথে, এই শহরের অলিতে গলিতে দীর্ঘ অনশনক্লিষ্ট মানুষ অত্যন্ত অসহায়ভাবে শেষ নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া বিদায় লইতেছে।

মৃত্যু, বিশেষ করিয়া অকাল মৃত্যু আমাদের কাছে নূতনতর বিস্ময় লইয়া আর উপস্থিত হয় না। এই ধরনের ব্যাপার অত্যন্ত পুরানো হইয়া গিয়াছে। তথাপি মনে হয় মৃত্যুর সহিত একটি পবিত্রতা বা sublimity জড়িত আছে যাহাকে সন্ধান করিতে মনের স্বাভাবিক বৃত্তির প্রেরণা অনুভব করা হয়। হঠাৎ পথে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে শুনিলেই মনটা যেন অজ্ঞাতসারে অশ্রুসজল হইয়া উঠে। একটা বেদনার দীর্ঘশ্বাস আপনা হইতে বাহির হইয়া যায়!

কর্পোরেশনের গত সভায় ডাঃ আহমেদ, মিঃ বি. এন. রায়চৌধুরী প্রভৃতি যে সকল তথ্য প্রকাশ করেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। সপ্তাহাধিক কাল হইতে শহরের পথে ঘাটে একটি একটি করিয়া মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মরিতেছে। সৎকার সমিতি বা অন্য কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ইহাদের সৎকার হইতেছে। আরও জানা গেল, শহরের কয়েকটি হাসপাতালে এই সকল মৃত্যু-পথযাত্রীদের গ্রহণ করা হইতেছে না। কারণ হাসপাতালের আইন কানুনে starvation case গ্রহণ করিবার মত কোনপ্রকার নির্দেশ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছেন না।

ইতিমধ্যে অবস্থা কি হইবে খানিকটা কল্পনা করিয়া লওয়া যায়। আমরা সরকারী দপ্তরে আমাদের

আবেদন-নিবেদনের নৈবেদ্য পৌঁছাইয়া দিব। সরকার তাঁহার আইন বিশারদকে ডাকিবেন। আইনের চুলচেরা বিচার চলিবে। বহু আদেশ ও উপ-আদেশের অরণ্য হইতে আসল বস্তু যখন জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইবে তখন দেখা যাইবে, প্রয়োজনের তাগিদ অনেকখানি ফুরাইয়াছে। মানুষের প্রয়োজন যত জরুরীই হোক না কেন, লাল ফিতার মাহাত্ম্য কখনও খর্ব্ব হইতে পারে না ইহা এতদিনেও আমাদের ধাতস্থ হইল না। কাজেই পথে যাহারা শয্যা বিছাইয়াছে তাহাদের জন্য জনসাধারণের সেবাবৃত্তি যতটুকু করিতে পারে তাহাই আমাদের ভরসা।

কলিকাতায় একটি একটি করিয়া Gruel Shop-বা ভাতের ফেন বিতরণের কেন্দ্র খোলা হইতেছে। বেশন প্রথায় ইহা দরিদ্র বুভুক্ষু জনসাধারণকে প্রত্যহ বিতরণ করা হইবে। ৫ হইতে ৮ ছটাক প্রত্যেকে পাইবে। শোনা যাইতেছে ইহা পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। তথাপি আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, দেশে সত্যিকারের দুর্ভিক্ষ এখনও উপস্থিত হয় নাই। সুরাবর্দী সাহেব এ সম্পর্কে যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার মহিমা উপলব্ধি করিবার মত রসবোধ আমাদের নাই। বাংলাকে দুর্ভিক্ষের উপযোগী করিয়া গঠন করিতে হইবে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা চলিবে না। ইহা যেন সেই তৈলাধার পাত্র বা পাত্রাধার তৈলের সমস্যা—সুরাবর্দী সাহেবের যুক্তিতে ন্যায়ের আমেজ লাগিয়াছে।

জনসাধারণ আজ অসহায়। তথাকথিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—যাহারা এই অভিশপ্ত শহরে আজও টিকিয়া আছে তাহাদের অস্তিত্ব অটুট নয় ইহা আজ বোঝা যাইতেছে। অবস্থা আরও কয়েক ধাপ অগ্রসর হইলে কোথায় উপস্থিত হইবে তাহা অনুমান করা চলে। যাহারা ধনবান তাহাদের কেহ কেহ দুর্গতদের সাহায্য কল্পে অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে দেশবাসী কিছু আশ্বস্ত হইবে। জানা গেল মেসার্স বিড়লা ব্রাদার্স ও আজিমগঞ্জের বাহাদুর মিঃ সিঙ্গী—ইহারা ত্রাণকার্য আরম্ভ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন! কলিকাতার ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খ্যাতনামা দানশীল ব্যক্তির অভাব নাই। ইহাদের মিলিত চেষ্টায় কিছু করা সম্ভব ইহা আমাদের বিশ্বাস। ক্লাইভ স্ট্রীটের বিপুল বিত্তশালী ইউরোপীয়ান ফার্মগুলি বাংলার সম্পদে স্ফীত হইয়াছে, আজ তাহার একান্ত দুর্দ্দিনে ইহাদের একটা নৈতিক কর্তব্য আছে বলিয়া জনসাধারণ মনে করিতেছে।

(১৯ শ্রাবণ ১৩৫০)

মন্বন্তর

১৭৭০ সালের মন্বন্তর-এর উল্লেখ আজও আমরা সভয়ে এড়াইয়া চলি। বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক এই মন্বন্তরে মারা গিয়াছিল। তখন সবেমাত্র বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত। ১৯৪৩ সালে—ভারতে বৃটিশ শাসনের গর্বস্ফীত মধ্যাহ্নে—মন্বন্তরের প্রেতমূর্তি চুপিচুপি আবার আমাদের গৃহ-অঙ্গনে দাঁড়াইয়াছে। ইহা সম্ভব হইল কি করিয়া এ প্রশ্ন মনে জাগে। ইহার জবাব যাহা খুঁজিয়া পাই তাহাতে মনটা বিষাক্ত হইয়া ওঠে। একটা অসহায় আর্তনাদ কণ্ঠে উঠিয়াও আবার মিলাইয়া যায়। আজ শহর ও পল্লী অঞ্চলের সর্বত্র সহায়হীনের আর্তস্বর শোনা যাইতেছে। ইহারা কাঁদিতেছে অতি চুপে চুপে, দীর্ঘদিন ধরিয়া। পাছে কেহ শুনিতে পায়, এই ভয়ে ইহারা নীরবে কাঁদিতেছে।

দেশের আবহাওয়া শান্ত ও নিস্তরঙ্গ। এতবড় একটা সঙ্কট চলিতেছে তাহার বাহ্যিক আভাষ পথে ঘাটে হয়তো মিলিতে পারে। কিন্তু ইহার বেশি কিছু নয়। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ভদ্রতা রক্ষা

করিয়া আমরা মরিতেছি। শিক্ষিত যাহারা, ঘরে যাহাদের অন্ন আছে সংবাদপত্রে সভাসমিতিতে তাঁহারা চিৎকার করিতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই চিৎকারের ফল হয়তো ফলিতেছে। প্রাদেশিকতার রুদ্ধ দুয়ারে ঘা মারিয়া আজ প্রতিবেশীদের জানাইয়াছি সত্য কিন্তু ইহাতে কি সান্ত্বনা মিলিবে?

অবস্থা চরমে উঠিবার বহু পূর্ব্বে ভিক্ষাপাত্র হাতে প্রতিবেশীদের দুয়ারে অনুরোধ ও উপরোধের নৈবেদ্য লইয়া আমরা গিয়াছিলাম। সেদিন কেহ আমাদের বিশ্বাস করে নাই। কেন তাহারা আমাদের বিশ্বাস করিতে পারে নাই সে অন্য কথা। পথে ঘাটে মৃত্যুর বিভীষিকা যখন মানুষকে ত্রস্ত করিয়া তুলিল, ভিক্ষা গ্রহণ করিবার হাত দুটিও যখন অসাড় হইয়া উঠিতেছে, তখন দেখিলাম ধীরে ধীরে মুষ্টিভিক্ষা আসিতেছে। অবস্থা তখন চরমে পৌঁছিয়াছে।

কয়েকমাস পূর্ব্বে বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ভিন্ন প্রদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহের নিবেদন জানাইয়াছিলেন। তখন শাসনতান্ত্রিক আইনের প্রশ্ন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রকাণ্ড বাধা হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যে আমরা আঘাত দিতে পারি না, এই কথা সেদিন শুনিয়াছিলাম। অন্য প্রদেশের নিকট হাত পাতিলে তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের দোহাই দিয়া বাংলাকে বিমুখ করিয়াছিলেন। আইন ও শৃঙ্খলার প্রাসাদে বিন্দুমাত্র ফাটল না ধরে সে দিকে ছিল ইহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ফলে আইনের জয়গান ঘোষণা করিয়া মানুষ মরিল, আত্মহত্যা করিয়া বাঁচিল। সৃষ্টির বিরাট প্রাণচ্ছন্দে কোথায় আঘাত জাগিল বা কোথায় কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি হইল ইহা আমরা জানি না। শুধু মূঢ়ের মত সমস্ত জাতি চক্ষু মেলিয়া এই বীভৎসতার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। তাহারা প্রতিবাদ করিবে না, প্রতিবাদ করিবার ভাষা আজ ইহারা হারাইয়াছে।

(৬ আশ্বিন ১৩৫০)

আলোচনী

বাংলা সরকার গত শুক্রবার (১০ই মার্চ) ১৯৪৩ সালের বাংলার মৃত্যু-সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা হইতে মৃত্যুর ভয়াবহতা কতকটা আন্দাজ করা যাইবে। Statistics বা সংখ্যানুপাতের বালাই এদেশে কোনদিন ছিল না। বাংলা দেশে যেভাবে জন্ম-মৃত্যুর হার গণনা করার রেওয়াজ আছে তাহা হইতে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা বিপজ্জনক। দীর্ঘদিন একটা আন্দাজী মনগড়া সংখ্যানুপাতের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের চলিয়াছে। মাত্র জানুয়ারি মাসে বাংলা গভর্ণমেণ্ট বর্তমান সংখ্যা সংগ্রহের ত্রুটির কথা স্বীকার করেন। ১৯৪৩-এর যে মৃত্যু-সংখ্যা গভর্নমেন্ট বাহির করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট ত্রুটি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯৪৩ সাল বাংলার মন্বন্তরের বৎসর। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সহিত অনেকে ইহার তুলনা করেন। বাহিরের দিক দিয়া এ তুলনা খানিকটা হয়তো চলিতে পারে। অন্তরের দিক হইতে প্রভেদ অনেক। সে যুগে মানুষের ক্ষুধার যে তীব্রতা ছিল তাহাতে সমাজ সংসারে গরল উঠিত। আর এ যুগের বাঙ্গালী সে গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের অনশন মৃত্যু বাঙ্গালীর লজ্জা না গৌরবের ইতিহাস? হয়তো গৌরবের। এতখানি দাহ বা জ্বালা যাহারা অন্তরে বহিয়া চলিয়া গিয়াছে সভ্যতার গৌরব তাহাদের ষোল আনা প্রাপ্য বই কি!

মৃতের কবর খুঁড়িয়া লাভ নাই। তথাপি সভ্য জগতকে বুঝাইবার গবজ আছে। ১৯৪৩ সালে 'সর্ব্ব বিষয়ে' (death from all causes) মৃত্যুহার গড় পাঁচ বৎসরের (average) বা সাধারণ

হার হইতে শতকরা ৫৮ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট বৃদ্ধির সংখ্যা ৬,৮৮,৮৪৬। ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যুর বৃদ্ধির সংখ্যা ৪,৬০,৭৭৬। এইগুলি হইল বৃদ্ধি সংখ্যা। সাধারণ (average) মৃত্যু সংখ্যা ইহার সহিত যোগ করিলে ১৯৪৩ সালে মোট মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮,৭৩,৭৪১ অর্থাৎ সরকারী হিসাব মতে এই বৎসর প্রায় ১৯ লাখ লোক মরিয়াছে। বাংলা সরকার চক্ষুলজ্জাবশতঃ death from all causes বা সর্ব্ব বিষয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বলিয়া সারিয়াছেন। তাঁহারা নীরব হইলেও হিসাব মত ২,২৮,০৭০ জন লোকের মৃত্যু কি কারণে ঘটিয়াছে তাহা আমরা অনুমান করতে পারি। সে কারণ প্রকাশ্য প্রেস নোটে বলা চলে না। ইহা হইল বাংলা গভর্নমেন্ট-এর সঙ্কলিত মৃত্যু সংখ্যা। বহু বেসরকারী সূত্র হইতে যে সকল সংখ্যা বাহির হইয়াছে তাহা আরও ভয়াবহ। কলেরা, ম্যালেরিয়া ও বসন্ত রোগ এড়াইয়াও যাহারা ধীরে ধীরে পুষ্টিহীন হইয়া মরিয়াছে তাহাদের কাহিনী রহিয়াছে সংখ্যা বিজ্ঞানীর দৃষ্টির বাহিরে। সেই সহস্র মানুষের মৃত্যুর ইতিহাস পশ্চাৎপটে রাখিয়া সংখ্যা সঙ্কলনের চেষ্টা দুশ্চেষ্টা মাত্র।

(৩ চৈত্র ১৩৫০)



দেশ

সাময়িক প্রসঙ্গ

খাদ্য সমস্যার তীব্রতা

ভারতের খাদ্য সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। লন্ডনের 'টাইমস' পত্রও দেখিতেছি, এজন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। 'টাইমস' ভারত গভর্নমেন্ট এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট কর্তৃক এতৎ সম্পর্কিত ব্যবস্থার অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে—ইহাতে সঞ্চয়ী এবং লাভখোরেরা সংযত হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। ইহাদের কর্মতৎপরতার ফলে বাহির ও ভিতরে শত্রুর দল সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বড়লাটের যে ক্ষমতা আছে তাহার কঠোর প্রয়োগই ইহার সমাধানের পথ বলিয়া মনে হয়। 'টাইমস' যে সমস্যার কথা তুলিয়াছেন বর্তমানে তাহাই আমাদের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের প্রতি আমরা গভর্নমেন্টের দৃষ্টি অবিরতভাবে আকৃষ্ট করিতেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ সম্বন্ধে সরকার যত ব্যবস্থা করিতেছেন, জনসাধারণের পক্ষে সেগুলি কিছুই কাজে আসিতেছে না। সরকারী ব্যবস্থা লোভীকে সংযত করিতে সক্ষম হইতেছে না কিংবা ঐ শ্রেণীর লোকের পাপ ব্যবসা বন্ধ করিবার উপযুক্ত কার্যকর হইতেছে না। চট্টগ্রামের একটি মামলায় দেখা গিয়াছে যে, কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মুদীর দোকান খুলিয়া এই দুর্দিনে দেশের লোকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া কিছু অর্জন করিবার মতলবে ছিলেন। বিচারক আসামীকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং রায়ে এই মন্তব্য করিয়াছেন, "সমাজের দরিদ্র লোকদিগকে রক্ষা করিবার কাজে যদি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সহায় না হন তবে বর্তমান অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ স্ব স্ব এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী। এরূপ ব্যক্তিরা যদি আইন ও শৃঙ্খলা না মানিয়া দরিদ্রদিগকে অন্যায়ভাবে শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হন তবে আদর্শ দণ্ডবিধানেরই একান্ত প্রয়োজন, তাহা না হইলে এরূপ অনাচার বন্ধ হইবে না।" চট্টগ্রামের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিতে কাহাদিগকে বুঝিয়াছেন, আমরা জানি না। আমাদের মতে জনসেবা ও ত্যাগের পথে প্রকৃতপক্ষে যাহারা নেতৃত্বের সম্মান লাভের অধিকারী তাঁহারা অনেকেই কংগ্রেস কর্মী; বর্তমানে ইঁহাদের অধিকাংশই কারাগারে আছেন। পদ, মান এবং অর্থবলের দিক হইতে প্রতিষ্ঠাই যদি নেতৃত্বের নিরিখ হয়, তবে সে স্থলে জনস্বার্থ নিরাপদ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। চট্টগ্রামের কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বরাত নিতান্ত মন্দ বলিয়াই তিনি এক্ষেত্রে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারই মত নেতৃস্থানে বসিয়া দেশের দুর্দশা লইয়া কতজনে পাপ

ব্যবসা চালাইতেছে কে জানে? গরীবের দুঃখের বোঝা বাড়িয়া উঠিতেছে তো এজন্যই। গরীবের দুঃখে বেদনাবোধ আছে কজনের? দেখিতেছি বাঙলা সরকার সম্প্রতি তাঁহাদের কয়েকটি বিভাগের কর্মচারীদিগকে বিনা খরচে খাদ্য সরবরাহ করিবার একটি ব্যাপক কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করিয়াছে। যে কর্মচারীর বেতন ৭৫্টাকার অনধিক তাঁহারাই এই সুবিধা লাভ করিবেন। পুলিশ এবং এ আর পি ও দমকল বিভাগের কর্মচারীরা এই সুবিধা পাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঙলা সরকার কলকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষকেও তাঁহাদের কর্মচারীদের জন্য এই প্রণালী অবলম্বন করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কিত ব্যয়ভার বহনে তাঁহারা সাহায্য করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। গভর্নমেন্টের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কয়েকটি বণিক সমিতিও নিজেদের কর্মচারীদের সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। এই সব বিশিষ্ট কর্মপন্থার মূলে দরিদ্রের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য মানবতার দিক হইতে আগ্রহ মুখ্য বস্তু বলিয়া আমরা মনে করি না। নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজ চালাইয়া লইবার আগ্রহই এক্ষেত্রে প্রধান ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এতদ্দ্বারা কার্যতঃ গরীবের দুঃখ-কষ্টের লাঘব হইবে। এদিক হইতে ইহা প্রশংসনীয়, কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার ব্যাপক নীতি অবলম্বন না করিয়া শ্রেণী স্বার্থমূলক এমন নীতি লইয়া অগ্রসর হইলে জনসাধারণের স্বার্থের হানি ঘটিবারও আশঙ্কা রহিয়াছে। সমর বিভাগের রসদ সরবরাহের চাপ যেভাবে জনসাধারণের উপর পড়িতেছে, সেই ভাবে সরকারের কতকগুলি বিভাগ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের খাদ্য সরবরাহের চাপ যদি গরীব জনসাধারণের উপর পড়ে, তবে সমস্যা সমধিক জটিল আকার ধারণ করিবে। জনসাধারণ হিসাবে সকলের সমস্যার যাহাতে সমাধান হয় এমন কর্মপ্রণালী অবলম্বন করাই এমন ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের কর্তব্য। তাঁহাদের এখনও উপলব্ধি করা উচিত যে, দেশে খাদ্য আছে, শস্য আছে এই সব মামুলি কথায় কোন কাজই হইতেছে না। শহরে ও মফঃস্বলে অন্নাভাব একান্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রধানত এই কারণে দুঃসাহসিক রকমের চুরি ডাকাতি প্রভৃতি মফঃস্বল অঞ্চলে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙলা দেশ বর্তমানে যুদ্ধের অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। স্থানে স্থানে শত্রুর বোমা বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শুধু কথায় তাহা সম্ভব নয়, অন্নচিন্তা দূর করিলেই জনসাধারণের মধ্যে আস্থার ভাব দৃঢ় হইতে পারে।

(৯ মাঘ ১৩৪৯)

দেশের অন্ন সমস্যা

অন্নসমস্যা উত্তরোত্তর গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। সরকারী হিসাবপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ সমস্যা তত বেশি নয় ; কারণ শতকরা ৪ ভাগ মাত্র ঘাটতি হইয়াছে। ভারত গভর্নমেন্টের কর্ণধারেরা বলিতেছে, এজন্য চিন্তার কোন কারণ নাই ; কিন্তু সাধারণের সে ভরসায় বুক বাঁধিবার মত অবসর কিছুই জুটিতেছে না। চাউলের মূল্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে ; এক বৎসর পূর্বেও যে চাউল প্রতি মণ পাঁচ টাকায় মিলিত এখন তাহা পনেরো টাকায়ও মিলিতেছে না। অন্নের অভাবে দেশের নানা স্থান হইতে ধান লুঠ এবং চাউল লুঠের খবর আসিতেছে। পেটের দায়ে মানুষ হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে ; এরূপ ক্ষেত্রে সদুপদেশ কোন কাজে আসে না, অন্য সব চিন্তায়ই পরোক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। সংবাদপত্রে অতিকায় জাহাজের চিত্রযুক্ত বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি,

ভারতের জন্য বিদেশ হইতে জাহাজযোগে খাদ্যশস্য আসিতেছে। আমরা জানি, এই খাদ্য শস্য চাউল নয়, অস্ট্রেলিয়া হইতে গম আসিতেছে শুনিয়াছি। বাঙলা দেশে গমেরও প্রয়োজন না আছে এমন নয় ; কিন্তু বন্টনের ব্যবস্থার উপরই সে দিককার অভাব পূরণও অনেকটা নির্ভর করিতেছে। গলদ ঢুকিয়া রহিয়াছে প্রধানত এই বন্টন এবং সরবরাহের ব্যবস্থায়। সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার এ এইচ গজনবী সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বন্টন ব্যবস্থার সমালোচনা প্রসঙ্গে কতকগুলি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থার মধ্যে উৎকোচ এবং দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। স্যার আব্দুল হালিম বিশেষ দায়িত্ব বুদ্ধি লইয়াই যে এরূপ অভিযোগ করিয়াছেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই বিশেষ অভিযোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা বাঙলা দেশে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি—গভর্নমেন্টের অবলম্বিত নীতিতে জনসাধারণের দুর্দশার প্রতিকার কিছুই হইতেছে না। চাউলের দর সরকার নিয়মিত রাখিতে সমর্থ হইতেছেন না ; পক্ষান্তরে কিছুদিন পরে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িবে—স্থানে স্থানে এইরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দোকানীরা খরিদ্দারদিগকে চাউল যোগাইতে পারিতেছে না। তাহারা এই কথা বলিতেছে যে, বাহির হইতে তাহারা চাউল পাইতেছে না। গভর্নমেন্টের চাউল রপ্তানী-আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থার ফলে আপাতত এই সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতার দোকানীরা বলিতেছে, মফঃস্বল হইতে তাঁহারা চাউল পাইতেছেন না, চাউলের কলের মালিকেরা বলিতেছেন, তাঁহারা ধান্য পাইতেছে না। পাইলেও, সরকারী বিধিনিষেধের জন্য চাউল বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এতদিন আমরা এই কথাই শুনিতেছিলাম যে ধান চাউল মজুত করার ফলেই প্রধানত এই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে ; কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে যে, উৎপন্ন মালের অনটন ঘটিয়াছে এবং সে অভাবও কম নয়—শতকরা ২৫ ভাগ। এই অভাব পূরণের জন্য সরকার কি করিতেছেন আমরা জানি না, তবে আমাদের ইহাই মনে হয় যে, বাহির হইতে গম আমদানী করিয়া ফেলিতে পারিলেও এ অভাব কতকটা মিটিতে পারে ; কিন্তু সেক্ষেত্রেও বন্টন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গলদ দূর করা আবশ্যক। বাঙলার এই অভাবের ক্ষেত্রে বাঙলা দেশ হইতে অন্যত্র চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়া অপরাধের কাজ হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

(২২ ফাল্গুন ১৩৪৯)

অন্নসমস্যার উদ্বেগ

চাউলের দর লোকের ক্রয় শক্তির উপরে উঠিয়াছে। নূতন ফসল কিছুদিন হইল লোকের ঘরে উঠিয়াছে, এখনই এই অবস্থা। ইহার পর লোকের ঘরে উৎপন্ন ফসলের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহা ফুরাইয়া আসিলে দুরবস্থা যে কি ভীষণ হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করাও যায় না। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বর্তমানের এই সমস্যা সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সরকারের নিকট হইতে আমরা এ সম্বন্ধে আশ্বাস লাভ করিবার মত কিছুই জানিতে পারি নাই ; কিন্তু তাহারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর কোন কর্মপ্রণালী যে অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন ভরসাও তাঁহারা আমাদিগকে দিতে পারেন নাই। সরকার বলিতেছে, ফসল এবার শতকরা ২৫ ভাগ কম উৎপন্ন হইয়াছে, সেজন্য এ সমস্যা। পক্ষান্তরে, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে হিসাবপত্রের দ্বারা

দেখাইয়াছেন যে, উৎপন্ন ফসলের ঘাটতি আরও অনেক বেশি, এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন এই উঠে যে, ঘাটতির হিসাব না হয় পরে আসিবে, যখন সঞ্চিত শস্যে টান পড়িবে তখন ; কিন্তু নূতন ধান্য নূতন চাউল বাজারে আমদানী হইবার মুখেই দর এতটা ধাঁধাঁ করিয়া চড়িয়া যাইবার কারণ কি? চাউলের যাঁহারা ব্যবসা করেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে একরূপ সর্ববাদী সম্মত অভিযোগ এই যে, চাউলের নিয়ন্ত্রণে গভর্নমেন্টের নিষেধবিধিই এজন্য দায়ী। তাহারা ঐ জন্য যে সব জেলায় চাউল আছে, তথা হইতে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে চাউল আমদানী করিতে পারিতেছে না। প্রধানমন্ত্রী সেদিন বলিয়াছেন, চাউলের ব্যবসা গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, লাভখোর ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজী বন্ধ করাই এক্ষেত্রে সরকারের উদ্দেশ্য। তাঁহারা অধিকতর অনটন অবস্থার প্রতিকারের জন্যই প্রস্তুত থাকিতে চাহেন। ফাটকাবাজী বন্ধ হয়, আমরাও ইহা চাই ; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, গভর্নমেন্টের এই নিয়ন্ত্রণ-প্রথা প্রয়োগের ফলে এখনই যদি চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে এবং চতুর্গুণ মূল্য দিয়া চাউল কিনিতে হয়, তবে প্রতিকারের প্রয়োজনে গভর্নমেন্টের ব্যবস্থা কাজে আসিবার পূর্বে ব্যাধি জীবনসংশয়কর হইয়া উঠিবে। বাজার দরের দিকে লক্ষ্য করিয়া সরকারের নিয়ন্ত্রণনীতি ধীরে-ধীরে এবং বিবেচনা সহকারে প্রয়োগ করা কর্তব্য ছিল। সরকার এ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যেসব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, দেশের বর্তমান সমস্যার যথোচিত প্রতিকারে কোনটিও কার্যকর হয় নাই। চাউলের মূল্য অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাওয়াতে অবস্থা বর্তমানে যে আকার ধারণ করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতিকার না করিলে গুরুতর অবস্থা দেখা দিবে, আমাদের ইহাই আশঙ্কা হইতেছে।

(২৯ ফাল্গুন ১৩৪১)

ধান চাউলের প্রাচুর্য

বাঙলার নূতন অ-সামরিক সরবরাহ সচিব বলিতেছেন, "বাঙলা দেশে ধান্য এবং চাউলের অভাব নাই। বোরো ধানের ফসল এবৎসর প্রচুর ফলিয়াছে। আসাম এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহু পরিমাণে খাদ্যশস্য বাঙলা দেশে আসিতেছে। 'আউস' ধানের ফসলের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ। ধান্য এবং চাউল ব্যতীত প্রচুব পরিমাণে গম, ভুট্টা, বাজরা প্রভৃতি শস্য ভারত গভর্নমেন্ট বাঙলা দেশে সরবরাহ করিতেছেন।" মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ধরণের আশার কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তেমন কথা পূর্বেও অনেকবার শুনিয়াছি ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কথায় ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে না ; যদি তাহা ঘটিত, আক্ষেপের কোন কারণই থাকিত না। খাদ্য শস্যের মূল্য কার্যত কিছুই কমে নাই। কলিকাতা শহরে গমের দর কিছুদিন সামান্য কিছু কমিয়াছিল, কিন্তু দর আবার চড়িতেছে, চাউলের মূল্যও তেজীর দিকে। মন্ত্রী মহোদয় বলিতেছেন, লাভখোরদের ফাটকাবাজীর জন্য দর চড়িতেছে এবং এজন্য যাহারা খাদ্যশস্য জমা রাখিতেছে, তাহারাও দায়ী। তিনি ইহাদিগকে কিছু সতর্কবাণীও শুনিয়েছেন , কিন্তু আমরা জানি, ইহাতে কোন ফল হয় না। সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হইল সরবরাহ ব্যবস্থা কিছুদিন স্বচ্ছন্দ রাখিয়া বাজারে মন্দার ভাব সৃষ্টি করা এবং কিছুদিন সেই অবস্থা চালানো। যদি ইহা সম্ভব না হয় এবং বাজারে একটা অনাস্থার ভাব বিদ্যমান থাকে, তবে লাভখোরদের সুবিধা হইবেই এবং

মাল জমা রাখিবার ঝোঁকও লোকের হ্রাস পাইবে না, কারণ ভবিষ্যতের পেটের ভাবনা হইতে যতটা সম্ভব নিশ্চিন্ত থাকিবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

(২৪ বৈশাখ ১৩৫০)

বাঁচিয়া থাকার সমস্যা

বাঙলার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, গড়পড়তা হিসাবে দেশের দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মাসিক আয় হইতেছে ৩০৲টাকা, ৪০৲টাকা এবং একজন শ্রমিকের আয় হইতেছে মাসিক ১৮৲টাকা। এই সকল ব্যক্তির পক্ষে বর্তমানের উচ্চ মূল্যর চাউল ক্রয় প্রায় অসম্ভব। ভগবানই জানেন, এ সব ব্যক্তি কি করিয়া বাঁচিয়া আছেন। এ প্রশ্নের উত্তর স্যার নাজিমুদ্দীন সত্যই যদি চাহেন, তবে আমরা বলিব যে, তিনি যে শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া নাই। অর্থাৎ মানুষ যেভাবে বাঁচিয়া থাকে, সেভাবে তাহারা বাঁচিয়া রহে নাই। অর্ধাহারে এবং অনাহারে কোন প্রকারে দুর্বহ জীবনের বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। এভাবে কোন দেশে মানুষ বাঁচে না ; সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা করিলে আমাদের মনুষ্যত্বের সম্বন্ধেই আমাদের মনে সংশয় উপস্থিত হয়। সুবে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীনের মনে এই চিন্তা যে আলোড়ন তুলিয়াছে, ইহা সুখের বিষয় ; কিন্তু শুধু মুখের কথায় এ সমস্যার সমাধান হইবে না, এজন্য কার্যত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। আমরা সরকারী সদিচ্ছাপূর্ণ উক্তি এবং বিবৃতিই পাইতেছি, কিন্তু নূতন মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সমস্যার সমাধান তো কিছুই হয় নাই বরং শহর এবং মফঃস্বল সর্বত্র সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে এবং উত্তরোত্তর তাহার গুরুত্বই অসাধারণ রকমে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙলার গ্রামে গ্রামে অন্নাভাবে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। সে দৃশ্যের শোচনীয়তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মন্ত্রীরা কেবল আমাদিগকে স্তোকবাক্যই শুনাইতেছে। খাদ্য বিভাগের সচিব চৌদ্দগণ্ডা 'যদি' জুড়িয়া এ সমস্যা সমাধানের যে পথ নির্দেশ করিতেছেন, তাহাতেও দেশের লোকের মনে নৈরাশ্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। সেদিন একটি বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, যদি লাভখোরেরা মজুত মাল বাজারে ছাড়ে, যদি লোকের খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখিবার ঝোঁক হ্রাস পায়, যদি ভগবানের দয়া তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি থাকে, তবে তাহারা এ সমস্যার সমাধান করিবেন, এমন আশা রাখেন। মন্ত্রী মহোদয়গণকে এ সম্পর্কে আমাদের একটি কথা বলিতে বিশেষ ইচ্ছা হয় তাহা এই যে, তাঁহারা কথায় কথায় এ বিষয়ে ভগবানের দোহাই দিতেছেন কেন, আমরা বুঝি না। ভগবানের যে কাজ তাহা ভগবানের উপর রাখিয়া তাঁহারা নিজেরা কি করেন, আমরা তাহাই দেখিতে চাই। এই সমস্যা সমাধানের পথে ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলীর যে সকল অন্তরায় ছিল, মিঃ ফজলুল হক পরপর কলিকাতায় কয়েকটি বক্তৃতায় সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। হক্ সাহেবের সেই সব অভিযোগ হইতে বোঝা যায় যে, এই প্রদেশের চাউল সম্পর্কে গভর্ণর স্বীয় দায়িত্বে অনেক কিছু করিয়াছেন। বে-সরকারি সরবরাহ বিভাগ এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে এবং তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলকে এ বিষয়ে যথাসম্ভব দূরে রাখা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে এই কার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় নাই। হক সাহেবের মতে চাউল রপ্তানীও এই সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন

যে, বাঙলার কয়েকটি প্রাচুর্যপূর্ণ জিলা হইতে চাউল সরানোর দরুণ এবং নৌকা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার ফলে খাদ্য সমস্যার জটিলতা বাড়িয়াছে। এসব অভিযোগের সত্যাসত্য আমরা জানি না, তবে একথা শুনিতেছি যে, খাদ্য সমস্যার অভাব তেমন ঘটে নাই। উহার পর বহু পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য প্রতিদিনই বাহির হইতে বাঙলা দেশে আসিতেছে। বে-সামরিক বিভাগের একটি প্রচারপত্রে সেদিনও বলা হইয়াছে যে, ভারত গভর্নমেন্ট বাঙলাকে দৈনিক ১৫০০ টন খাদ্য শস্য দিয়া সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা বর্তমানে মাসে ১৫ লক্ষ মণ চাউল এবং প্রায় সাড়ে ১২॥ লক্ষ মণ [যদ্দৃষ্ট] সত্য আমরা জানি না ; তবে একথা শুনিতেছি যে, খাদ্য শস্যের মূল্য কমিতেছে না কেন, ইহাই রহস্য। লোককে আশ্বস্ত হইতে বলিলেই তাহারা আশ্বস্ত হইতে পারে না ; কিংবা বাজারে আশ্বস্তির ভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে ; কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করাই প্রয়োজন। সেদিন কলিকাতায় একটি সভায় মিঃ ফজলুল হক বলিয়াছেন যে, বাঙলা সরকার নিজেরা উচ্চ মূল্যে চাউল ক্রয় করিয়া বাজারে দশ টাকা দরে বিক্রয় করুন ; এজন্য যে টাকা দরকার হইবে, তাহা সরকারী তহবিল হইতে লওয়া হউক। জানি না, বাঙলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের এতখানি আগাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে কি না। যদি এই পরামর্শ অনুসারে কাজ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে অন্য পথ তাঁহারা অবলম্বন করুন। তাঁহাদের মুখে শুধু স্তোকবাক্য শুনিয়া তৃপ্ত হইবার এত ধৈর্য দেশের লোকের নাই ; এ সত্য যত তাড়াতাড়ি তাঁহারা উপলব্ধি করেন, ততই মঙ্গল।

(১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)

বাঙলার খাদ্যসমস্যা

শুধু ফাঁকা কথা শুনিতে আর ইচ্ছা নাই ; কারণ বাঙলা দেশ জুড়িয়া যে দুরন্ত ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহা শুধু কথায় নিবৃত্ত হইবার নয়। কিছুদিন পূর্বে বাঙলা সরকারের উদ্যোগে সাংবাদিকদিগকে লইয়া এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য সরকারী দপ্তরখানায় একটি বৈঠক হইয়াছিল। এই বৈঠকে ভারত গভর্নমেন্টের নবনিযুক্ত বাণিজ্য সচিব স্যার আজিজুল হক, ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্য বিভাগের নিয়ামক মিঃ উড এবং বাঙলার খাদ্য বিভাগের সচিব মিঃ সুরাবর্দি বক্তৃতা করেন। ইঁহারা সকলেই হিসাবপত্র দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, চিন্তার কোন কারণ নাই। খাদ্যের অভাব ঘটিবে না। লোকে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা সকলের আতঙ্ক দূর করুন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সরকারী হিসাবপত্রে লোকের ক্ষুধা মিটে না। ক্ষুধাটা বাস্তব এবং সরকারী হিসাবপত্র ঠিকই হউক আর অঠিকই হউক, এগুলি অবাস্তব ; সুতরাং হিসাব দেখাইয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করা যায়, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না কিংবা খাদ্য মূল্য অত্যধিক হওয়ার ফলে লোকের মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে, সে আতঙ্ক দূর হয় না। খাদ্যমূল্য যদি কমে আতঙ্ক তখনই কমে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জনসাধারণের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে উক্তি এবং বিবৃতি যতই বাহির হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়া চাউলের দামও ততই চড়িয়া চলিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দি মজুতদার এবং লাভখোরদের উপর সকল দোষ চাপাইতেছেন এবং তাহা দমন করিবার জন্য দৃঢ়তা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহার কথার জোর আছে, কিন্তু সে কথার জোরে কাজ কিছুই হইতেছে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহার বিবৃতির ফলে খাদ্যদ্রব্যের

মূল্য কমে নাই ; অর্থাৎ লাভখোর এবং মজুতদারদের দোষেই যদি চাউলের মূল্য বাড়িয়া থাকে, তবে তাহাদের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয় নাই, মূল্য আরও বাড়িয়াছে ; সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তাঁহার কথায় লাভখোর এবং মজুতদারেরা ভয় তো পায়ই নাই বরং বাজারে যে চাউল ছাড়া হইতেছে, তাহা মজুত করিবার দিকেই বেশি ঝোঁক দিতেছে। মিঃ সুরাবর্দি সেদিন গড়ের মাঠের বক্তৃতায় নিজেও একথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দুই দিনের মধ্যে চাউলের দাম পাঁচ ছয় টাকা চড়িতে পারে, এমন কিছু ঘটে নাই। কিন্তু কার্যত দেখা যাইতেছে তাঁহার বিবৃতির পরে ইহাই ঘটিয়াছে। স্যার আজিজুল হক আশ্বাস দিয়াছেন যে, বাঙলা দেশের লোক না খাইয়া মরিবে না—ভারত গভর্নমেন্ট দেখিবেন। সপ্তাহের মধ্যে চাউলের মূল্য কমিবে বলিয়া তিনি আশা করেন। বাঙলা দেশের নূতন অর্থ সচিব মিঃ তুলসী গোস্বামী বলিয়াছেন, এক সপ্তাহ না হয় দুই সপ্তাহ কিংবা বড়জোর তিন সপ্তাহ। মিঃ গোস্বামী কোন্ ভরসায় একথা বলিয়াছেন আমরা জানি না এবং সে বিচার করিতেও আমরা চাহি না। চাউলের দর কার্যত কমে ইহাই আমরা চাই। আজ বাঙলা দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যুদ্ধের সমস্যার চেয়ে সে সমস্যা কম নয়। কলিকাতা শহরে চাউলের মূল্য ক্রমেই চড়িতেছে ইহা সত্য ; কিন্তু তবু এখানে চাউল পয়সা দিলে এখনও মিলিতেছে; কিন্তু মফঃস্বলের বহু স্থানে পয়সা দিয়াও চাউল মিলিতেছে না ; গরীবদের তো কথাই নাই, যাঁহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহাদের দুর্দশাও ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। অনেককে একবেলা খাইয়া থাকিতে হইতেছে এবং সে একবেলাও পেট ভরিয়া ভাত জুটিতেছে না ; চাউলের অভাবে শাকপাতা, বেশিরভাগ সকর কন্দ আলু সিদ্ধ করিয়া উদর পূর্ণ করিতে হইতেছে। এই গরমের দিনে এমন খাদ্য সমস্যার ফলে স্থানে স্থানে মহামারী দেখা দিবারও ভয় রহিয়াছে। কলিকাতা শহরে ইতিমধ্যেই সে ভয় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। গ্রাম অঞ্চল হইতে বুভুক্ষু নরনারীর দল শহরে কন্ট্রোলের দোকানে চাউল কিনিবার জন্য আসিতেছে। ইহারা রাস্তাঘাটে থাকিয়া অস্বাস্থ্যকরভাবে জীবনযাপন করিতেছে, ফলে শহরের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। শহরে আজ যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, মফঃস্বলে তাহাই দেখা দিবে এমন ভয় যথেষ্ট আছে। বাঙলার খাদ্য সমস্যার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার এক নূতন ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা আসাম, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং পূর্ব ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের—ইহাদের মধ্যে সকল প্রকার খাদ্যশস্য এবং খাদ্যশস্য হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের চলাচল সম্পর্কে যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল, সেগুলি প্রত্যাহার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বাঙলার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ হইতে বাঙলায় চাউল আমদানীর পথ সুগম করা হইয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, এইভাবে আমদানী চাউল আর লাভখোরদের হাতে না পড়ে কিংবা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের নামে কতকগুলি বিশেষ কোম্পানীর হাতে গিয়া আটক না হয়, এজন্য শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতবাসী নির্বিশেষে মজুতদারদের সকলের উপর মন্ত্রিমণ্ডলের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙলা দেশে আজ যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এ অবস্থা আর কিছুদিন যদি চলে তবে বড় রকমের অনর্থ দেখা দিবে। ইহার প্রতিকার হয় কথায় নয়, কাজে, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। স্যার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিমণ্ডল কথা ছাড়িয়া কাজে যদি ইহার প্রতিকার করিতে পারেন, তবে সে কাজে দেশের লোকের সহযোগিতা স্বভাবতই তাঁহারা লাভ করিবেন ; কিন্তু শুধু জোরালো এবং ঝাঁঝালো কথার দাপটে ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া তাহা মিলিবে না।

(৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)

বাঙলার খাদ্যসমস্যা

অন্ন চিন্তাই দেশের একমাত্র চিন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাউলের দাম কমিবে কি ?—এই প্রশ্ন ছাড়া কাহারও মুখে অন্য কোন প্রশ্ন নাই। বাঙলার নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলী গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলীর নীতির দোষেই সমস্যাটা এমন জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহারা এ সমস্যার সমাধান করিবেন এবং চাউলের দর কমাইবেন। বাঙলাব খাদ্য সচিব মিঃ সুরাবর্দি মজুতদারদিগকে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, এখনও যদি তাহাদের আক্কেল থাকে, বাজারে চাউল ছাড়ুক, নহিলে তাহাদের নূতন ব্যবস্থার ফলে চাউলের দর যখন একেবারে পড়িয়া যাইবে, তখন মজুতদারদিগকে আপশোষ করিতে হইবে। দেড় মাস হইতে চলিল লীগ মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু দেখা যাইতেছে, মজুতদারদের আপশোষের কোন কারণ ঘটে নাই ; বরং পূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে চাউলের যে দর ছিল, তাহা দ্বিগুণ হওয়াতে তাহাদের সুবিধাই হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিমণ্ডল হইতে বিবৃতি যতই বাহির হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চালের বাজারও ধাপে ধাপে ততই চড়িতেছে । ভারত গভর্নমেণ্ট বাঙলার আশেপাশের কয়েকটি প্রদেশ হইতে চালের কারবার অবাধ করিয়া দিলেন, ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে চাউল আসিল, খাদ্য সচিবের খানাতল্লাসীর জোরে মজুতদারদের মাল ধরা পড়িল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চাউলের মূল্য কমিল না। প্রধানমন্ত্রী দিল্লী ও শিলংয়ে ছুটিলেন, খাদ্যসচিব বিহার গেলেন, কলিকাতায় বৈঠকের পর বৈঠক হইতে লাগিল, কিন্তু অবস্থার কোন প্রতিকারই হইল না। সব ব্যবস্থা উল্টাইয়া ফেলিয়া চাউল বাঙলা দেশের বাজারকে ফাঁকি দিতে লাগিল। ভারত সরকার বাঙলা দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থা করিলেন, উড়িষ্যা এবং আসামের মন্ত্রিমণ্ডলের নীতিতে তাহা কাজে আসিতে পারিল না। তাঁহারা কৌশলে নিজেরাই চাউলের বাজার জুড়িয়া রহিলেন এবং চাউল কিনিতে থাকিলেন ; সুতরাং ঐ সব প্রদেশ হইতে বাঙলা দেশে চাউল রপ্তানী হইবার আর কোন সুবিধা থাকিল না। এমনটা অপ্রত্যাশিত কিছুই ছিল না। যুদ্ধের মত ঝক্কি সবই যখন বাঙলার উপরই আসিয়া পড়িতেছিল, তখন কর্তারা বাঙলা দেশের লোকের সমস্যার কথা ভাবেন নাই। তখন হইতে যদি ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতীয় সমস্যাস্বরূপে খাদ্য সম্পর্কে বিচার করিতেন, তবে এতটা বিভ্রাট ঘটিত না ; কিন্তু সেজন্য মাথা ঘামাইবার অবসর তাহাদের হয় নাই। বাঙলা দেশকেই প্রধানত চাউলের দায়টা ষোল আনা ঘাড়ে লইতে হইয়াছে। এখন তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। মন্ত্রীরাও ক্রমে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতেছেন এবং তাঁহাদের সুরও ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছে। যথেষ্ট চাউল আছে, খাদ্যাভাবও ঘটিবে না, এই ধরনের কথা পূর্বে সরকারী বিবৃতিতে যেরূপ শোনা যাইত, এখন আমরা তাহা ততটা শুনিতেছি না। কিছুদিন পূর্বে যাহারা বলিয়াছিলেন, আর এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ অপেক্ষা কর, তবেই চাউলের দর নামিয়া যাইবে ; আজ তাঁহারা বলিতেছেন, আমরা সহজে সুরাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কোন প্রদেশ আমাদের সঙ্কটে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে না। সুর ঘুরিবার সঙ্গে বাস্তবেরও ব্যতিক্রম যেন সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল। পূর্বে শুনিয়াছিলাম কন্ট্রোলের দোকান আরও বাড়ানো হইবে; কিন্তু কার্যত কন্ট্রোলের দোকানে যে চাউল দেওয়া হইতেছিল, তাহার পরিমাণও অর্ধেক করিয়া ফেলা হইল। রৌদ্রের তাপে দেশের লোকের কষ্ট হইবে, লোকের বাস্তব অভাব নিবৃত্তির চেয়ে কর্তৃপক্ষের এই উদার প্রবৃত্তি বড় হইল। তারপর বাঙলার খাদ্য সচিব গম্ভীরভাবে আমাদিগকে

এই উপদেশ দিলেন যে, আমাদের পক্ষে চাউল ব্যবহার কমাইয়া তৎপরিবর্তে অন্য কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের সময় আসিয়াছে। মন্ত্রী মহোদয় আমাদিগকে এ কথাও জানাইলেন যে, তিনি একথা বলিতেছেন না যে, বাঙলা দেশে পর্যাপ্ত চাউল নাই, অথবা বাহির হইতে আমদানি হইবে না। আসলে ব্যাপার হইতেছে এই যে, বাজারে প্রচুর পরিমাণ চাউল নাই এবং চাউলের মূল্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে চাউল ক্রয় করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি চিন্তা নাই। মন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেব বলিতেছেন, এই অবস্থা বিপর্যয়ের ফল আমাদের পক্ষে 'শাপে বর' স্বরূপই হইবে। আমরা অন্য রকম খাদ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইব এবং তাহার ফলে "সহজে দুর্বল মোরা চিরপরাধীন[""] বাঙালীরা মোটা তাজা হইয়া উঠিব। খানিকটা চাউল সিদ্ধ করিয়া খাইয়া আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। মিঃ সুরাবর্দি আমাদের 'ভেতো বাঙালী' এই দুর্নাম দূর হইবার আশায় শরীরতত্ত্বের দিক হইতে আজ আশ্বস্ত হইয়া উঠিতে পারেন, তেমন অবসর তাঁহার আছে; কিন্তু আমাদের পক্ষে ভাতের প্রশ্ন মরা-বাঁচার সমস্যা। আমাদের পক্ষে প্রশ্ন এই যে, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে আমাদের উদরপূর্তি হইবে না; উদর পূর্তি করিব কোন্ উপায়ে? বাজারে চাউলের আমদানী প্রচুর নাই, কিন্তু পেট ভরিবার মত অন্য কোন্ জিনিসই বা আছে? আটার কথা কেহ কেহ বলিবেন, কিন্তু আটার দরই কি কম? সেই আটাও এই কলিকাতা শহরেই দুর্লভ বস্তু, মফঃস্বলের তো কথাই নাই। আলু এত পরিমাণে জন্মে না, যাহার দ্বারা গোটা বাঙালী জাতির উদরপূর্তি হইতে পারে; সুতরাং এইসব মূল্যবান্ পণ্ডিতি গবেষণা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া বাঙলার বাস্তব সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং সে সমস্যা চাউলেরই সমস্যা। বাঙলা দেশে পর্যাপ্ত চাউল আছে এবং বাহির হইতে চাউল আসিতেছে, এসব কথায় আমাদের সান্ত্বনা কিছু নাই। মিঃ সুরাবর্দি বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাউল নাই এবং চাউল ক্রয় করা শুধু দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে নয়, যাঁহারা ধনী সেই মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক ছাড়া অন্য সকলের পক্ষেই সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই বাস্তব সমস্যার সমাধান চাই; বাজারে চাউল চাই এবং দর সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত হয়, ইহাই দেখিতে চাই। ফাঁকা বক্তৃতাবাজী শুনিবার মত মনের অবস্থা আমাদের নাই। অন্নচিন্তায় মানুষের মাথা ঠিক থাকে না, মন্ত্রী মহোদয়েরা এইটুকু উপলব্ধি করিবেন ইহাই আমাদের বক্তব্য।

(২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)

খাদ্য সমস্যা ও মন্ত্রিমণ্ডল

বাঙলার খাদ্য সমস্যার জটিলতা কোন দিক হইতেই হ্রাস পায় নাই। কিছুদিন পূর্বে বাঙলার খাদ্যসচিব এ সমস্যার সমাধানকল্পে আমাদিগকে চাউল কম খাইবার জন্য পরামর্শ দেন, পাঠকদের তাহা স্মরণ আছে; কিন্তু ভারত সচিব আমেরী সাহেব আমাদিগকে একেবারে পথে বসাইয়াছেন। বাঙলা দেশের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, হাঁ চাউল দুস্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হইয়াছে, ইহা ঠিক কিন্তু এ সমস্যা বাঙলা দেশে এবং বিশেষভাবে কলকাতায়। আমাদের সমস্যার দিকে ভারত সচিবের নজর কতটা তাহার এই উক্তিতেই বোঝা যায়। কারণ খাদ্য সমস্যা সমস্ত বাঙলা দেশ জোড়া, বিশেষভাবে কলিকাতায় নহে। কলিকাতা অপেক্ষা মফঃস্বলে বরং

অধিক। ইহার পর আমেরী সাহেব বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের শস্য না পাওয়া যাইবে, ততদিন পর্যন্ত চাউল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে। ব্রহ্মদেশের জন্য আমাদের কোন চিন্তা নেই। সে দেশ যে পুনরধিকৃত হইবে ইহা আমরা জানিয়া লইয়া নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকিতেও পারিতাম; কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। খাদ্যের প্রয়োজন আমাদের এখনই। এজন্য কি করা হইতেছে, ইহা জানিবার জন্যই আমাদের উদ্বেগ বেশি। বাঙালার বর্তমান মন্ত্রীরা এ সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েকদিন এ-প্রদেশে ও-প্রদেশে ছুটাছুটি করিলেন কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, ইহা মনে হয় না। কারণ পূর্বাঞ্চল হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর নিষেধবিধি ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইবার পরও কিছুদিন কাটিয়া গেল ; কিন্তু এ পর্যন্ত অবস্থার কোন প্রতিকারই লক্ষিত হইতেছে না। বাঙলার বেসরকারী বিভাগ সেদিনও বলিয়াছেন, চাউলের মূল্য এবার যতটা চড়ার চড়িয়াছে, আর চড়িবে না ; কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে কমিবে কিনা ; যদি অবিলম্বে চাউলের মূল্য না কমে, তবে ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অবস্থা পুনরায় বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। বাস্তবের দিক হইতে এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাঙলা গভর্নমেন্ট এক নূতন খাদ্য পরিকল্পনা প্রবর্তন করিতেছেন। লোকের ঘরে চাউল মজুত আছে। তাহারা তাহা বাহির করিতেছে না। ইহা ধরিয়া লইয়াই এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কার্যক্রম মোটামুটি এইরূপ—(১) বাঙলা দেশের সর্বত্র মজুতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান করা হইবে ; (২) প্রদেশের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য আছে, তাহার হিসাব লওয়া হইবে এবং খাদ্যের কতটা প্রয়োজন তাহারও একটা হিসাব প্রস্তুত করা হইবে ; (৩) প্রদেশের সর্বত্র ফুড কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হইবে ; (৪) খাদ্য বন্টন বিষয়ে সুব্যবস্থা করা হইবে। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত মজুত চাউল উদ্ধার করিয়া কমিটি সমূহের দ্বারা তাহার বন্টন ব্যবস্থা করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে বক্তব্য হল এই যে, চাউল যদি সত্য প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে মজুত থাকে এবং অভাব মিটাইবার পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত হয়, তবে এই পরিকল্পনা সফল হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বাঙলা দেশের মফঃস্বলে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে চাউল মজুত আছে এমন বিশ্বাস আমাদের এতটুকু নাই। বাঙলা গভর্নমেন্ট প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজনীয় ছয় মাসের চাউল মজুত রাখা চলিবে বলিতেছেন, বাঙলা দেশে এমন কয়জন সম্পন্ন গৃহস্থ আছেন, যাঁহারা ছয় মাসের অধিক চাউল মজুত রাখেন? বড় বড় ব্যবসায়ী এবং মহাজন—তাহারাই সাধারণত ব্যবসায়ের জন্য চাউল মজুত করিয়া থাকেন। এমন ব্যবসায়ী ও মহাজনের সংখ্যাও বাঙলা দেশে অধিক নহে , যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গভর্নমেন্টের এইসব বিধিব্যবস্থা জারী হইবার পর এবং জারী হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াও যে চাউল মজুত রাখিবেন, ইহা মনে হয় না। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ব্যবসায়ী ও মহাজনের ঘরে চাউল সত্যই যদি মজুত থাকে তবে কলিকাতা এবং হাওড়া এই দুইটি স্থানেই বিশেষভাবে আছে। যথেষ্ট অর্থ এবং বিত্ত এবং অন্যভাবে প্রতিপত্তিশালী না হইলে এ অবস্থার মধ্যে চাউল মজুত রাখা কেহ নিজের ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল বলিয়া মনে করিবে না। এমন মহাজনের সংখ্যা কলিকাতাতেই বেশী। অথচ দেখা যাইতেছে বাঙলা গভর্নমেন্ট কলিকাতা ও হাওড়াকে তাঁহাদের খাদ্য পরিকল্পনা বিধি প্রয়োগের গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়াছেন, এমন বৈষম্যের আমরা কোন কারণ দেখি না। দেশের লোককে অন্নমুষ্টি হইতে বঞ্চিত রাখিয়া যাহারা নিজেদের উদর পরিস্ফীত করিতে চাহে, তাহারা শহর কলিকাতা কিংবা

হাওড়ার এলাকার মধ্যে থাকিলে এবং সাহেব ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা পাইলে বাঁচিয়া যাইবে, এ ব্যবস্থায় এমন ত্রুটি রহিয়াছে। ইহা কখনই সমীচীন নহে।

(২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)

মজুত বিরোধী অভিযান

এক পক্ষকাল অতিবাহিত হইতে চলিল, বাঙলাদেশ সরকারের নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী মজুতবিরোধী অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। এই অভিযানের সাফল্য সম্বন্ধে অর্থাৎ এই অভিযান আরম্ভ হইলে চাউলের মূল্য হ্রাস পাইবে বলিয়া বাঙলার খাদ্যসচিব অনেক কিছু ভরসা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই একপক্ষকাল অভিযানের পর বাঙলার খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দি এ সম্বন্ধে সেদিন কলিকাতার রোটারী ক্লাবে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের পঞ্চপ্রাণ শীতল হইয়া গিয়াছে। সরকারের এই পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হইয়াছে, মিঃ সুরাবর্দির বক্তৃতা পাঠ করিলে সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। খাদ্যসচিব এই অসাফল্যের কথা অন্যভাবে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি গভর্নমেন্ট এবং জনসাধারণের একযোগে কার্যের মহিমা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন ; কিন্তু পেটের ক্ষুধা তাহাতে মেটে না, মিটিবে যে এমন ভরসাও সুরাবর্দি সাহেবের বক্তৃতায় পাওয়া যায় না। তিনি বলিতেছেন, কতক লোককে উপবাস করিতেই হইবে। এই কতকের পরিমাণ কি? মোটা মাহিনাওয়ালা মন্ত্রী এবং তাঁহাদের মত সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা ছাড়া অন্য সকলে কিনা বুঝিবার উপায় নাই। কলিকাতার কন্ট্রোলের দোকানগুলি এতদিন পরে তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তৎপরিবর্তে শহর এবং শহরতলীতে আট শত দোকান খোলা হইবে ; কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধান কি যে হইবে বুঝা যায় না ; কারণ সমস্যা হইল খাদ্যের অভাবজনিত। খাদ্যসচিব অভাব মিটাইবার মত সুনিশ্চিত কোন পরিকল্পনা দিতে পারেন নাই। তাঁহারা যেন এখনও শুধু ফাঁকা চালের উপরই আসর জমাইয়া রাখিবার মতলবে আছেন। সম্প্রতি খাদ্যসচিবের দপ্তর হইতে প্রকাশিত বিবৃতিতে সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা নূতন একটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে যাহাতে চাউলের মূল্য না বাড়ে, সেজন্য ফুড কমিটি সমূহের দ্বারা বিতরিত চাউল হইতে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ অংশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে থাকিবে। সরকারী মজুতবিরোধী পরিকল্পনার মধ্যে রাজকর্মচারীদের কর্তৃত্বের কথা আমরা ইতিপূর্বে শুনি নাই। পরিকল্পনা হইয়াছিল যে, যে খাদ্য উদ্বৃত্ত হইবে, স্থানীয় অভাব পূরণের পর অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের অভাব পূরণের জন্য দরকার হইলে তাহা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আলোচ্য সরকারী বিবৃতি পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে, গ্রামে গ্রামে চাউলের হিসাব লইয়া যে পরিমাণ চাউল উদ্বৃত্ত হইবে বুঝা যাইবে, তাহার শতকরা ২৫ ভাগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমে হাতে রাখিবেন, পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ফুড কমিটিগুলিকে বিলি ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হইবে। সরকারের ধারণা কি—আমরা বুঝি না। ইহার পরও কি তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, বাঙলা দেশে ব্যবসায় এবং গৃহস্থদের ঘরে ঘরে এত চাউল মজুত রহিয়াছে যে, তাহা হইতে শতকরা ২৫ ভাগ জেলার কর্মচারীরা লইলেও স্থানীয় অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ট চাউল উদ্বৃত্ত থাকিবে?

আমাদের বক্তব্য এই যে, এত চাউল যদি উদ্বৃত্তই হয়, তবে ফুড কমিটিগুলির হাতেই অসময়ের জন্য উদ্বৃত্ত চাউল রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল না কেন? জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে ইহার মধ্যে না

আনিলেই ভাল ছিল ; তাঁহারা অনেকেই উঁচু দরের লোক, গ্রামের গরীবদের দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টের খবর তাহারা কম রাখেন। তাঁহারা দেশের লোকের সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা করিতে চেষ্টা করুন না কেন, ফুড কমিটির স্থানীয় লোকদের দ্বারা যে কাজ হয়, তাঁহাদের দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে না। মোটামুটি সরকারী পরিকল্পনার এই প্রাথমিক পর্বে আমরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, বাঙলা দেশেব গ্রাম অঞ্চলে চাউল বিশেষ কিছু মজুত নাই ; যদি মজুত থাকে—আছে কলিকাতা এবং হাওড়ার বড় বড় ব্যবসায়ী, শ্বেতাঙ্গ ফার্ম এবং গভর্নমেন্টের এজেন্টদেরই হাতে। কিন্তু কলিকাতা ও হাওড়া শহরকে সরকারী পরিকল্পনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে মজুত মালের অবস্থা বুঝিবার উপায় নাই। কলিকাতা এবং হাওড়া শহরকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া এখানকার প্রয়োজনের হিসাব লইয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকে কিনা দেখিলে তবে তেমন পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ হইত। আমাদের বক্তব্য এই যে, আগামী হৈমন্তিক ধান্যের ফসল না উঠা পর্যন্ত বাঙলাকে বর্তমান এই চালের অভাব যদি পূরণ করিতে হয়, এই ধরনের উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সে কাজ হইবে না। এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অন্য প্রদেশ হইতে এবং সম্ভব হইলে বিদেশ হইতে বাঙলা দেশে চাউল এবং গম আমদানী করিতে হইবে। সে দায়িত্ব অনেকটা ভারত গভর্নমেন্টের উপর রহিয়াছে। তাঁহারা কয়েকটি অঞ্চল হইতে চাউলের কারবার অবাধ করিয়া যে সুবিধা দিয়াছিলেন, তাহা প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট সমূহের কৌশলে একেবারেই পণ্ড হইয়াছে। ইহার পর ভারত গভর্নমেন্ট বাঙলা দেশকে যে পরিমাণ খাদ্য দিয়া সাহায্য করিবে বলিয়া পূর্বে আমরা শুনিয়াছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি সেই পরিমাণও কার্যত অনেক কমাইয়া আনা হইয়াছে। ইহারই বা কারণ কি? ভারত সরকারের এই বিভাগের কর্তা স্যার আজিজুল হক সাহেব তাহা জানাইবেন কি? অপরের জন্য জল টানিবার এবং কাঠ বহিবার জন্যই বাঙালীরা শুধু রহিয়াছে?

(১১ আষাঢ় ১৩৫০)

খাদ্য সম্মেলন

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ খাদ্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে বাঙলা দেশকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য গভর্নমেন্টের নিকট দাবী করা হইয়াছে। 'দুর্ভিক্ষ' এই কথাটা এদেশের শাসকবর্গের পক্ষে চিরদিনই শ্রুতিকটু। তাঁহারা কোন অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিতে চাহেন না। তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা এই যে, দেশের লোকের ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা এত বেশি এবং ঘাস পাতা প্রভৃতির দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার দক্ষতা এমনই স্বাভাবিক যে, এদেশের শব্দকোষে 'দুর্ভিক্ষ' কথাটির প্রয়োগ একরূপ অবান্তর। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এদেশের শাসকবৃন্দের এমন মনোভাবের প্রধান কারণ এই যে, কোন অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিলে সে অঞ্চলের লোকের অন্ন সংস্থানের ভার গভর্নমন্টের উপর আসিয়া পড়ে। তাঁহারা ইহাতে রাজী হইতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বাঙলা দেশের অবস্থা বর্তমানে যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাও যদি দুর্ভিক্ষের অবস্থা না হয়, তবে দুর্ভিক্ষ যে কিসে হইতে পারে ইহা ধারণা করা যায় না। দেশের লোকের প্রতি গভর্নমেন্টের যদি কোন কর্তব্য থাকে তবে লোককে অন্ন দিয়া বাঁচাইয়া রাখা তাহাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। খাদ্য সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

তাঁহার অভিভাষণে সুস্পষ্টভাবেই দেখাইয়া দিয়েছেন যে কি ভারত গভর্নমেন্ট কি বাঙলাদেশের প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট উভয়েই এই দায়িত্বকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সমর বিভাগের অভাব মিটানোই যেন তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। সমর বিভাগের শৃঙ্খলা বিধান এবং সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিবার কর্তব্য গভর্নমেন্টের না আছে এমন নয়, কিন্তু দেশের লোকের অন্ন সংস্থান সমর বিভাগের স্বার্থের দিক হইতেও একটা বড় ব্যাপার। যুদ্ধের সময় সব দেশের গভর্ণমেন্টই এদিকে প্রথমে লক্ষ্য রাখেন। ইংলন্ড এবং আমেরিকার গভর্নমেন্ট কর্তৃক সেই সেই দেশে অবলম্বিত ব্যবস্থা সমূহই এ পক্ষে বড় নজির রহিয়াছে। কিন্তু এদেশে সে ভাবনা কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করে নাই ; কিংবা এখনও করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রধান কারণ হইল এই যে, ঐ সব দেশের গভর্নমেন্ট জাতীয় গভর্নমেন্ট ; অর্থাৎ যে সব গভর্ণমেন্ট দেশের লোকের দ্বারা দেশের স্বার্থের জন্য পরিচালিত হইয়া এই খাদ্য সমস্যা যাহাতে দেখা না দিতে পারে পূর্ব হইতেই ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া তৎসম্বন্ধে কাজ আরম্ভ করিতেন। তাঁহারা এ সমস্যাকে চাপা দিয়া সমধিক জটিল করিয়া তুলিতেন না। আজ যে বাঙলায় দেশজোড়া অন্নাভাবে এমন হাহাকার উঠিয়াছে ইহার কারণ কী? প্রধান কারণ এই যে, এ সমস্যাকে আগাগোড়া উপেক্ষার মনোভাব লইয়া কেবল চাপা দিবারই চেষ্টা করা হইয়াছে।

(১৮ আষাঢ় ১৩৫০)

সমাধানের উপায়

চাউলের যখন অভাব ঘটিয়াছে, তখন তাহা যোগাইব কোথা হইতে?—এমন কথা বলিয়া দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। আজ সোজাসুজি স্বীকার করিতে হইবে যে, চাউলের অভাব ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে বাঙলা দেশজোড়া ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। দেশের লোককে অন্ন দিয়া বাঁচাইতে হইবে ; সেজন্য সর্বপ্রথমে এদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য বিদেশে দাতব্য একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। এদেশের লোক না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, এমন অবস্থায় আরব, পারস্য, তুরস্ককে অন্ন বিতরণ করিবার অবসর এদেশের লোকের নাই। শুধু ইহা করিলেই চলিবে না, বিদেশ হইতে যে সব সৈন্য এদেশে আসিতেছে, তাহাদের খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থাও অন্য দেশ হইতে করিতে হইবে। অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা প্রভৃতি যে সব দেশে এখনও খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, সৈন্যদের জন্য সেইসব দেশ হইতে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। প্রদেশের এই নিদারুণ সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে গভর্নমেন্টের অবলম্বিত ব্যবস্থায় দেশের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা এবং সমর্থন থাকা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা উপদলীয় স্বার্থকে সরকারী নীতি হইতে নির্মমভাবে উৎখাত করিয়া ফেলিতে হইবে। মন্ত্রী বিশেষের বা কর্মচারীবিশেষের সদিচ্ছা কিংবা সাধুতাই এক্ষেত্রে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে পারে না। ব্যক্তিগত বিচার বা সতর্ক দৃষ্টি এক্ষেত্রে কোনক্রমেই নীতিগত ত্রুটি হইতে নির্মুক্ত হইতে সমর্থ নয় ; এক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থায় দেশে সর্ব সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ সর্বদলীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত থাকা দরকার। বাঙলা দেশ জীবন-মরণ সমস্যায় পতিত হইয়াছে এবং পরীক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করিবার দিন আর নাই।

(১৮ আষাঢ় ১৩৫০)

খাদ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

দিল্লীতে এত ঘটা করিয়া যে খাদ্য সম্মেলন হইয়া গেল, তাহার ফলের দিক হইতে বিবেচনা করিলে পর্বত মূষিক প্রসব করিয়াছে, এই প্রবাদ বাক্যই আমাদের মনে পড়ে ; প্রধানত সমস্যাটিকে আপাতত ধামাচাপা দিয়া সেপ্টেম্বর মাসের জন্য মুলতুবী রাখা হইয়াছে। ভারত গভর্নমেন্ট বর্তমানে যাহা করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে তাহাও অবশ্য অনেক কথা। ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্য সচিবের বক্তৃতায় প্রকাশ, তাঁহারা শহরগুলিতে ক্রমান্বয়ে রেশনিংয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিবেন ; কোনও কোনও দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হইবে না ; তবে মূল্য যথাসম্ভব কমাইবার এবং সেই মূল্য স্থায়ী করিবার চেষ্টা হইবে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যেই অবাধ বাণিজ্যের কথা বিবেচনা করা হইবে না। ঘাটতি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি বাড়তি এলাকা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য আমদানীর জন্য সরাসরি চেষ্টা করিতে পারিবে। ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে অভাব দেখা দিয়াছে, যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করা হইবে ইত্যাদি। এসব কথা শুনিতে মন্দ নয় ; কিন্তু এগুলি কার্যে পরিণত করিবার মত সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপ্রণালীই আমরা ভারত গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্তের মধ্যে পাইতেছি না। ঘাটতি প্রদেশগুলি বাড়তি এলাকা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য আমদানীর জন্য সরাসরি চেষ্টা করিতে পারিবে। এই সিদ্ধান্ত অভাবগ্রস্ত প্রদেশগুলির পক্ষে উপরে উপরে আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু কার্যতঃ ইহা অভাবগ্রস্ত প্রদেশসমূহের সমস্যা সম্পর্কে নৈরাশ্যজনকই হইয়া দাঁড়াইবে। ঘাটতি প্রদেশ এবং বাড়তি প্রদেশগুলির মধ্যে খাদ্যর আমদানী-রপ্তানী লইয়া যে বিরোধ চলিতেছিল, এই সিদ্ধান্তে দেখা যাইতেছে যে, বাড়তি প্রদেশগুলিই সেক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছে। সম্মেলনে বাড়তি প্রদেশগুলির সকলেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে প্রকৃত পক্ষে তাহাদের বাড়তি খাদ্য নাই, ইহার ফলে কতটা খাদ্যদ্রব্য ঘাটতি প্রদেশগুলি সেসব প্রদেশ হইতে লইতে পারিবে তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিবার স্বাধীনতা বাড়তি প্রদেশসমূহের গভর্নমেন্ট লাভ করিয়াছেন। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ঘাটতি প্রদেশগুলি বাড়তি প্রদেশগুলির কাছে খাদ্যশস্য চাহিবার যে স্বাধীনতা ভারত গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্তে লাভ করিয়াছে, তাহার কার্যতঃ কোন মূল্যই নাই। চাহিবার স্বাধীনতা বড় কথা নয়, যদি না পাওয়া যায়, তবে চাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এই ক্ষেত্রে ঘাটতি প্রদেশগুলি বাড়তি প্রদেশ হইতে মাল আমদানী করিবার জন্য মালগাড়ির সুবিধা পাইবে, ভারত গভর্নমেন্ট এমন আশ্বাস দিয়াছেন ; কিন্তু কথা হইতেছে মালই যদি না মেলে তবে সে সুবিধাদানের আশ্বাসের কোন সার্থকতাই থাকে না। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এই কয়েক মাসেই আমরা ভালরূপে বুঝিয়াছি যে, গভর্নমেন্ট যদি এই ক্ষেত্রে ঘাটতি প্রদেশগুলিকে বাড়তি প্রদেশ হইতে সুবিধালাভের কার্যকর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারেন, তবে বাড়তি প্রদেশগুলির ঘাটতি প্রদেশের দাবি এড়াইবার কৌশল যথেষ্টই রহিয়াছে। ভাবত গভর্নমেন্টের খাদ্য বন্টন এবং সরবরাহ ব্যাপারে নিখিল ভারতীয় নীতি অবলম্বন না করাতেই এ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙলাদেশের নিদারুণ অবস্থা অবগত হইয়াও তাঁহারা এখনও পূর্ব নীতি ধরিয়া চলিবেন, সংকল্প করিয়াছেন ; সমস্যা সমাধানের জন্য ইহাতে তাঁহাদের আন্তরিকতার অভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের খাদ্যসচিব বলিয়াছেন, অবিলম্বে সর্বত্র কঠোরভাবে মজুত-বিরোধী খাদ্য

তল্লাসী অভিযান আরম্ভ হইবে। কর্তাদের মুখে ঐ এক কথাই আমরা বারংবার শুনিতেছি ; কিন্তু এই 'মজুত-বিরোধী' অভিযানের পরিণতি বাঙলা দেশে কি দাঁড়াইয়াছে, সে নজীর তো চোখের সামনেই রহিয়াছে। বাঙলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব কয়েকদিন আগে মজুত-বিরোধী আন্দোলনের ফল দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন, এই আন্দোলনের সুফল হয় নাই কে বলিবে? খাদ্যাভাবে গ্রামে গ্রামে লুঠতরাজ হইতেছিল, এই আন্দোলনের ফলে তাহা কমিয়াছে ; কিন্তু বাঙলার প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীনের মুখে আমরা শুনিতেছি যে, বাঙলা দেশের সর্বত্র অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া দূরের কথা বরং প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। খাদ্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, সিঁদ কাটা, চুরি এইগুলির সংখ্যাই অধিক। দেশব্যাপী অভাব অনটনের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে ; কিন্তু গভর্নমেন্ট এই সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে এখনও উদাসীনই রহিয়াছেন। পরাধীন ভারতবর্ষেই ইহা সম্ভব।

(৩২ আষাঢ় ১৩৫০)

খাদ্য সঙ্কটে ভারত সচিব

একটা ঐতিহাসিক জনশ্রুতি আছে যে, রোম নগরী যখন আগুনে ভস্ম হইতেছিল, রোম সম্রাট নিরো তখন বেহালা বাজাইতেছিলেন। সম্প্রতি ভারত সচিব মিঃ আমেরী বর্তমান খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে কমন্সসভায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে সেই জনশ্রুতির কথাই আমাদের মনে পড়িতেছে। পার্লামেন্টের জনৈক শ্রমিক সদস্যের একটি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন. কৃষকেরা বাজারে খাদ্যশস্য ছাড়িতে চাহিতেছে না ; আর পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে লোকে বেশি করিয়া খাইতেছে। সুতরাং ভারত সচিবের উক্তি অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য শস্যের অভাবের জন্য খাদ্যাভাব ঘটে নাই কিংবা লোকে খাইতে পাইতেছে না ইহাও সত্য নয়। খাদ্যশস্য যথেষ্ট আছে, লোকেও বেশি বেশি খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই যুদ্ধের বাজারে অন্য যাহারই সর্বনাশের আশঙ্কা ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষে পৌষ মাস দেখা দিয়াছে। ইহা চার্চিল পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলের মহিমা বলিতে হইবে। মিঃ আমেরীর উক্তি হইতে বুঝা যায়, জগতের লোককে সেই মহিমা উপলব্ধি করানোই তাঁহার মুখ্য প্রয়োজন ; ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থার বিচার তাহার কাছে বড় নয়। এদেশের বাস্তব অবস্থা কতটা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুইটি ঘটনা হইতে সে পরিচয় মিলিবে। ঢাকার ১৫ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ—

"গতকাল অপরাহ্নে ভিক্টোরিয়া পার্কে এ আর পি ডিপোর সম্মুখে একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থানে আবর্জনা ফেলিবার পাত্র হইতে ভিক্ষুকেরা প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য খুঁটিয়া খায়। একটি ভিক্ষুক রমণী অপর একটি ভিক্ষুক রমণীর সংগৃহীত খাদ্য ছিনাইয়া লওয়ায় শেষোক্ত ভিক্ষুক রমণী পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটির মাথায় একটি লৌহপাত্র দ্বারা আঘাত করে। ফলে তার ক্ষতস্থান হইতে ভীষণভাবে রক্ত পড়িতে থাকে এবং রক্তপাতের ফলে সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই বীভৎস দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। অতঃপর তাহাদের উভয়কেই প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।"

বরিশালের অন্তর্গত ভোলার ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ—

"অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট অদ্য এখানে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার চোখের সম্মুখেই

তিনজন হতভাগ্য তাহাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ইহারা খাদ্যের সন্ধানে সহরে আসিয়াছিল। শত শত ক্ষুধার্ত নরনারী, বৃদ্ধ, যুবক ও শিশু প্রত্যহ সহরে আসিয়া ভিড় করিতেছে। তাহাদের হৃদয় বিদারক কঙ্কালসার চেহারা দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।"

দেশের এই অবস্থায় ভারত সচিব কৃষকদের গোলাভরা ধান মজুত দেখিতেছেন এবং ভারতের অধিবাসীদের ভোজনোল্লাস ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন। ভারতের জনমতকে ব্রিটিশ কর্ণধারগণ কিরূপ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন এই উক্তিতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া গেল। এই শ্রেণীর লোকের সদিচ্ছায় আমরা স্বাধীনতা পাইব বা মানুষের অধিকার লাভ করিব, এমন বিশ্বাস এখনও যাঁহারা অন্তরে অন্তরে পোষণ করেন, তাঁহাদের জন্য আমাদের দুঃখ হয়। আজ কিছুদিন হইল দেখিতে পাইতেছি, বিলাত এবং ভারতবর্ষের ব্রিটিশ মিশনারীগণ ভারতের রাজনীতির অচল অবস্থাজনিত সমস্যার সমাধানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা উপদেশবাণী প্রচার করিতেছেন; ইঁহাদের প্রতি আমাদের এই নিবেদন যে, আমাদিগকে বুঝাইবার কিছুই নাই। কংগ্রেস সহযোগিতার সূত্রেই সব দাবি করিয়াছে, তাঁহারা আগে এ সম্বন্ধে তাঁহাদেরই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করুন।

(৭ শ্রাবণ ১৩৫০)

ভিক্ষুকের দেশ

কুমারী ফ্রোসি ফিল্ড কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বেকার সমিতির অনারারী সেক্রেটারী। ইনি সম্প্রতি কলিকাতার ভিখারীদেব সমস্যা সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। কুমারী ফ্রোসি শহরবাসীদিগকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় এবং পাড়ায় পাড়ায় যেসব ভিখারী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে কেহ যেন ভিক্ষা না দেন বা খাইতে না দেন! তাঁহার মতে ইহারা সকলেই ভিক্ষুক এবং ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ইহাদের একটা পেশা। এইভাবে অনায়াসে ইহাবা জীবিকার সংস্থান করিয়া লইতে চায়। কুমারী ফ্রোসি সাহেব পাড়ায় থাকেন। তিনি যদি দয়া করিয়া কলিকাতার উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলে এদেশী পাড়ায় ঘুরিয়া যাইতেন, তবে বুঝিতে পারিতেন, বর্তমানে কলিকাতার এই সমস্যা তিনি যতটা লঘুভাবে দেখিয়াছেন, ততটা লঘুভাবে দেখিবার মতো নয়। অন্নাভাবে অস্থিচর্মসার নরনারীর দল 'এক মুঠা ভাত দিন মা' বলিয়া দুয়ারে দুয়ারে ধুঁকিয়া ফিরিতেছে। ইহারা কলিকাতার ব্যবসাদার ভিখারীর দল নয়। অবস্থা বিপর্যয়ে বিড়ম্বিত নিরন্নের দল। এক মুঠা ভাত পাইলে, এক বাটি ফেন পাইলে ইহারা বাঁচিয়া যায়, ইহাদের এমন অবস্থা। কুমারী ফ্রোসি বলেন, কলিকাতায় বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে। সেইসব স্থানে গিয়া এসব কর্মক্ষম নরনারী শ্রমার্জিত অর্থে অন্নের সংস্থান করিতে পারে। আমরা ইহা মনে করি না। অন্নাভাবে সমগ্র জাতি আজ বিপন্ন হইতে বসিয়াছে। অবস্থা যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অচিরে যদি এই সমস্যার প্রতিকার না হয়, অর্থাৎ চাউলের দর না কমে, তবে রাস্তায় যাহারা ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে এবং কুমারী ফ্রোসি যাহাদিগকে ব্যবসাদার ভিখারী বলিতেছেন, তাহাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। আজ যে ঘরে আছে, পেটের দায়ে তাহাকে কল্য গিয়া রাস্তায় ভিখারীদের দলে যোগ দিতে হইবে। ইহাদের অনেকেই সেই ভাবে ভিখারীর সংখ্যা বাড়াইয়াছে। এ সমস্যা আজ প্রাদেশিক সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় ভিখারী, কিন্তু বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ভিক্ষার দায় একান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ অন্য সব

কথা চাপা দিয়া দেশের এই সমস্যা সমাধান কিভাবে সম্ভব হইতে পারে, সেজন্য চিন্তা করিতে হইবে। বড় বড় নীতির কথা আওড়ানই যথেষ্ট নয়—আপাতত প্রয়োজন নিরন্নের অন্ন সংস্থান করা, এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক অতুল চন্দ্র সেন মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করি। তিনি বলেন, "বর্তমান সময়ে ধনী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেছেন এবং আয়কর, অতিরিক্ত কর হিসাবে প্রচুর লভ্যাংশ গভর্নমেন্টকে দিয়াছেন ; তথাপি দেশের যে সকল নিঃসম্বল ব্যক্তির কোন মূল্যেই খাদ্য শস্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদিগের প্রতি ঐ সব বিত্তশালী সম্প্রদায়ের নৈতিক কর্তব্য অবশ্যই আছে। অন্যের উপর দোষারোপ বা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া আর মুহূর্তকাল নষ্ট করিবার সময় আমাদের নাই।" খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিবার কর্তব্য অবশ্যই গভর্নমেন্টের রহিয়াছে, যদি তাঁহারা সেই কর্তব্য পালন করিতে অসমর্থ হন, তবে অবস্থা ভীষণ আকার ধারণ করিবে, ইহা তো জানা কথা ; কিন্তু কোন মূল্যে খাদ্য ক্রয়ের সামর্থ্য যাহাদের নাই, তাহাদের জন্যও অন্ন সংস্থানের প্রয়োজন আছে। মরণের মুখ হইতে অন্নহীনদের বাঁচাইবার কর্তব্য সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য ; ইহা বিস্মৃত হইলে মনুষ্যত্বের কোন দাবি করা আমাদের পক্ষে শোভা পাইবে না।

(১৪ শ্রাবণ ১৩৫০)

দেশের দুর্দশা

"কলিকাতার ন্যায় শহরে অনাহারে লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে দেখা যাইতেছে এবং রাস্তার ফুটপাতে মৃতদেহসমূহ পতিত অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে। দলে দলে নরনারী শিশু সন্তানসহ অস্থিচর্মসার দেহ লইয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় একমুষ্টি অন্নের জন্য আর্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে। শহরের আবর্জনার আধারগুলি ঘিরিয়া ক্ষুধার্ত নরনারী অন্নের সন্ধান করিতেছে। কলিকাতা শহরের অবস্থাই যখন এইরূপ, তখন মফঃস্বলের লোকের যে কি দুর্দশা—সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে"—মারোয়াড়ী সাহায্য সমিতি সম্প্রতি একটি আবেদনে এই কথা বলিতেছেন। মিস মেয়ো তাঁহার বহুনিন্দিত মাদার ইণ্ডিয়া পুস্তকে কলিকাতা শহরের রাস্তায় মুমূর্ষু পশুর দেহ পতিত থাকে—এই বলিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন যে, এই সব মুমূর্ষু পশুগুলিকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হয় না অথচ সহৃদয় ব্যক্তিদিগকে এ-দৃশ্য দেখিতে হয়। তিনি বলেন, জগতের কোন সভ্য দেশের রাজপথে এ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কলিকাতার রাজপথে কিভাবে মানুষের মৃতদেহ দিনের পর দিন পড়িয়া থাকে, এই দৃশ্য আজ যদি তিনি দেখিতেন, তবে কি বলিতেন জানি না। সত্যই সভ্য দেশে এ দৃশ্য অন্য কোথাও দেখা যাইবে না। আমাদের নৈতিক দুর্দশা কতটা ঘটিয়াছে, ইহাই তাহার পরিচয়। ধনীর শহর কলিকাতা, শিক্ষিতের শহর কলিকাতা, বাঙলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান এই কলিকাতা। এখানে আজও মানুষ অন্নাভাবে মরিতেছে, অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য দরিদ্রের এখানে আশ্রয়টুকু পর্যন্ত নাই, তাহাদের শুশ্রূষার বিশেষ কোন বিধান নাই—একটা জাতির চরম নৈতিক অধঃপতন না ঘটিলে মানবতার প্রতি এমন নির্মম উপেক্ষা সম্ভব হইতে পারে না। অবস্থার তীব্র প্রতিক্রিয়া তবে আকাশ বাতাসকে তপ্ত করিয়াই তুলিত। সুখের বিষয় এই যে, এই নিদারুণ অবস্থার প্রতিকারের জন্য ইতিমধ্যে শহরে একটা সাড়া জাগিয়াছে। হিন্দু মহাসভা, মারোয়াড়ী সেবা সমিতি নিরন্নের অন্ন সংস্থানের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। ডক্টর

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহায্য সমিতির পক্ষ হইতে এই সেবাকার্যে অগ্রসর হইবার জন্য শহরের যুবকদিগকে স্বেচ্ছাসেবকের ব্রত গ্রহণের নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন। নিরন্নের এই সেবাকার্যে মহিলাগণও ব্রতী হইয়াছেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মিগণ শহরের পল্লীতে পল্লীতে আর্তনারীদের ক্লেশ প্রশমণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটি মহিলা সমিতির চেষ্টায় একশত শিশুর খাদ্য সরবরাহের জন্য তিনটি সত্র খোলা হইয়াছে। শহরের সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক; সুতরাং ব্যাপকভাবে ইহার সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। সেজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন এবং অনেক কর্মীও আবশ্যক! ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সম্প্রতি এই সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, শহরবাসী বিপন্ন জনগণের অন্নদান কার্যের জন্য বঙ্গীয় সাহায্য সমিতি প্রায় তিন লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। মারোয়াড়ী সেবা সমিতিও প্রায় ঐ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বুভুক্ষিতের অন্ন সংস্থান করিবার সদুদ্দেশ্যে যাঁহারা আজ এইভাবে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, সমগ্র জাতির তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু শুধু এইভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চেষ্টায় দেশের ব্যাপক অন্ন সমস্যার প্রতিকার সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কলিকাতার সমস্যাই একমাত্র সমস্যা নয়, মফঃস্বলের দুর্দশা আরও ভীষণ। সাধারণভাবে খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস করিবার ব্যবস্থা ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে না। সে কর্তব্য গভর্নমেন্টের উপর কিন্তু ভারত সরকারের হইতে এ পর্যন্ত বাঙলার দুর্দশা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট কোন আশা ভরসা আমরা পাইতেছি না। বাঙলার খাদ্যাভাব নিরাকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক মাস পূর্বে ভারত গভর্নমেন্ট বাঙলা দেশ এবং পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশে খাদ্যশস্যের বিকিকিনি অবাধ করিয়া দিয়াছিলেন ; ১লা আগষ্ট হইতে সেই বিধান প্রত্যাহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন প্রদেশ এই সুযোগে পুনরায় বাঙলা দেশে খাদ্য রপ্তানী নিষিদ্ধ করিতে শুরু করিয়াছে। এদিকে লাভখোরদের ইহাতে সুবিধা হইয়াছে। বাঙলার খাদ্য সচিব ইহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া সম্প্রতি একটি ইস্তাহারে বলিয়াছেন যে, তিনি চাউলের দর সত্বরই বাঁধিয়া দিবেন এবং সে দর বর্তমান বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম হইবে। খাদ্য সচিব আশু ধান্যের ভরসা করিয়াছেন ; কিন্তু বাঙলা দেশের সর্বত্র খাদ্যশস্যের যেরূপ ঘাটতি, তাহাতে আশু ধান্যের দ্বারা এই অভাব সামান্যই পূরণ করিবার সম্ভাবনা আছে। বাঙলা দেশের বাহির হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা ব্যতীত এ অবস্থার প্রতিকার সম্ভব নহে। ফাঁকা কথায় এ সমস্যার সমাধান হইবে না। বুভুক্ষিতের মুখে অন্ন সংস্থানের এ সমস্যায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন অন্ন সরবরাহের উপযুক্ত ব্যাপক এবং কার্যকর পরিকল্পনা। বাঙলা দেশের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে তেমন পরিকল্পনা অবলম্বনের কোন পরিচয়ই আমরা পাইতেছি না। যে-সব প্রদেশে খাদ্য শস্য বাড়তি আছে, সেই সব প্রদেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিয়া বাঙলাদেশের অভাব মিটাইবার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত অধিকারের মর্যাদা সে ক্ষেত্রে ভারত সরকারের কাছে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; স্বায়ত্তশাসনের সত্যকারের মর্যাদা যদি তাঁহারা স্বীকার করিতেন, তবে অবশ্য এ যুক্তি খাটিত ; কিন্তু ভারতব্যাপী অর্ডিন্যান্স শাসন অবলম্বনের ক্ষেত্রে সে মর্যাদার প্রশ্ন কেন্দ্রীয় শাসকেব কর্তাদের কাহারও মনের কোণে কোন দিন যে দেখা দেয়, ইহা তো মনে হয় না।

(২১ শ্রাবণ ১৩৫০)

দুর্দশার প্রতিকার

ভারত সরকারের নূতন খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বর্তমান সমস্যার প্রতিকার করিবেন বলিয়া অনেক বড় বড় কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন ; কিন্তু যেখানে উদরের জ্বালা সেখানে শুধু বড় কথা সান্ত্বনার কারণ হয় না ; পক্ষান্তরে সেসব বিরক্তিরই কারণ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বাকী কিছুই নাই। কলিকাতার রাস্তা হইতে দুই দিনে শতাধিক অন্নাভাবে মুমূর্ষু লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, ইহাদের মধ্যে চৌদ্দজন হাসপাতালে ভর্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়াছে; অবশ্য এই দিন মুমূর্ষুদের সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। মফঃস্বলের অবস্থা আরও শোচনীয়। এক মাদারীপুরে তিন সপ্তাহে রাস্তা হইতে ৪০টি মৃতদেহ সরাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। এ অবস্থার প্রতিকার কী? মানবতার এই প্রশ্নই আজ সকলের চেয়ে বড় হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যত্ব সত্যই আমাদের আছে কি না, আজ কার্যের দ্বারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় আসিয়াছে। বাঙলা দেশে গাড়ি গাড়ি ভর্তি করিয়া খাদ্য শস্য পাঠান হইতেছে, স্যার জওলাপ্রসাদ, স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল এ সংবাদ আমাদিগকে শুনাইয়াছেন ; কিন্তু এইসব খাদ্যশস্য কোথায় যাইতেছে, আমরা তাহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি; কারণ চাউল কিংবা আটা ময়দা কলিকাতার বাজারে দুই-ই মহার্ঘ্য এবং দুইয়ের কোনটারই দর কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। লোকে যদি বাজারে জিনিসই না পাইল, তবে সরকারী সরবরাহ প্রণালীর সার্থকতা থাকে কোথায়? কোন যাদু মন্ত্রে এইসব খাদ্যশস্য অন্তর্হিত হইতেছে অথবা গোপন গুদামে কেমন করিয়া ভর্তি হইতেছে আমরা ভাবিয়া পাই না। স্যার জওলাপ্রসাদ বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু খাদ্য বিভাগের জেনারেল সেক্রেটারী মেজর জেনারেল উডের মতে যথেষ্ট জাহাজের অভাবে বিদেশ হইতে ভারতে খাদ্যশস্য আমদানী করা এক প্রকার অসম্ভব। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব খাদ্য সচিব স্যার আজিজুল হক দুইখানা কল বিগড়ানো জাহাজের কথা শুনাইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এদিকে দেখা যাইতেছে যে, ভারত ছাড়া অন্য দেশে খাদ্যশস্য পাঠাইবার বেলায় জাহাজের কোন অপ্রতুলতাই ঘটে না। ভারত হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য পারস্য দেশে প্রেরণ করিয়া কিভাবে সে দেশের দুর্ভিক্ষ দূর করা হইয়াছিল, কিছুদিন পূর্বে ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আমাদিগকে তাহা জানাইয়া কৃতার্থ করেন। সম্প্রতি কলিকাতা হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাতে বহু পরিমাণ চাউল রপ্তানী করা হইতেছে—ভারতীয় বণিক সমিতি এইরূপ অভিযোগ করেন, ভারত সরকার ইহার একটি মামুলী প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালে, অর্থাৎ বাঙলা দেশে এই অন্নাভাবের দৈন্যের মধ্যেও ভারতবর্ষ হইতে ৭২৭ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে ; তবে তাহা বিদেশীর সুবিধার জন্য নয় ; প্রধানত প্রবাসী ভারতবাসীদের জন্যই এই চাউল প্রেরিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পারস্য উপসাগরের বন্দর দিয়া ১৯৪৩ সালে ভারত হইতে আরও দুই হাজার টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, প্রবাসী ভারতবাসীদের জন্য ভারত হইতে যদি চাউল বিদেশে রপ্তানী করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষে যে সব বিদেশী আছে, তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যও ভারতের এই অন্নাভাবের দিনে বিদেশ হইতে কেন আনা হইবে না, এ প্রশ্ন করা যাইতে

পারে। মার্কিন সমর বিভাগ প্রচারিত একটি সংবাদে সম্প্রতি বলা হইয়াছে যে, গ্রীসের অন্নাভাবক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যের জন্য আমেরিকার নিউ ইয়র্ক বন্দর হইতে কিছুদিন হইল ১৫ হাজার টন খাদ্যশস্য তিনখানা জাহাজ ভর্তি করিয়া পাঠানো হইয়াছে। এই সংবাদের উপর টিপ্পনী করিয়া "সায়েন্স এণ্ড কালচার" পত্র লিখিয়াছেন—"গ্রীস শত্রুদের অধিকৃত দেশ। সেখানে খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতে হইলে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সমিতির মারফতে অনেক লেখালেখি করিতে হয় এবং নিরপেক্ষ কোন শক্তির নিকট হইতে এজন্য জাহাজ যোগাড় করাও সহজ নহে ; অথচ আমেরিকা কিংবা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে খাদ্যশস্য প্রেরণ করিতে হইলে এগুলির কিছুই দরকার হয় না ; কিন্তু ভারতের জন্য এমনভাবে খাদ্যশস্য পাঠানো হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে তবে কারণ কি?"

আমেরিকা হইতে প্রকাশিত "সায়েন্স" পত্র কিছুদিন পূর্বে লিখিয়াছিলেন যে, আমেরিকা এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তরফ হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য উত্তর আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত মরক্কো, আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়ায় প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পূর্বেও হইয়াছে। রয়টারের সংবাদেও আমরা এই সংবাদের সমর্থন দেখিতে পাই। ২৪শে জুলাই ভারতে রয়টারের প্রেরিত একটি সংবাদে প্রকাশ পায় যে, গ্রেট ব্রিটেন হইতে গত ৫ মাসে ফরাসী অধিকৃত উত্তর আফ্রিকায় কয়লা এবং খাদ্যশস্যে ৩ লক্ষ টনের অধিক মাল জাহাজযোগে প্রেরিত হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জাহাজ কিংবা খাদ্যশস্য অন্য দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সেগুলির অপ্রতুলতা কিছুই নাই ; কেবল ভারতের বেলাতেই এগুলি জুটে না। বড়লাটের শাসন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ভারতবাসী, সুতরাং ভারতে শাসন কর্তৃত্ব ভারতবাসীদের হাতে গিয়াছে, ভারতসচিব আমেরী প্রভৃতির যুক্তির ইহাই পরিণতি।

(৪ ভাদ্র ১৩৫০)

ঔদাসীন্যের ফল

আমরা পূর্বেও বহুবার বলিয়াছি এবং এখনও সেই কথাই বলিতেছি যে, বাঙলা দেশে বর্তমানে যে অতি ঘোর অন্ন-সংকট দেখা দিয়াছে, ভারত সরকারের ঔদাসীন্য এবং সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে অসঙ্গত শিথিলতারই তাহা ফল। যুদ্ধের অনিবার্য ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে তাকাইয়া যদি তাঁহারা পূর্ব হইতে কিছুমাত্র সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, তবে সমস্যা এরূপ জটিল আকার ধারণ করিত না। অধিকন্তু যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও এমন ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে, তাহার কিছুই সুফল হয় নাই। ভারত সরকারের "খাদ্য আন্দোলনের" পরিণতি দেখিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা কিছু প্রমাণিত হইবে। গত বছরের চেয়ে বেশি পরিমাণ জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ এ বৎসর করা হইয়াছিল ; কিন্তু হিসাবে দেখা যায়, উৎপন্ন মালের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হইয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সেদিন রাষ্ট্রীয় পরিষদের হিসাব দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪২-৪৩ সালে যত জমিতে গম এবং চাউলের আবাদ হয়, তাহা গত পাঁচ বৎসরের অপেক্ষা কম। খাদ্য সমস্যার সমাধানে সরকারী কর্মনীতির সফলতার এইরূপ নজীর। সর্দার সন্ত সিং পাঞ্জাবের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন সে পাঞ্জাবে যথেষ্ট পরিমাণ গম ক্রেতার হিসাবে [যদ্দৃষ্ট]পড়িয়া আছে, অথচ কলিকাতা শহরে আটা ময়দা দুষ্প্রাপ্য। বাঙলা দেশে চালান দিবার জন্য দিল্লীতে যে সব খাদ্যশস্য মজুত করা হইয়াছিল, সেগুলি শুনিতেছি, এখনও বস্তাবন্দী

অবস্থায় পতিত আছে ; এদিকে নিরন্নের হাহাকারে বাঙলা দেশের আকাশ বিদীর্ণ হইতে বসিয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কর্তাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, উদরের জ্বালার ব্যাপার যেখানে, সেখানে সর্বাগ্রে তাহাই প্রশমন করা কর্তব্য এবং সেজন্য সুনির্ধারিত নীতি প্রয়োগ করাও প্রয়োজন ; কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তেমন নীতি প্রয়োগের কার্যকর কোন পরিচয় পাইতেছি না।

(৪ ভাদ্র ১৩৫০)

কলিকাতার রাস্তায় মৃতদেহ

বাঙলা সরকার নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন—

"সম্প্রতি ইহা জনসাধারণের সমালোচনার বিষয় হইয়াছে যে, অনাহার কিংবা অল্পাহারের ফলে রাস্তায় মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত লোকদিগকে কলিকাতার হাসপাতাল সমূহে ভর্তি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করা হইয়াছে। গভর্নমেন্ট এইরূপ ব্যক্তিদের চিকিৎসার একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করিল। এতদনুসারে তাঁহারা ক্যাম্বেল হাসপাতালে এবং বেহালাস্থ নিউ এমারজেন্সি এ. আর. পি. হাসপাতালে এরূপ ব্যক্তিদিগকে ভর্তি ও চিকিৎসা করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাদিগকে পীড়া কিংবা অল্পাহারজনিত দুর্বলতার ফলে রাস্তায় অচল অবস্থায় দেখা যাইবে ; জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, কেহ যদি কোন লোককে রাস্তায় অবসন্ন বা অচল অবস্থায় দেখিতে পান, তবে যেন তৎক্ষণাৎ সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ পুলিশ অফিসারের নিকট কিংবা এ. আর. পি. ওয়ার্ডেন পোষ্টে সংবাদ দেন।"

পূর্বে শুশ্রূষা কিংবা খাদ্য-সংস্থানের উপযোগী ব্যবস্থার অভাবের ফলে যে সব হতভাগ্য রাস্তায় শেষ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত, তাহাদের সম্বন্ধে এতদিনে যে এমন একটা ব্যবস্থা করা এদেশে সম্ভব হইয়াছে, ইহাও আশার কথা বলিতে হইবে। কলিকাতা শহরে এক হাজার লোকের আশ্রয়ের উপযুক্ত নিরাশ্রয় লোকেদের আশ্রয়ের জন্য একটি বাড়ি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; ইহা ছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে অন্নহীনদিগকে অন্নসত্রসমূহ হইতে অন্নও বিতরণ করা হইতেছে। প্রত্যহ সংবাদপত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি ; কিন্তু তথাপি শহরের রাস্তায় অন্নহীনদিগকে এইরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে ; এতদ্দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে সাহায্যের জন্য যেসব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহা পর্যাপ্ত নয় এবং যথোচিতভাবে সেগুলি পরিচালিত হইতেছে না। আমাদের মতে ব্যাধির প্রতিকার করার চেয়ে লোকে যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত না হয়, তাহাই করা দরকার ; নতুবা হাসপাতালে কুলাইবে না। অন্নাভাবজনিত এ ব্যাধির প্রতিকারের জন্য যদি ব্যাপকভাবে অন্ন সংস্থানের চেষ্টা না হয়, তবে গোটা বাঙলা দেশটিকে মুমূর্ষুর হাসপাতালে পরিণত করিতে হইবে এবং চারিদিকে শ্মশানের আগুন জ্বলিবে।

(৪ ভাদ্র ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে

বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতা শহরের রাজপথ হইতে প্রত্যহ গাড়ি ভর্তি করিয়া মুমূর্ষু নরনারীকে হাসপাতালে লওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়া বহু মৃতদেহও অপসারিত করা হইতেছে। সমৃদ্ধশালী

শহরে নানাস্থানে অন্নসত্র রহিয়াছে তাহা সত্ত্বেও এই অবস্থা। মানুষ আবর্জনা স্তূপ হইতে উচ্ছিষ্ট কণা সংগ্রহ করিবার উৎকণ্ঠায় কুকুর বিড়ালের সহিত লড়াই করিতেছে। গ্রামের অবস্থা যে কি ভীষণ তাহা তো ভাষায় বর্ণনাই করা যায় না। অথচ ইহাতেও নাকি দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই এবং বাঙলাদেশকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিবার মত সমস্যা সৃষ্টি হয় নাই। এক্ষেত্রে সরকারী ভাষ্য মতে দুর্ভিক্ষ শব্দের অর্থকে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের সম্বন্ধে সরকারী দায়িত্ব সম্পর্কে যে বিধান আছে সে বিধানের সার্থকতা কার্যত কি থাকিতে পারে, আমরা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব খাদ্যসচিব স্যার আজিজুল হক বিশেষ বিনয় সহকারে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, কোন অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিলেই হয় না ; সেই সঙ্গে সরকারের দায়িত্বও আছে। এ যুক্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে, সে দায়িত্ব প্রতিপালনে সরকারের কর্তব্য রহিয়াছে বলিয়া তো আইনও আছে। সরকার অন্য সকল দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহাদের অক্ষমতা শুধু এই বেলায়। একটা দেশের শাসন ব্যাপার সম্পর্কে দায়িত্ব লইয়া যাঁহারা এই ধরনের যুক্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। আমাদের মতে বাঙলার অবস্থা যেরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, বাঙলা সরকার কর্তৃক খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সে সমস্যার সম্যক সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। তাঁহারা খাদ্য শস্যের যে দর বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহাও কম নয়। সে মূল্য দিয়া খাদ্যশস্য কিনিবার সামর্থ্য অনেকেরই নাই। এরূপ অবস্থায় বাঙলা দেশকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেশবাসীর অন্ন সংস্থানের দায়িত্ব সাক্ষাৎ সম্পর্কে সরকারের গ্রহণ করা কর্তব্য।

(১১ ভাদ্র ১৩৫০)

প্রতিকার কোথায়

বাংলা দেশের সর্বত্র অন্নাভাবে হাহাকার ; অন্নাভাবে এমন হাহাকার এদেশের লোকের অনেকটা গা-সহা হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং এদেশের উপরওয়ালাদের অনেকের কাছে— 'ইহ বাহ্য'। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত গভর্নমেন্টের হোম সেক্রেটারী মিঃ কনরন স্মিথের বক্তৃতাতেই ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি বাঙলা দেশের নিদারুণ অবস্থাকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে এই সব নাটকীয় ভঙ্গীতে অতিরঞ্জিত করা রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রচার মাত্র ; কিন্তু কথা এই যে, কলিকাতার রাস্তায় এই যে নিরন্নের অভিযান ইহাও কি মায়া বা ঐন্দ্রজালিক সূত্র-ক্রীড়ার মত ব্যাপার ; কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে অনাহারজনিত মৃত্যুর যে হিসাব প্রত্যহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, সে সবও কি মিথ্যা—না, এ সব মৃত্যু মৃত্যুর হিসাবে ধর্তব্য নয়? অন্নাভাব এবং তজ্জনিত হাহাকার এদেশের একদল লোকের চিরদিনই আছে, এদেশের শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত দায়িত্বসম্পন্ন কোন কোন ব্যক্তির মুখে এমন যুক্তি এখনও আমরা শুনিতেছি—কিন্তু অন্নাভাবে—এইভাবে মানুষের মৃত্যু ইহাও কি গতানুগতিকভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে এবং কোন সভ্য গভর্নমেন্টের পক্ষে তাহা কর্তব্যের পরিচায়ক হইতে পারে? বিহারের গভর্নর স্যার টমাস রাদারফোর্ড বাঙলা দেশের নূতন গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙলা দেশের কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বে বিহারের গভর্ণররূপে তিনি সেদিন রাঁচীতে একটি বক্তৃতায়

বলিয়াছিলেন, "বাঙলায় যাহা ঘটিতেছে, বিহারে যাহাতে সেরূপ না ঘটে সর্ব প্রযত্নে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আমি একান্তভাবে এই আশা করি যে, আমাদের এই প্রচেষ্টায় ব্যবসায়ী মহলের নিকট হইতে আমরা সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিব। চাউলের মূল্য হ্রাস করিয়া আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ নাগাৎ মোটা চাউলের পাইকারী মূল্য প্রতি মণ ৯ টাকা এবং মাঝারী চাউলের পাইকারী মূল্য প্রতি মণ ১০ টাকা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।" স্যার টমাস যদি বাঙলার গভর্নররূপে এইরূপ ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিতে পারেন, তবে আমরা তাঁহার জয়গান করিব। কিন্তু শুধু কথায় এখন আর সান্ত্বনা পাই না, কারণ চাউলের মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে এ পর্যন্ত উপরওয়ালাদের তরফ হইতে যত প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটিও একটুও কাজে আসে নাই। এক্ষেত্রে ইহাও বিবেচ্য যে, চাউলের দর কমান অর্থ, সরকারী খাতাপত্রে কিংবা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে কমানোই নয় ; কম দরে সাধারণে বাজারে চাউল পায়, এইভাবে কমানো দরকার ; তাহা হইবে কি? বাঙলা দেশের খাদ্যসচিব চাউলের দরও সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সরাসরি কমাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি দর বাঁধিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু সে দরে বাঙলা দেশের কোথাও চাউল পাওয়া যায় না ; অধিকন্তু চাউলের দর বাঁধিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে চাউল বহুস্থানেই বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে ; এরূপ অবস্থায় সরকারী বিজ্ঞপ্তির বাঁধা দর পড়িলেই দেশের লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে কি? আমরা পূর্বেই বহুবার বলিয়াছি এবং বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহাদের একটু জ্ঞান আছে, তাঁহারা তো একথা বুঝিতেই পারেন যে, গভর্নমেন্ট যদি তাঁহাদের নির্দিষ্ট দরে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা না রাখেন, তবে কলমের ঢেরা সহিতে দ্রব্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণের কিছুমাত্র মূল্যই থাকে না। কোন ব্যবসায়ী নির্ধারিত মূল্যে চাউল দিতে অস্বীকার করিলে থানায় জানাইতে হইবে ; ইহা তো বুঝা গেল ; কিন্তু এক বেলা চাউলের জন্য যাহাদিগকে দোকানে দোকানে ঘুরিতে হয় ; অনাহারে পুলিশের কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাহাদের উদরান্নের সংস্থান হয় না বরং সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হইবার ভয়ের কারণ ঘটে।

সরকারী বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে বাঙলা দেশের কয়েকটি জেলাকে উদ্বৃত্ত জেলা বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাঙলা সরকার সেইসব জেলা হইতে 'আউস' ধান ক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। উদ্বৃত্ত জেলা নির্ধারিত করিবার এই সিদ্ধান্ত কোন্ ভিত্তিতে করা হইল, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই ; কারণ ঐ সব জেলায় চাউলের মূল্য এখনও সরকারী সর্বোচ্চ মূল্যের অপেক্ষা অনেক বেশি রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে চাউল সংগ্রহ করাই দুর্ঘট হইয়াছে। তারপর সরকার এইভাবে চাউল ক্রয় করিয়া কি করিবেন? সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে ঐ সব চাউল সরবরাহ করা হইবে। এ ব্যবস্থা সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে যে, দেশবাসীর অন্ন সংস্থানের ভার যদি সরকার গ্রহণ করেন, তবেই জনসাধারণ এ ব্যবস্থার সার্থকতা সহজভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। আমাদের মতে সমগ্র বাঙলা দেশকে "দুর্ভিক্ষপীড়িত" অঞ্চল ঘোষণা করিয়া সরকারের তাহাই করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে ; নতুবা সাময়িক এবং আংশিক জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থায় বাঙলা দেশের এমন ব্যাপক সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইতে পারে না। বাঙলা সরকার সত্যই যদি এ সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন, তবে সরবরাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে পাকা বন্দোবস্ত করিয়া অবিলম্বে এইদিক হইতে তাঁহাদিগকে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। নতুবা দেশের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হইয়া উঠিবে ; কিন্তু সমগ্র জাতি তাহাতে রক্ষা

পাইবে না। বাঙলার সমস্যা আজ একটা জাতির জীবন-মরণের সমস্যা এবং সে সমস্যা সমাধানের জন্য আনাড়ীর মত পরীক্ষা চালাইবার অবসর নাই।

(২৫ ভাদ্র ১৩৫০)

শহর হইতে লোকাপসরণ

সুদীর্ঘকাল খাদ্যাভাবে বিপন্ন হইয়া বাঙলার গ্রাম অঞ্চল হইতে অনশনক্লিষ্ট জনতা বাঙলার রাজধানী ধনী এবং বিলাসীর শহর কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ইহাদের আশা ছিল, অন্তত এখানে আসিয়া তাহারা না খাইয়া মরিবে না ; কিন্তু তাহাদের আশা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। কতকগুলি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইতে ইহাদিগের কষ্টের লাঘব করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাই করা হইয়াছে ; কিন্তু এইভাবে শুধু বে-সরকারী চেষ্টায় এ সমস্যার সম্পূর্ণ প্রতিকার করা সম্ভব নয় ; শহরের বিভিন্ন অন্নসত্রে ইহাদের কতক অংশের অন্নে কিছু সংস্থান হইলেও ইহারা আশ্রয় পায় নাই ; যথোচিত চিকিৎসা বা শুশ্রূষা লাভ করে নাই। ইহার ফলে ইহাদের অনেকে শহরের রাজপথেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে ; কেহ কেহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার পরও মারা গিয়াছে। কিন্তু সভ্য এবং শিক্ষিতের শহর এই কলিকাতা, এখানকার স্বাস্থ্যবিধান পলকা। গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র এবং বুভুক্ষিত জনতার চাপে সে বিধান ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয় আছে ; তাই ইহাদিগকে বাহিরে সরাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেদিন বাঙলার রাজস্বসচিব সাংবাদিকদের এক সভায় এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্ধারিত পরিকল্পনা আমাদের নিকট উপস্থিত করেন। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে শহরবাসীর দিক হইতে এ সম্বন্ধে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার অপেক্ষা আশ্রয়প্রার্থীদের দিক হইতে আমরা এই সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি। শহরবাসীদের নিরাপত্তা কিংবা নির্ঝঞ্ঝাট হইবার প্রশ্ন এক্ষেত্রে আমরা মানবতার বিরোধী মনে করি। আমরা জানি, গ্রাম অঞ্চল হইতে ক্রমাগত যদি এইভাবে নিরন্ন জনশ্রেণী শহরের অভিমুখে ক্রমাগত আসিতেই থাকে, তবে গ্রামসমূহ ধ্বংস হইবে। চাষ-আবাদ সব বিপর্যস্ত হইবে। অন্নসত্রে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা একটা জাতির সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। এ অবস্থায় যাহাতে ইহারা নিঃশঙ্কচিত্তে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহের ভরসা পাইয়া গ্রামে ফিরে, এমন ব্যবস্থা করা দরকার। রাজস্বসচিব আমাদের নিকট সেদিন যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকটি স্থানে ক্যাম্প খুলিয়া সাময়িকভাবে এই নিরন্নের দুঃখ লাঘব করিবারই প্রস্তাব রহিয়াছে ; কিন্তু এমন সাময়িক ভিক্ষান্ন বিতরণের দ্বারা এ সমস্যার প্রতিকার হইবে না। এই সব নরনারী যাহাতে নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তেমন দীর্ঘকালীন এবং ব্যাপক সাহায্য পরিকল্পনা অবলম্বন করা সরকারের পক্ষে প্রয়োজন। যদি তেমন ব্যবস্থা না করা হয়, তবে বাঙলা দেশের জনসাধারণের একটা বড় অংশ ভিখারীতে পরিণত হইবে এবং তাহাদের আর্তনাদ শহরের অধিবাসীদের কর্ণে পৌঁছিয়া তাঁহাদের হয়তো নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইবে না ; কিন্তু সমগ্র বাঙলা দেশের আকাশ-বাতাস সে আর্তনাদে প্রপীড়িত হইবে।

(২৫ ভাদ্র ১৩৫০)

ছাত্র সমাজের জাগরণ

নিরন্নের আত্মদান সেবায় কর্তব্য প্রতিপালনের দিকে বাঙলার ছাত্র সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণা প্রত্যেক দেশেই ছাত্র সমাজের অন্তরকে প্রথম স্পর্শ করে এবং সেই সূত্রে সমাজের সর্বাংশে তাহা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সেবাব্রতের এই আদর্শ আজ তরুণদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করুক—এবং এই দুর্দৈবের চাপে সংকীর্ণতার যত দৈন্য ও দুর্বলতা জাতির অন্তর হইতে দূর হইয়া যাউক, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। ভিক্ষাবৃত্তির পথে এ সমস্যা মিটিবে না। আমরা জানি এবং অন্নসত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারাও এই ব্যাপক সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা কিছু মাত্র নাই ; কিন্তু মানবতার প্রবৃত্তি ঐসব পথের ভিতর দিয়া যদি স্ফূর্তি পায়, তবে সেদিক হইতেও জাতির একটা বড় লাভ আছে। বাঙলার ছাত্র সমাজ আজ সেই মানবতার বাণীই এই অবসন্ন জাতির প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া তুলুন। চোখের সামনে মানুষ অনাহারে এবং বিনা শুশ্রূষায় প্রাণ ত্যাগ করিবে, অথচ তাহার প্রতীকার হইবে না, এ জাতিকে এমন কলঙ্কের বোঝা যেন আর বহন করিতে না হয়।

(২৫ ভাদ্র ১৩৫০)

বাঙলার অবস্থা

স্যার জগদীশ প্রসাদের নাম সকলেই জানেন। কিছুদিন তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত ছিলেন। বাঙলা দেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন—

ফরিদপুরের একটি লঙ্গরখানায় আমি একজন লোককে কুকুরের মত খাদ্য লেহন করিতে দেখি। প্রত্যহ পথিপার্শ্ব হইতে মৃতদেহ অনশনক্লিষ্ট রুগ্ন নরনারীকে অপসারিত করা হইতেছে। একজন লোক খাদ্যান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া কালেক্টরের আদালতের দ্বারে উপস্থিত হয় এবং তথায় সিঁড়িতে পড়িয়া মারা যায়। তাহার মৃতদেহ অপসারণ করিবার সময় এক কোণে আড়ষ্টভাবে উপবিষ্ট একটি নারী একটা পুটুলী ঠেলিয়া দিয়া বলে—"এটাও লইয়া যাও।" ঐ পুটুলীতে তাহার সন্তানের মৃতদেহ ছিল।

আমাদের নিকট অবশ্য এই বর্ণনায় নূতনত্ব কিছুই নাই। কলিকাতার মত ধনীর শহরে অবস্থান করিয়াও আমরা অনুরূপ ঘটনা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি, মফস্বলের অবস্থার কথা না বলাই ভাল। আমাদের এমন সংবাদ প্রচারের প্রয়োজন না থাকিলেও বাঙলা দেশের বাহিরের লোকের পক্ষে সে প্রয়োজন রহিয়াছে। এই ধরনের সংবাদ প্রচারের ফলে বাঙলা দেশের প্রকৃত অবস্থা বাহিরের লোকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে এবং চারিদিক হইতে বর্তমান বিপদে বাঙলাদেশকে সাহায্য করিবার জন্য মানবতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাঙলা সরকার ইহার মধ্যে হঠাৎ এ সম্বন্ধে নূতন মতিগতি অবলম্বন করেন। তাঁহারা কলিকাতা শহরে যেসব নরনারী অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে কিংবা রুগ্ন অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হইতেছে, সরকারী সূত্র হইতে তাহাদের সংখ্যা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। মঙ্গলবারের দৈনিক সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে, বাঙলা সরকার প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের মৃত্যু সংবাদ এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে

ভর্তি করার খবর পুনরায় প্রকাশ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন এই যে, এই সংবাদ প্রকাশ কোন প্রয়োজনে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল? মামুলী যুক্তি অনুসারে এক্ষেত্রেও যদি ভুল বুঝিয়া করা হইয়া থাকে, তবে এমন ভুল হয় কেন? প্রচার বিভাগের ডিরেক্টরের এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, যেসব ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার অধিকাংশই অবহেলার দরুণ রোগ কঠিন আকার ধারণে ঘটিয়াছে। নিশ্চয়ই মৃত্যুর গুরুত্ব লাঘব করিবার পক্ষে এ যুক্তি খাটে না এবং ডিরেক্টর মহাশয় যে মূল্যবান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেজন্য বিশেষ গবেষণা করিবারও প্রয়োজন ছিল না। শহরের আশ্রয়প্রার্থীদের দুর্দশা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন ; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, অবহেলার দরুণ রোগ কঠিন আকার ধারণ করিয়া এই সব নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইল কেন। যথাসময়ে ইহাদের শুশ্রূষা, খাদ্যদান এবং আশ্রয় বিধান করিলে নিশ্চয়ই ইহারা এভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। বাঙলা দেশের রাজধানী কলিকাতায় যাহারা আশ্রয় লইয়াছে, তাহারাই যদি এইভাবে যথাসময়ে শুশ্রূষা ও খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা অবলম্বন না করার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে মফঃস্বলে যে কি অবস্থা ঘটিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। উৎকট রকমের অস্বাভাবিক না হইলে মফঃস্বলের অনশন সম্পর্কিত অবস্থার বিশেষ কোন সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশ আজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে ; মৃত্যুর ভয়াবহ লীলা আজ যেভাবে এই অভিশপ্ত দেশে দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুল্য ঘটনা বিরল। এই অবস্থার প্রতিকার হইবে কি না জানি না ; কিন্তু যদি না হয়, তবে বাঙালী সমাজের দুই তিন পুরুষ একত্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। বাঙলার ব্যাপক অঞ্চল জনহীন অরণ্যে পরিণত হইবে।

(১ আশ্বিন ১৩৫০)

কার্যকর ব্যবস্থার পথ

আমরা বহুপূর্বে শুনিয়াছি, একবার ফরিদপুরে প্রবল অন্নাভাব দেখা দেয় ; তথাপি স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট 'দুর্ভিক্ষ' বলিতে রাজী না হইয়া বলে,—'গাছে এখনও পাতা আছে, স্ত্রীলোকও কুলত্যাগ করেন নাই, সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয় নাই।' কিন্তু বাঙলার অবস্থা আজ অবর্ণনীয়। স্যার জগদীশেরই ভাষায় বলিতে হয়, 'স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে বাঙলা দেশে এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা যায় নাই।' বাঙলার খাদ্যসচিব বলিয়াছেন যে, তিনি দুর্ভিক্ষ ঘোষণা না করিলেও দুর্ভিক্ষাবস্থা স্বীকার করিতেছেন এবং সেই ভিত্তিতে সাহায্যমূলক কর্মনীতি নির্ধারণ করিতেছেন। কিন্তু স্যার জগদীশ সম্প্রতি যে বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি বলেন, সরকারী অন্নসত্রসমূহে যে পরিমাণ খাদ্য মণ্ড বিতরণ করা হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা মানুষকে বাঁচানো চলে না। এই সামান্য আহার্য দিয়া লোকের যন্ত্রণাই বাড়ানো হইতেছে। স্যার জগদীশের এই বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার পর দেখিতেছি বাঙলা সরকার সরকারী অন্নসত্রসমূহে মণ্ড বিতরণের পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিয়াছেন ; কিন্তু দেশের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যাঁহাদের প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় থাকিবার কথা তাঁহাদের পক্ষে এজন্য বাহির হইতে পরামর্শ পাওয়া প্রয়োজন হইল কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। আমাদের মতে দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং জনসেবক কর্মিদের সঙ্গে সরকারের এই ক্ষেত্রে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কাজ করা প্রয়োজন। দেশসেবার ক্ষেত্রে যাঁহারা ত্যাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,

তাঁহারাই বর্তমানে এই সমস্যার দিনে আন্তরিকভাবে সেবা কার্যে আত্মনিয়োগে সমর্থ হইবেন এবং তাহারাই দেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের আস্থাবান ব্যক্তি। মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানের সাহায্য কেন্দ্রগুলির পরিচালনা ব্যাপারে ইহাদের সম্পর্ক থাকিলে সেগুলি সুপরিচালিত হইবে ; কারণ স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে কার্যকর অভিজ্ঞতা ইঁহাদের রহিয়াছে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বাঙলাদেশের রাজনীতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা কর্তব্য। বাঙলার নবনিযুক্ত গভর্নর স্যার টমাস রাদারফোর্ডের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইবে, আমরা ইহা আশা করি। প্রকৃতপক্ষে দলগত রাজনীতির পথ বর্তমানে বড় নয় ; দেশের লোককে রক্ষা করিবার কর্তব্যই সর্বপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রাজনীতিক বন্দীদের সম্বন্ধে আমলাতান্ত্রিক সংস্কার মন হইতে দূর করিয়া দেশকর্মিগণকে আজ দেশের সেবার সুযোগ প্রদান করা হউক এবং ইহাদের সাহায্যে বাঙলার গ্রামে গ্রামে নিরন্নের রক্ষা সম্পর্কিত সেবাকার্য সম্প্রসারিত করা হউক ; তবেই এক্ষেত্রে অব্যবস্থা, কুব্যবস্থা এবং সর্বোপরি লাভখোরদের মনোবৃত্তি ও দুর্নীতি সম্পর্কে নানারূপ যে সব অভিযোগ উঠিতেছে, সেগুলির কারণ দূর হইবে। পক্ষান্তরে দেশসেবা এবং জনসেবার প্রেরণা যাহাদের অন্তরে নাই, তাহাদের দ্বারা এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে জনসাধারণের মনে তৎসম্বন্ধে সংশয়, সন্দেহ এবং অভিযোগের কারণ থাকিবেই ; কিছু দিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে।

(১ আশ্বিন ১৩৫০)

পূজার আয়োজন

সম্মুখেই মহালয়া এবং প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ, সুতরাং পূজা আরম্ভ হইয়াছে বলা যায় ; কিন্তু সমগ্র বাঙলায় আজ অন্নাভাবের হাহাকার। চিতা-ধূমে বাঙলার আকাশ আচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে। বাঙলার পল্লীতে পুত্রহারা জননী, পতিহারা নারী, ভ্রাতৃহারা ভগিনীর রোদনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। বহুদিনের স্নেহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে নরনারী এক মুষ্টি অন্নের উদ্দেশে আজ সংসার এবং সমাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন দুর্দিন বাঙলায় আর কোন দিন আসে নাই। সমগ্র বাঙলা দেশের আজ সর্বনাশ হইতে বসিয়াছে। ক্ষুধার অন্ন দিয়া বাঙলার গ্রাম অঞ্চলগুলি যদি এখনও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে বাঙলা দেশ যে শ্মশানে পরিণত হইবে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই ভাবিতেছি, বাঙালী আজ কাহার পূজা করিবে? ঘর যাহার ভাঙ্গিল, সংসার যাহার ধ্বংস হইল, সে আজ কাহাকে ঘরে আনিবে? অন্নহীন যে, সে কাহার অন্ন যোগাইবে? মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস এবং আড়ম্বর কি অনাহারজনিত এই হাহাকারের মধ্যে বেদনারই আবর্ত তুলিবে না? অন্যায়ে অর্জিত অর্থের ঔদ্ধত্য যদি কোথাও থাকে অশ্রুর উত্তাল তরঙ্গ কি তাহাকে আজও প্রশমিত করিবার উপযুক্ত আকার ধারণ করে নাই!

অকাল বোধনের কথা মুখেই শুনিয়াছি ; আজ বাঙলা দেশে সত্যই অকালবোধনের সময় আসিয়াছে। বাঙালীর আজিকার পূজা আর গতানুগতিক পূজা নয়। বাঙালী চাহিয়া দেখ, অশ্রুভারে আকুল নয়না, দিগ্বসনা জননী ভিক্ষাপাত্র করে লইয়া তোমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তোমার সকল ক্ষুদ্র স্বার্থকে মাতৃ-বেদনায় বিগাঢ় করিয়া আজ জাতির বৃহত্তম স্বার্থের প্রেরণায় নিয়োজিত কর। মাতৃপূজার এই মহালগ্নে সমস্ত বাচালতা বন্ধ হউক ; শ্রদ্ধাযুক্ত হও। দেশবাসীর এই মহাদুর্দিনে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির পাপ ব্যবসায় যেন তোমাকে প্রলুব্ধ না করে। জননী আজ সর্বস্ব বলি চাহিতেছেন।

মহালয়ার সম্মুখে জাতির অতীত সেবকগণের স্মৃতিতে চিত্ত উদীপ্ত করিয়া মায়ের পূজায় আত্মনিবেদন কর। বুভুক্ষুকে অন্নদানে অগ্রসর হও। আর্তকে কোলে তুলিয়া লও। মৃত্যু-পথ-যাত্রীকে মরণের মুখ হইতে রক্ষা কর। জড়ের পূজা পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যস্বরূপিনী জননীর পূজা সার্থক কর। এই মহাপরীক্ষার মধ্যে জগতের কাছে তোমার মনুষ্যত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখ। তোমার মহাকবির বাণী বিস্মৃত হইও না—

'দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়
সেই ভীরু কাপুরুষ।'

কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিয়া উদার বীর্যে প্রতিষ্ঠিত হও।

(৮ আশ্বিন ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে

বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। ভারত গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী মিঃ কনরন স্মিথ একথা বলিতে পারেন ; কারণ এই শ্রেণীর বিদেশী শাসকদের অনেকেরই এদেশের লোকের সঙ্গে সমবেদনার কোন সংযোগ নাই। ইঁহারা মোটা মাহিয়ানার দায়ে এদেশে আসেন, পকেট ভারী করিয়া এদেশ হইতে চলিয়া যান ; কিন্তু শুধু বিদেশী শাসকেরাই এমন কথা বলেন নাই ; বাঙলার খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দী সেদিন স্বয়ং এই কথা বলিয়াছেন। তিনিই শুধু এমন কথা বলেন নাই, বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের প্রধান ব্যক্তিরা ঐ এক সুরেই সুর যোগাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী স্যার নজিমুদ্দীন বলেন, বাঙলা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই কন্ট্রোলের দামে চাউল পাওয়া যাইতেছে। শিক্ষাসচিব মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ বলেন চাউলের মূল্য সর্বত্রই অনেক হ্রাস পাইয়াছে, সুতরাং শিক্ষকদের জন্য অর্থ সাহায্য করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। আমরা এমন সব দায়িত্বহীন অসংবদ্ধ উক্তি শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। চাউলের দর বাঙলা দেশের সর্বত্রই কমিয়াছে—কোথায় কমিয়াছে, ইঁহারা নাম করিয়া বলিতে পারেন কি ? আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, এমন সব উক্তি একান্তই ভিত্তিহীন। চাউলের দর বাঙলার খাদ্যসচিবের কমিতে পারে ; বাঙলার বাজারে কুত্রাপি কমে নাই, কমা তো দূরের কথা, চাউলের মূল্য বাঁধিয়া দিবার পর বাঙলা দেশের সব জায়গার বাজার হইতে চাউল অদৃশ্য হইয়াছে। কোথাও চাউল মিলিতেছে না ; এবং তাহার ফলে বাঙলাদেশ জুড়িয়া হাহাকার উঠিয়াছে ; যাহার খাদ্য সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে বলিয়া মিঃ সুরাবর্দী ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু শহরের অবস্থাও—চাউলের সরকারী দর ২০ টাকায় নামিবার পর হইতে সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। শহরের বাজারেও চাউল মিলিতেছে না। আটা-ময়দার সংস্থান শহরে কিছু হইয়াছে, ইহা সত্য ; এবং ময়দা ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক নির্দিষ্ট দুই শতটি দোকানে আটা-ময়দা মিলিতেছে, ইহাও ঠিক ; কিন্তু তাহাতেও লোকের দুর্দশার প্রতিকার ঘটে নাই ; সেই লাইন করিয়া দাঁড়ানো, সেই অনিশ্চয়তা, সেই ব্যর্থতা। দোকান হইতে জন প্রতি তিন সের করিয়া আটা-ময়দা দেওয়ার বরাদ্দ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ; কিন্তু অধিকাংশ দোকানেই একত্র এক সেরের বেশি দেওয়া হইতেছে না। সুতরাং কি শহর, কি মফঃস্বল কোথাও সমস্যার সমাধান হয় নাই। শুধু তাহাই নয়, শহর ব্যতীত মফঃস্বলের সর্বত্র খাদ্য সঙ্কট সুস্পষ্ট রকমের বৃদ্ধি পাইয়াছে ; এবং দুর্ভিক্ষও ভীষণ

আকার ধারণ করিয়াছে। খাদ্য সচিব মিঃ সুরাবর্দী এবার তাঁর বক্তৃতা এবং বিবৃতিতে 'ফেমিন' কথাটি ব্যবহার না করিয়া 'ডিস্ট্রেস' এই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু 'ফেমিন' এবং 'ডিস্ট্রেস'—এই দুইয়ের মধ্যে 'ফেমিন কোডে' পার্থক্য করা হয় নাই। মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন, বাঙলা দেশের সর্বত্র বলিতে কি পরিমাণ স্থান বুঝায়? লালদিঘীর দপ্তরখানায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই, ইহা ঠিক এবং মন্ত্রিদের কিংবা তাঁহাদের ন্যায় মোটা বেতনওয়ালাদের বাড়িতেও দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই; সুতরাং দুর্ভিক্ষ নাই— এই কথা যদি বলিতে হয় তবে দুর্ভিক্ষ কথাটিই অভিধান হইতে তুলিয়া দিতে হয় এবং 'ফেমিন কোড'ও অবান্তর হইয়া পড়ে। বাঙলায় আজ যে দুর্দশা দেখা দিয়াছে, ইহার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষের অবস্থা অন্য কিছু থাকিতে পারে না। 'ফেমিন কোডে' দুর্ভিক্ষ অবস্থার যত রকম সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, বাঙলার প্রত্যেকটি জেলায়, প্রত্যেকটি মহকুমায় এবং প্রত্যেকটি গ্রামে সেই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগ হইতে কলিকাতার আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কিত তদন্তে দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র বাঙলা দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। ইঁহাদের প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে যে, অনশনক্লিষ্ট পরিবারগুলি মধ্যে শতকরা ২৫টি পরিবারই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। স্বামী তাহার স্ত্রীকে বিতাড়িত করিয়াছে। আবার স্ত্রী তাহার রুগ্ন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। বালক-বালিকারাও বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য পিতামাতাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ভ্রাতা তাহার নিরাশ্রয়া বিধবা ভগিনীর ভার লইতে অসম্মত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের অবস্থা ইহার অপেক্ষা আর কি ভীষণ হইতে পারে, আমরা ইহাই শুনিতে চাই। বাঙলার গ্রামে গ্রামে চাউল সুলভ হইয়াছে, সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে এবং দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই—দেশব্যাপী হাহাকারের মধ্যে মন্ত্রীদের মুখে এমন উক্তি কেহ শুনিতে চায় না। তাহারা ক্ষুধার অন্ন আজ চাহে। মন্ত্রীরা সমস্যা সমাধানে নিজেদের অযোগ্যতাকে স্বীকার করুন এবং দেশের শাসনভার প্রকৃতপক্ষে যে ব্রিটিশ শাসকদের উপর রহিয়াছে, এই বিষম অবস্থার সম্মুখীন হইবার দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ছাড়িয়া দিন।

(১৫ আশ্বিন ১৩৫০)

বিজয়ার সম্ভাষণ

শারদীয়া মহাপূজার অবসানে আমরা আমাদের শত্রু মিত্র বন্ধু হিতৈষী গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলকে বিজয়ার সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙলায় আজ মহা দুর্দিন দেখা দিয়াছে, শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। চারিদিকে মহামৃত্যুর লীলা। চারিদিকে মানুষ মরিতেছে। গ্রামে গ্রামে মরিতেছে, গ্রাম ছাড়া গৃহহারার দল শহরের রাজপথে অসহায়ভাবে মরিতেছে, শিশু ও নারীরা একমুঠা অন্নের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। এই মহাভয়, এই সংক্ষয়, ইহার মধ্যে কিসের জয় গাহিব, কোন বিজয়ার প্রীতি নিবেদন করিব? কিন্তু তবু স্মৃতি ভুলিতে পারি না। স্মৃতিই মানুষের প্রাণ। স্মৃতিই জাতির জীবন। বর্তমান এই ব্যাপক অভাবের মধ্যে ভাব পাইতে হইলে, কোন রকমেও বাঁচিতে হইলে অতীতের দিকেই তাকাইতে হয়। যে জাতির অতীত নাই, সে জাতির ভবিষ্যৎ কোথায়? কারণ ভাবই ভবিষ্যৎকে গড়ে এবং ভাব লাভ হয় চিত্তে অতীত স্মৃতির উদ্দীপনা সংযোগে। সুতরাং বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে অতীত একেবারে মিথ্যা নয় ; অতীত অনুস্যূত স্মৃতিই বর্তমানের স্থিতি এবং সেই শক্তিই অগ্রগতিরও মূলীভূত কারণস্বরূপে কাজ

করে। আজ আমরা মায়ের মূর্তি অনুধ্যান করিব। তিনি আজ কঙ্কালমালিনী বেশে শরতের অরুণ আভাসে আমাদের আঙ্গিনায় অশ্রুজলে ভাসিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেই অনুধ্যানে তাঁহার বর্তমান অবস্থার বেদনা অন্তরে উগ্ররূপে উপলব্ধি করিব। আমরা, যে মা আমাদের অন্নপূর্ণা ছিলেন, যে মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী ছিলেন, তাঁহাকে আজ এমন ভিখারী সাজিতে হইল আমাদের কোন পাপে? বাঙালী জাতি তো ভিখাবীব জাতি নয়, কাঙালের জাতি নয়। বিজয়ার স্মৃতির পটে বাঙলা দেশ একদিন স্বাধীন ছিল এবং বাঙালী বীর গৌরবে বিজয়ার উৎসব করিত। বাঙালী একদিন চতুরঙ্গ বাহিনী সাজাইয়া দিকে দিকে জয়যাত্রা করিত ; বিজয়ার উৎসব রোলে বাঙলার আকাশ বাতাস মুখরিত হইত। আজ সেই বাঙালী পরাধীন, আজ তাহারা অসহায়, দুর্বল, অন্নমুষ্টির প্রত্যাশায় থাকিয়া উপেক্ষিত এবং অবজ্ঞাত। এ বেদনা আমাদিগকে আর কতদিন বহন করিতে হইবে? এখনও যদি আমরা জাতির দুঃখ কষ্ট এবং বেদনা সম্বন্ধে সচেতন না হই, তবে আমাদিগকে ধ্বংস হইতে হইবে। বিজয়ার সম্ভাষণের ভিতর দিয়া জাতির বৃহত্তর বেদনা আমাদের মধ্যে সত্য হউক ; আমাদের আলিঙ্গন একান্ত হউক। ধনী-নির্ধন, শত্রু-মিত্র, উচ্চ-নীচ, সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া আমরা যেন সকলকে আত্মীয় স্বরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। অনাহারক্লিষ্ট দুর্গত স্বদেশবাসী ভাইবোনদের প্রাণ রক্ষার জন্য আমরা যেন সঙ্কল্পবদ্ধ হই এবং সেজন্য নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিতে পারি। পীড়িতের বেদনা আমাদের চিত্তে আবর্ত তুলিয়া আমাদের হস্ত সকলকে প্রীতিভরে সম্ভাষণ করিবাব জন্য সম্প্রসারিত করুক।

(২৯ আশ্বিন ১৩৫০)

বাঙলার সমস্যা

মুঙ্গের শহরে সম্প্রতি বাঙালী সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনের সভাপতি স্বরূপে শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র দাশ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বাঙলা দেশের বর্তমান দুর্দশার যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা সকলেরই মন স্পর্শ করিবে। অন্তরের জ্বালা দিয়া তিনি কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার অন্তরের সেই জ্বালার আলোকে আমাদের বর্তমান দুর্দশার স্বরূপ উন্মুক্ত হইয়াছে। দাশ মহাশয় বলেন—

"বাঙলা দেশের অন্ন চাই। সেইজন্য অন্য প্রদেশের উদ্বৃত্ত খাদ্য বাঙলা দেশে পাঠানো প্রয়োজন। কিন্তু সেই খাদ্যও মুনাফাদারদের হাতে পড়িয়া অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। মুনাফাদারদিগকে সংযত রাখিবার জন্য এবং খাদ্যের ন্যায্য বন্টনের জন্য দেশে লোকের সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। দেশের লোকের এই সমবেত প্রচেষ্টার জন্য চাই—দেশের নেতাদের মুক্তি এবং জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা। শুধু কয়েকটা টাকা সাহায্য করিলেই যেন আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ না করি। দরিদ্রের কাছে আমাদের ঋণ রহিয়াছে, তাহারাই আমাদের শিক্ষার, আমাদের সংস্কৃতির ব্যয়ভার বহন করিতেছে। আজ সেই ঋণ পরিশোধের দিন আসিয়াছে। আজ সত্যই আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি সকলই মিথ্যা মনে হইতেছে। সর্বনাশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আজ এ সকলকে মনে হইতেছে এক পলায়নী বৃত্তির, এক মানসিক বিলাসের চমকপ্রদ ফল। আর এইসব বিলাস লইয়া মত্ত থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে হইবে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কার্য্যের মধ্য দিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আজ—

"বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে,
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।"

কর্তব্যের এই আহ্বান বাঙালী মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে কি?

(২৯ আশ্বিন ১৩৫০)

অন্নসমস্যায় মহাত্মা গান্ধী

১৯৪২ সালের ২৫শে জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী 'প্রকৃত যুদ্ধ প্রচেষ্টা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন। বর্তমানে দেশের সম্মুখে অন্ন-বস্ত্রের যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, মহাত্মাজী তাহার স্বাভাবিক দূরদৃষ্টি প্রভাবে তাহা উপলব্ধি করেন এবং সেই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দেশবাসীকে প্রণোদিত করাই তাঁহার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রবন্ধে মহাত্মাজী বলেন—

"দেশে ইতিমধ্যে অন্নবস্ত্রের অভাব দেখা দিয়াছে। যতই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে, ততই এই অভাব আরও বাড়িবে। বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ। এই অবস্থার আঘাত ধনী ব্যক্তিরা হয়ত এখন অনুভব করেন নাই বা কখন করিবেন না ; কিন্তু দরিদ্রেরা উহা অনুভব করিতেছে। যাঁহারা দরিদ্রের ব্যথা নিজেদের বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের প্রয়োজন হ্রাস করা দরকার। বিত্তবান ব্যক্তিরা বহু খাদ্য অপচয় করেন এবং অত্যধিক খাদ্য গ্রহণ করেন। সাধারণ গৃহস্থালীতে কোন প্রকার ভোজনকালে ডাল, চাপাটি, ঘি, দুধ, শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রভৃতি অনেক উপচার ব্যবহার করা হয়। আমার মতে উহা অস্বাস্থ্যকর। যাঁহারা দুধ, ছানা, ডিম, মাংস গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ডাল খাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

যদি ধনী ব্যক্তিরা ডাল ও তেলের ব্যবহার বন্ধ করেন, তবে দরিদ্রেরা তাহা অধিকতর পরিমাণে লাভ করিবে। দরিদ্র ব্যক্তিরা স্নেহজাতীয় কোন খাদ্যই সাধারণত পায় না। যে অন্ন ভক্ষণ করা হইবে উহা যেন ঝরঝরে হয়, কারণ ঝোল না মাখাইয়া খাইলে অর্ধেক অন্নে উদর পূর্তি হয়। খাদ্য শস্য বিক্রেতাদের অত্যধিক লাভের লোভ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহারা দরিদ্রের খাদ্যের রক্ষক। এইরূপভাবে পরিচিত না থাকিলে দোকানপাট লুঠ হইবার আশঙ্কা ঘটিবে। গ্রামবাসীদিগকে খাদ্য সঞ্চয় করিবার উপদেশ দেওয়া এবং খাদ্যশস্যের চাষে উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। কলা, আলু ইত্যাদি সহজে উৎপন্ন হয় এবং প্রয়োজনের সময় এইগুলি প্রধান খাদ্যের অভাব পূরণ করিতে পারে।"

মহাত্মাজী বর্তমানে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ। তিনি যদি মুক্ত থাকিতেন, তবে বিপন্ন বাঙলার দুঃখ মোচনে তিনি তাঁহার শক্তি উৎসর্গ করিতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নির্দেশিত ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ইহা বুঝিয়া আমরা দেশবাসীর নিকট সেগুলি উপস্থিত করিলাম।

(২৯ আশ্বিন ১৩৫০)

লোকক্ষয়ের পরিমাণ

অন্নাভাবে লোকের মৃত্যু এ দেশের লেখকেরা সহজে স্বীকার করিতে চাহিতেন না। কেহ তেমন কোন সংবাদ দিলে মৃত্যু যে প্রকৃতপক্ষে অন্নাভাবে না ঘটিয়া ব্যাধিবিশেষের ফলে ঘটিতেছে ইহা

প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের সব সময় চেষ্টা থাকিত ; বাঙলা দেশের বর্তমান ব্যাপারে তাঁহাদের সে লজ্জা অনেকটা ভাঙিয়া গিয়াছে ; কিন্তু ইংলন্ড সভ্য জাতির দেশ। এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সুবিধার যুগে ব্রিটিশ শাসনাধীনে অন্নাভাবে লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহা সরাসরি স্বীকার করাতে সেখানকার শাসকদের সংকোচ কাটে নাই। ভারত সচিব মিঃ আমেরী বাঙলাদেশের লোকের মৃত্যু সংখ্যা জানাইতে এইরূপ সংকোচ বোধ করিয়াছেন। পার্লামেন্টে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া আজ পর্যন্ত বাঙলাদেশে কত লোক মরিয়াছে, তাহার ঠিক হিসাব তিনি দিতে পারেন না। ব্রিটিশ জাতির সম্বন্ধে কোন ব্যাপার সম্পর্কে এমন জবাব দিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীদের কেহই রেহাই পাইতেন না। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিতে হইত। কারণ মানুষের জীবন রক্ষা করাই গভর্নমেন্টের পক্ষে সর্বপ্রথম কর্তব্য ; সে ক্ষেত্রে শাসকদের কাহারও পক্ষে এমন নির্লিপ্ততা বা উদাসীনতা কোন সভ্য জাতি বরদাস্ত করিয়া লয় না। কিন্তু ভারত সম্পর্কিত ব্রিটিশ নীতির কথা স্বতন্ত্র ; ভারতবাসীদের অনাহার এবং তজ্জনিত মৃত্যুর জন্য উদ্বেগ ভারতের সম্পর্কে দায়িত্বযুক্ত ব্রিটিশ মন্ত্রীর পক্ষেও গৌণ ব্যাপার। তাই আমেরী সাহেব পার্লামেন্টের সদস্যদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত গভর্নমেন্টের নিকট তিনি অনশনে মৃত্যুর সংখ্যা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, পরে তাহা জানাইবেন ; কিন্তু সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ আমেরী সাহেব কতটা পাইবেন এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে ; কারণ দেখা যাইতেছে, পূর্বে পুলিশ হইতে কলিকাতার রাজপথে মৃত ব্যক্তিদের একটা সংখ্যা সংবাদপত্রসমূহকে প্রকাশার্থ দেওয়া হইত, এখন তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। হাসপাতালে মৃত ব্যক্তিদের একটা হিসাব পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে অনশনক্লিষ্টদের মোট মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা জানিবার উপায় নাই। কলিকাতা সম্পর্কে যখন এইরূপ নীতি, তখন বাঙলার মফঃস্বল অঞ্চলের সঠিক মৃত্যু সংখ্যা জানিবার উপায় কি? বাঙলাদেশ জুড়িয়া আজ মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইয়াছে। সরকার যখন এ অবস্থা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন, তখন মৃত্যু সংখ্যা সঠিক প্রকাশে এই সঙ্কোচটুকু রাখিবার আবশ্যকতা কি, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এ পর্যন্ত বাঙলাদেশে অনাহারজনিত মৃত্যুর হিসাব শুধু অনুমানের উপরেই চলিতেছে। স্টেটসম্যানের মতে এই সংখ্যা সপ্তাহে দশ হাজারের উপরে, আমাদের বিশ্বাস সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক বেশি। অন্তত কুড়ি হাজারের কম নয়। মৃত্যুর এই হার এখনও শেষ মাত্রায় উঠে নাই ; কার্তিক মাসের শেষের দিকে উহা আরও ভয়াবহ হইবে। বিংশ শতাব্দীতে কোন দেশে এমন দুর্বিপাক দেখা দিয়াছে কি? উপযুক্ত সময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভারতে কিংবা বাঙলাতেও উহা দেখা দিত না। প্রকৃতপক্ষে এই বিপত্তি আমাদের পরাধীন অবস্থারই পরিণতি। সুতরাং কাহাকেও দোষ দিবার কিছু নাই, এবং এ সম্পর্কে আমেরী সাহেব কিংবা তাহার অনুগামীদেরও লজ্জিত হইবার কারণ নাই।

(১৩ কার্তিক ১৩৫০)

সম্মুখের সমস্যা

অনশন মৃত্যুর সংখ্যা কম করিয়া দেখাইবার জন্য ভারত সচিবের দপ্তর হইতে আরম্ভ করিয়া লালদিঘীর দপ্তরখানা পর্যন্ত আগাগোড়া একটা চেষ্টা চলিয়াছে, আমরা উহা লক্ষ্য কয়িয়া আসিতেছি। ভারত সচিব প্রথমে বলেন, ১৫ই আগস্ট হইতে ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত কলিকাতায় অনশনে মৃত্যুর

সংখ্যা ১০,৬৬৭ ; কিন্তু ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্য সচিব কলিকাতা শহরের বিগত ৫ বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা হিসাবের প্যাঁচ কষিয়া সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে, জানুয়ারি মাস হইতে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত কলিকাতা শহরে অনশনজনিত মৃত্যু সংখ্যা ৯৮০০ জনের অধিক নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাঙলা দেশে বুভুক্ষু পীড়িত হতভাগ্যদের মৃত্যুর প্রকৃত তত্ত্ব কর্তৃপক্ষের কেহই অবগত নহেন এবং এই বিংশ শতাব্দীতে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, সেজন্য গুরুত্ববোধও ইহাদের কাহারও নাই। উপস্থিত মত প্রশ্নের মুখে একটা উত্তর যোগাইলেই ইঁহাদের কর্তব্য শেষ হইল। পরাধীন এদেশ, সুতরাং এদেশের লোকের অনশনজনিত মৃত্যুর প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে এইরূপ দায়িত্বহীনতা আমাদের কাছে বিস্ময়ের বিষয় নয় ; এবং এইজন্য এই হিসাবের গণিত সম্পর্কিত মূল্য বিচারের মধ্যে আমরা যাইতে চাই না। যাঁহারা এই ধরনের হিসাব উপস্থিত করিয়া দুর্ভিক্ষজনিত সমস্যার লঘুত্ব প্রতিপালন করিতে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুসংখ্যা কমিতেছে কই ? কলিকাতা শহর হইতে নিঃস্বদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে। বাঙলার গ্রাম অঞ্চল হইতে ক্ষুৎপীড়িত, ব্যাধিক্লিষ্ট এই নরনারীর দলকে যদি কোন উপায়ে একবার কলিকাতা হইতে অপসারিত করা যায়, তবে শহরে মৃত্যুর হার নিশ্চয়ই হ্রাস পাইবে। কর্তৃপক্ষ এইরূপ আশা হয়ত অন্তরে পোষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু শহরের ফুটপাত হইতে এই হতভাগ্য নরনারীর দল অপসারিত হইবার পরও দেখা যাইতেছে সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ ও শহরের মৃত্যু সংখ্যা বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। শহরে যখন এই অবস্থা তখন মফঃস্বলের কথা উল্লেখ না করাই ভাল।

(৪ অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

বাঙলার দুর্গতি

বিগত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাঙলা দেশে যেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং মাদ্রাজের ভীষণ দুর্ভিক্ষের পরিণতি সম্পর্কে যাহা জানা যায়, বাঙলা দেশে আজ তাহা বাস্তব আকার ধারণ করিয়াছে। বাঙলা সরকারের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বাঙলার উর্বর মাটিতে এবার প্রচুর আমন ধান ফলিয়াছে এবং আজিকার এই পরম প্রয়োজনের দিনে এবারকার ফসল ভগবানের আশীর্বাদের মত আসিয়াছে। ইহা সত্য হইলেও দেখা যাইতেছে যে, মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিণাম হইতে ভগবানের আশীর্বাদ বা 'প্রকৃতির দান'ও মানুষকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। ক্ষেতের পাকা ধানের দিকে তাকাইয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় যেভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, এবারকার ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগের আক্রমণেও সেইভাবে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ভারত সচিব আমেরী সাহেব সেদিনে একান্ত অনুশোচনার সুরে বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙলাদেশে ভীষণভাবে কলেরা দেখা দিয়েছে। বাঙলার দুর্ভিক্ষে সৈন্য বিভাগের সাহায্য কার্য সম্পর্কে মেজর জেনারেল স্টুয়ার্ট সম্প্রতি একটি বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে সংবাদপত্রে বাঙলার সর্বত্র ব্যাধির প্রকোপ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ও অভাবের সম্বন্ধে যে সব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। তাঁহার মতে খাদ্যাভাবজনিত দুর্বলতা, শীত এবং জনগণের শীত নিবারণের উপযোগী বস্ত্রাদির

অভাবের দরুনই দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা ম্যালেরিয়া, কলেরা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যাধির দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইতেছে। এবং বর্তমানে মহামারীর মূলে যে অন্নাভাবই কাজ করিয়াছে এবং করিতেছে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

(২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

দায়িত্ব প্রতিপালন

বাংলার বর্তমান অবস্থার কারণ কী? মূলে গভর্নমেন্টের অনবধানতা যে রহিয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গভর্নমেন্ট যথাসময়ে অন্নাভাবজনিত সমস্যার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। মিঃ সুরাবর্দী বাঙলাদেশের খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী। মুন্সীগঞ্জে গিয়া তিনি সেদিনও তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, অবস্থা যে এতটা শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে, এ খবর তিনি জানিতেন না। দেশ শাসন সম্পর্কে এবং সে দায়িত্ব প্রতিপালনে শাসকদের কর্তব্য-নিষ্ঠা কতখানি ইহাতেই তাহার পরিচয় কিছুটা পাওয়া যায়। মিঃ সুরাবর্দী যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, শাসন বিভাগীয় দায়িত্বের ক্ষেত্রে সে যুক্তির কোন মূল্যই নাই। মুন্সীগঞ্জ বাঙলার বাহিরে নয়। বিক্রমপুর পরগণা বাঙলার একটি বিশিষ্ট অঞ্চল। সেই অঞ্চলের অবস্থার খবর বাঙলার যিনি খাদ্যসচিব তিনি রাখেন না ;এমন যুক্তি নিতান্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় প্রদান করে। মুন্সীগঞ্জ যে ঘাটতি অঞ্চল মিঃ সুরাবর্দী একথা জানেন ;তিনি ইহাও জানেন যে, এই মহকুমায় যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুই মাসের বেশী অন্ন সংস্থান হয় না ; ইহা ছাড়া মজুতবিরোধী আন্দোলনের ফলে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যের অবস্থার রিপোর্ট পাইবার সঙ্গে মুন্সীগঞ্জের অবস্থার খবরও তাঁহার নিকট পৌঁছিবার কথা ;সেগুলি দেখিবার মত সময় মিঃ সুরাবর্দীর ছিল না ইহাই কি বুঝিব? কিন্তু বাঙলা দেশের সংবাদপত্র সমূহে বিক্রমপুর অঞ্চলের দুরবস্থা সম্পর্কে অনেক মর্মন্তুদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে ;তবু গভর্নমেন্ট মুন্সীগঞ্জের দুরবস্থার সংবাদ পান নাই ;এমন কথা বলিয়া কোন দেশের মন্ত্রীই নিষ্কৃতি লাভ কবিতে পারেন না এবং ইহাতে তাঁহাদের কর্তব্যবিমুখতাই সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই দেশ। এমন একটা দুর্ভিক্ষ বাঙলা জুড়িয়া ঘটিল, আমেরী সাহেবের দপ্তর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্য বিভাগ, এমন কি বাঙলা দেশের খাদ্য সচিবও ইহার পুরাপুরি খবর যথাসময়ে কেহই পাইলেন না ; সুতরাং সেজন্য দায়িত্বও কাহারও নাই? শাসন বিভাগের বড় কর্তারা অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াই আত্মগর্ব অনুভব করিতেছেন। এমন ব্যাপার পরাধীন এই দেশেই সম্ভব?

(২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

বর্তমান সমস্যা

দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধে ব্যাপার তো এই ; দুর্ভিক্ষের পরিণামের ফলে মহামারীতে দেশ আজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, ইহার প্রতিকারের জন্যই বা তাঁহারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কতটা অবলম্বন করিয়াছেন? যখন বুঝা গেল যে, দেশে সত্য সত্যই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, তখনই ইহা বুঝা উচিত ছিল যে, খাদ্যাভাবের জন্য এবং খাদ্যাভাবে অখাদ্য কুখাদ্য গ্রহণের জন্য লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার আশঙ্কাও রহিয়াছে এবং শীতের সমাগম সম্বন্ধেও কোন রকম সন্দেহের কারণ

ছিল না। এরূপ অবস্থায় পূর্ব হইতেই ব্যাধির প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল। আমরা এজন্য গভর্নমেন্টের দৃষ্টি বহুদিন হইতেই আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কোথায়? বঙ্গব্যাপী এই ভীষণ কলেরা এবং দুরন্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দমন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন পরিচয়ই আমরা পাইতেছি না। মিঃ সুরাবর্দী বলিতেছেন বটে, কুইনাইন প্রচুর রহিয়াছে। কথার ক্ষেত্রে তাঁহার কার্পণ্য কোন দিনই নাই ; কিন্তু কাজে কি ঘটিতেছে ইহাই হইতেছে বিবেচনার বিষয়। গ্রাম অঞ্চল তো দূরের কথা, কলিকাতা এবং বাঙলার বড় বড় কয়েকটি শহরেও কুইনাইন এখনও সমানভাবে দুস্প্রাপ্য রহিয়াছে। বাঙলা দেশে সাহায্য কার্যে ব্যাপৃত সেনা বিভাগ হইতে আগামী তিন মাসে বাঙলার ৯০ লক্ষ লোককে কলেরার টীকা দিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে, এই কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি। ভারত সচিব মিঃ আমেরী, সেদিন পার্লামেন্টের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, বিমানযোগে ভারতে কলেরার টীকার বীজ কিছু পাঠানো সম্ভব হইয়াছে ; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নিতান্তই সামান্য। ইতিপূর্বেই বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের নরনারীকে ব্যাপকভাবে কলেরার টীকা দেওয়ার দরকার ছিল ; তিন মাসের মধ্যেই গ্রাম অঞ্চলে মহামারীর তান্ডবলীলা প্রসারিত হইবে, আমাদের ইহাই আশঙ্কা হইতেছে। বাঙলাদেশে এবার ম্যালেরিয়া যেমন ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়াছে, এমন আর কোনদিন ঘটে নাই, এমন সাংঘাতিক কলেরার ধ্বংসলীলাও দেখা যায় নাই ; দুর্ভিক্ষেরই ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল ; দুর্ভিক্ষের প্রতিকারে সরকারী ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হইয়াছে , সেই ব্যর্থতারই ফলে মহামারীর মুখে পতিত বাঙলাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় ইহাই বর্তমানে সর্বপ্রধান সমস্যা।

(২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

নিরাশ্রয় নারীরক্ষা

দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার বহু নারী সর্বস্ব হারা হইয়াছে। স্বাভাবিক গার্হস্থ্য এবং সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ায় অনেক নারী ও শিশু সম্পূর্ণ অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়াছে। ইহাদিগকে আশ্রয় দান এবং সমাজ-জীবনে ইহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব অতি গুরুতর। বাঙলা দেশের 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ' এই কর্তব্যের প্রতি বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহারা কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষের ফলে অসহায় তরুণী নারীদিগকে লইয়া পাপ ব্যবসায় চলিতেছে। এক দল দুর্বৃত্ত এই পাপ ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, সরকারও অবস্থার এই গুরুত্ব অস্বীকার করিতেছেন না। এতৎ সম্পর্কিত এক সরকারী বিবৃতিতে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, গভর্নমেন্ট এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন মনোযোগ দেন নাই—ইহা সত্য নহে ;কিছুদিন যাবৎ গভর্নমেন্ট এই সমস্যা সম্বন্ধে গুরুতরভাবে বিবেচনা করিতেছিলেন। বাঙলার বিভিন্ন স্থানে নিরাশ্রয় তরুণীগণ যাহাতে দুর্বৃত্তদের কবলে না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষরূপে যত্নবান হইবার নিমিত্ত গভর্নমেন্ট গত ৬ই জানুয়ারী সমস্ত সরকারী কর্মচারী ও বিশেষভাবে পুলিশ এবং সাহায্য কার্যে রত ব্যক্তিদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। সরকার এ সম্বন্ধে তাঁহাদের তৎপরতা জ্ঞাপন করিবার জন্য এই বিবৃতি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। অবস্থা যে এমন গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে, অনেক পূর্বে তাঁহাদের ইহা উপলব্ধি করা উচিত ছিল। সংবাদপত্রে এই সমস্যার প্রতি বারংবার তাহাদের দৃষ্টি

আকৃষ্ট করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রভৃতি মহিলা কর্মিগণও বাঙলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়া অবস্থার এমন গুরুত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছেন ;তত্রাচ যথাসময়ে এ দিকে তাঁহাদের নজর যায় নাই ; এই কথাই বলিতে হয় ;কারণ ৬ই জানুয়ারী যে নির্দ্দেশ তাঁহারা দিয়াছেন, তাহাকে কিছুদিনের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার ফল বলিলে, সরকারের এ সম্পর্কে গুরুত্বের নিরিখকে লঘু করিয়াই দেখিতে হয়। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিবার মত অবস্থা দেশে সৃষ্টি হইতে পারে, তঁহার যখন ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তখন বহু পূর্বেই প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষে কর্তব্য ছিল।

(৮ মাঘ ১৩৫০)

লজ্জার কথা

ভারত সচিব মিঃ আমেরী সেদিন পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তরে ভারত শাসন সম্পর্কে বৃটিশ নীতির আর এক দফা প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন। তিনি আত্মশ্লাঘায় মস্তক উন্নত করিয়া প্রসন্ন-বদনে সভা ভবনে সমবেত বৃটিশ জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, গত পাঁচ মাসে দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত ব্যাধি-পীড়ার ফলে বাঙলা দেশে অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার দশ লক্ষ ছাড়াইয়া যায় নাই। অবশ্য এই মৃত্যু সংখ্যা যে পাকা, ভারত সচিব এমন কথা বলিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া সম্ভব হয় নাই। ভারত সরকার প্রাপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ অনুমান করেন মাত্র। বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষের ফলে এবং তজ্জনিত ব্যাধি-পীড়ায় লোকক্ষয়ের সম্বন্ধে ভারত সরকারের হিসাবের মূল্য কতখানি, আমাদের তাহা জানিতে বাকি নাই। এ সংখ্যা কম করিয়া দেখাইবার পক্ষেই এদেশের শাসকবর্গের বারবার ঝোঁক রহিয়াছে, আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। ইহার কারণও আমরা বুঝি। নিজেদের সুনাম বজায় রাখিবার দায় এক্ষেত্রে তাঁহাদের বিবেচনায় বড় হইয়া উঠে। বাঙলার এত বড় একটা বিপর্যয়ে লোকক্ষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন শাসকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, অথচ ভারত সচিব এতদিন পর্যন্ত সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন সংবাদ পান নাই। তাঁহার এই উক্তি হইতে এ সম্বন্ধে শাসকবর্গের উদাসীনতার পরিচয়ই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কোন স্বাধীন দেশ হইলে ভারত সচিব এমন জবাব দিয়া নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইতেন না। ভারত সচিবের এই জবাব প্রথমত গুরুত্বহীন, তারপর আমরা একথাও বলিব যে, ইহা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে গত পাঁচ মাসে বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষের ফলে অনেক লোকক্ষয় ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া ভারত সচিবের উক্তিতে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তাঁহার জবাবের ভিতর, ইহার চেয়ে বেশী লোকক্ষয় ঘটে নাই. ভাষাকে এইরূপ ভঙ্গি দিয়া তিনি নিজেদের শাসনের একটা কৃতিত্ব জাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখা যাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে এজন্য তাহার লজ্জিত হওয়াই উচিত ছিল। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, তাঁহার হিসাব ঠিক, তাহাতেও তাঁহাদের শাসন-নীতির মহিমা ঘোষিত হয় না। এই বিংশ শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে সভ্যতাভিমানী বৃটিশ জাতির শাসনাধীন একটি প্রদেশে অনাহার এবং অনাহারজনিত ব্যাধি-পীড়ায় দশ লক্ষ নরনারী পোকা-মাকড়ের মত মরিল। ইহা শাসকদের পক্ষে নিশ্চয়ই বড় গৌরবের কথা নয়। জগতের অন্য কোন দেশে এমনটা ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে কী? ভারতবর্ষ পরাধীন, তাই এদেশে ইহা সম্ভব ;তাই বাঙলা দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য জন্মিলেও

আজও বাজারে অনাস্থার ভাব থাকে ; নূতন ফসলের আমদানীর মুখেই দর চড়িতে শুরু করে, সরকারের হাতে প্রচুর কুইনাইন থাকিলেও চোরাবাজারে বহু মূল্য দিয়া কুইনাইন সংগ্রহ করিতে হয়। শাসনের নীতির ব্যর্থতার পক্ষে এইগুলি যথেষ্ট প্রমাণ।

(১৫ মাঘ ১৩৫০)

বাঙলার লোকক্ষয়

দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত ব্যাধি-পীড়ায় বাঙলা দেশের কী পরিমাণ লোকক্ষয় ঘটিয়াছে, গত ২৭শে জানুয়ারী পার্লামেন্টের প্রথিত সদস্য মিঃ স্টিফেন ডেভিস ভারত সচিবকে পুনরায় এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ভারত সচিবের জবাব একই অর্থাৎ গত ২০শে জানুয়ারী তিনি যাহা বলিয়াছিলেন এবারও তদতিরিক্ত নূতন কিছু বলিতে পারেন নাই। ভারত গভর্নমেন্টের প্রদত্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এই যে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাঙলা দেশে মৃত্যু সংখ্যা দশ লক্ষের অধিক হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত এই হিসাব যে পাকা নয়, এদিন তিনি তাহা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "এ সম্বন্ধে প্রথমত প্রাদেশিক সরকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহাদের তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা বিশেষ খুব ভাল বলিয়া মনে হয় না ; প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে পরে ভারত সরকার এ সম্বন্ধে হিসাব পান, পরে সে সংবাদ আমার কাছে পৌছে।" এই বিষয়ে আমাদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের মতে বাঙলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীজনিত মৃত্যু সংখ্যা দশ লক্ষের চেয়ে অনেক বেশী। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সম্প্রতি ভারত ভৃত্য সমিতির পক্ষ হইতে মুন্সীগঞ্জ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এক মুন্সীগঞ্জ মহকুমাতেই দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত রোগাদিতে এ পর্যন্ত ৮৩ হাজারের অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পণ্ডিত কুঞ্জরুর হিসাবানুসারে বাঙলা দেশে শুধু দুর্ভিক্ষেই গত ৫ মাসে প্রতি সপ্তাহে ৫০ হাজার করিয়া নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে মহাশয়ের মতে বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষের ফলে ২৫ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু ঘটিয়াছে ; ইহা ছাড়া মহামারীর মৃত্যু সংখ্যা অন্তত দশ লক্ষ। দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত মহামারীর ফলে সমগ্র বাঙলা দেশে একটা বড় রকমের সামাজিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, আমরা নানা দিক হইতেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি ; এরূপ অবস্থায় বাঙলার বুকের উপর দিয়া ধ্বংসলীলার যে তাণ্ডব গিয়াছে, তাহা সামান্য মনে করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সেই সংকটের জের যে এখনও চলিতেছে, একথাও স্বীকার করিতে হয়। কারণ গত ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতা গেজেটে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙলা সরকার চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, খুলনা, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর, বরিশাল, বীরভূম, বর্দ্ধমান এবং হাওড়া এই দশটি জেলায় কলেরা মহামারীর আকারে দেখা দিবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে, এখনও এমন কথা বলা চলে না।

(২২ মাঘ ১৩৫০)

পরিষদে খাদ্য বিতর্ক

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে খাদ্য সম্বন্ধীয় বিতর্ক হইয়া গেল। ভারত সরকারের খাদ্য সচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এই বিতর্কের অবতারণা করিয়া যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়,

তাঁহার মতে এই সমস্যার সহজ সমাধান একরকম হইয়া আসিয়াছে। খাদ্যসচিব নিজের মনে কৃতিত্ববোধের এই প্রতীতি পোষণ করিয়া যতই তৃপ্তি লাভ করুন না কেন, তাহা যে ভ্রান্ত, পরিষদের সদস্যগণের অভিমত হইতেই সুস্পষ্ট হইয়াছে। সদস্যগণ বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ;তন্মধ্যে বিহার, মালাবার এবং বাঙলা এই তিনটি প্রদেশের সমস্যা সম্বন্ধেই প্রধানত আলোচনা হইয়াছে, তাহাতেও আবার বাঙলার সমস্যাই বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। খাদ্যসচিব অবশ্য বেশ সুকৌশলে বাঙলা দেশের সমস্যার গুরুত্বের দিকটা বেমালুম চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এত বড় বক্তৃতার মধ্যে বাঙলার বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এ সম্পর্কে বাঙলার সমস্যার গুরুত্ব এখনও যে কতখানি রহিয়াছে, বিতর্কে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত অখিল দত্ত মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বাঙলার লোক এখনও অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে গিয়া খোঁজ লইলেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় বাঙলা দেশের মফঃস্বল অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, পরিষদে তাহা অভিব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, গ্রামে গ্রামে অসংখ্য নরনারী এখনও সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় দিনযাপন করিতেছে। অবশ্য অনশনে মৃত্যুর সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে ; কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অগণিত নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে কিংবা মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হইতছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বাঙলা দেশের সর্বত্র মহামারীর কিরূপ প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে এবং সেজন্য মানুষ কিভাবে পোকা-মাকড়ের মত মারা পড়িতেছে মর্মস্পর্শী ভাষায় সেকথা বলেন। তিনি ইহা ভাঙ্গিয়া বুঝাইয়া দেন যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই মহামারীর এইরূপ ব্যাপকভাবে প্রাদুর্ভাবের মূলে রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সরকারী রেশন ব্যবস্থায় যে খাদ্য বন্টন করা হইতেছে তাহার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই-সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইতেছে ;অনেক স্থানে ভারতরক্ষা আইনের বিধান বলে দেশের লোককে অখাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা হইতেছে। স্যার আবদুল হালিম গজনবী বাঙলা দেশের সর্বত্র সর্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য, দুধ, মাছ প্রভৃতির মূল্য কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ধান চাউলের মূল্য হ্রাস পাইলেও অন্যান্য সর্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের দুস্প্রাপ্যতার জন্য বাঙলার খাদ্য-সমস্যার জটিলতা হ্রাস পায় নাই। ভুক্তভোগীমাত্রেই বাঙলার অবস্থার এই গুরুত্ব স্বীকার করিবেন।

(২ অগ্রহায়ণ ১৩৫১)

দায়িত্ব পরিত্যাগের প্রয়াস

ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদের মতে বাঙলার খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে এখন আর তেমন ভাবনার কোন কারণ নাই ; বরং অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের জন্য ভারত সরকারের কিছু কিছু উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। অন্য প্রদেশের খাদ্যসমস্যাজনিত উদ্বেগ দূর করিবার জন্য খাদ্য-সচিব চেষ্টা করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তির কারণ নাই ;কিন্তু বাঙলার সমস্যা যে মিটিয়াছে এবং বাঙলার জন্য ভারত সরকারের পূর্বের ন্যায় প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই, তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণাতেই আমাদের আপত্তি। বর্তমান বৎসরে বাঙলা দেশে প্রচুর ফসল হইয়াছে ইহা সত্য ;কিন্তু দেখা যাইতেছে, তৎসত্ত্বেও বাঙলার শস্য মূল্য আশানুরূপ সুলভ হইতেছে না ;ইহা ছাড়া, আগামী

বৎসরের ফসল যে বর্তমান বৎসরের ন্যায় হইবে, এমন আশাও নাই বলিলেই চলে। অথচ যুদ্ধের কল্যাণে বাঙলা দেশে খাদ্যের চাহিদা অনেক গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙলায় যে পরিমাণ সৈন্যের এবং অন্যান্য শ্রেণীর বাহিরের লোকের সমাগম হইয়াছে, তাহাতে এই প্রদেশের খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া অত্যন্তই স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় বাঙলাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পরামর্শ দানের এবং কলিকাতার খাদ্য সরবরাহের যে দায়িত্ব এতদিন ভারত সরকার বহন করিতেছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য খাদ্যসচিবের আগ্রহ প্রকাশের প্রকৃত অর্থ কি, আমরা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। আমরা শুধু ইহাই ভাবিতেছি যে, গত বৎসর বাঙলা দেশে এই যে বিপুল লোকক্ষয় ঘটিল, তাহাও বোধ হয়, ভারত সরকারের এই সব পদাধিকারীদিগকে মানুষের জীবনরক্ষার কর্তব্যবোধে সম্যক সচেতন করিতে পারে নাই। পরাধীন দেশে এই অবস্থাই ঘটিয়া থাকে ;সুতরাং আশ্চর্য হইবার কারণ নাই।

(২ অগ্রহায়ণ ১৩৫১)

বাঙলার দুর্ভিক্ষ ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট

শুনিতেছি বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যে কোন দায়িত্ব নাই, দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত শেষটা এইরূপ আকার ধারণ করিবে। যদি সিদ্ধান্ত তেমন হয়, আমরা বিস্মিত হইব না ;কারণ সাধারণতঃ সরকারী কার্যের চূণকাম করিবার উদ্দেশ্যেই এই শ্রেণীর কমিটি বা কমিশন নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্রিটিশ পক্ষের প্রতিনিধিগণ বাঙলার দুর্ভিক্ষের এই দায়িত্ব হইতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে রেহাই দিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। স্যার চুনীলাল মেহতা এই অভিযোগ করেন যে,—ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক ভারতে দ্রব্য ক্রয় নীতি অবলম্বন করিবার ফলে একদিকে বিলাতে ভারতের টাকা যেমন জমা হইতেছে, সেইরূপ অন্যদিকে ভারতের লোকের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতির দিক হইতে স্যার চুনীলালের এই যুক্তির প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চাহিদা ভারতের বাজারে বৃদ্ধি পাইতেছে, মালে টান পড়িতেছে, অথচ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার কোন চেষ্টা করা হইতেছে না। এইভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের আবশ্যক জিনিসের গুরুতর অভাব ঘটিলে লোকের দুঃখদুর্দশা বৃদ্ধি পাইবে, অন্য কথায় দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থাই যে সৃষ্টি হইবে, ইহা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা এই সোজা সত্যটি স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী চাউলের অভাবে এবং মজুতদারদের ফাটকাবাজীর জন্যই এই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে যে চাউল আমদানী হইত, তাহার পরিমাণ এত বেশী নয় যে, তাহার অভাবে বাঙলা দেশে এমন একটা ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ঘটা সম্ভব। এদেশের মজুতদারেরাই তবে এক্ষেত্রে প্রধান অপরাধী ;কিন্তু এমন মজুতদারী বা লাভখোরী কারবারই বা এদেশে চলে কেন? ইংলন্ডে বা আমেরিকায় যদি ইহাদের পাপব্যবসা দমন করিয়া জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এই যুদ্ধের বাজারে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়, এদেশে তাহা হয় না কেন? দোষ নিশ্চয়ই গভর্নমেন্টের নয়!

(৯ অগ্রহায়ণ ১৩৫১)

"ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা তোমরা লইবে বল কেবা।"

অন্নাভাবে প্রপীড়িত বাঙলার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত। তাহাদের এক বৃহৎ অংশ ক্ষুধার জ্বালায় গৃহকোণ ত্যাগ করিয়াছে, পল্লী ত্যাগ করিয়া শহরের রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—সমাজ, সংসার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, একমুষ্টি অন্নের জন্য তাহারা দ্বারে দ্বারে আর্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে। বাঙলার সর্বত্র শত শত নরনারী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পণ্ডিত মালব্য, আচার্য রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দুর্গতদের রক্ষার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। নিম্নে দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য নেতৃবৃন্দের কয়েকটি আবেদন প্রকাশ করা হইল—

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

বারাণসী, ৩০শে আগস্ট, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নিম্নলিখিত মর্মে এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন—বাঙলা হইতে প্রতিদিন অনশনে মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া আমি ব্যথিত হইতেছি। আমাদের এই জন্মভূমিতে যেখানে খাদ্যের প্রাচুর্য আছে, সুদূর বিস্তৃত রেলপথ আছে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের বিপুল ধন-সম্পদও রহিয়াছে—সেখানে এইরূপ অনশন মৃত্যুর ঘটনা সমধিক শোচনীয়। খাদ্যশস্যের রপ্তানী বন্ধ করা, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে খাদ্য শস্য চলাচলের বিধিনিষেধ তিরোহিত করা এবং এই উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য যানবাহনের ব্যবস্থা করাই এই সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ততর করিবে। আমি আশা করি, গভর্নমেন্ট অবিলম্বে এমন পন্থা অবলম্বন করিবেন যাহাতে বাঙলার দুর্গত জনগণের দুঃখ বিমোচনের আশু ব্যবস্থা হইবে। অর্থ সাহায্যের জন্য তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং অন্যান্য বন্ধু ও সংবাদপত্র সমূহ যে সকল আবেদন প্রচার করিয়াছেন, আমি সমস্ত অন্তর দিয়া তাহা সমর্থন করিতেছি। আমার স্বদেশবাসীরা যে উদারতার সঙ্গে এই আবেদনে সাড়া দিবেন, তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই।

আচার্য রায়

অনশনক্লিষ্ট বাঙলার হাহাকার ধ্বনিতে অভিভূত হইয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোগশয্যা হইতে নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করিয়াছেন—আজ বাঙলার অনশনগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ মানবকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষার জন্য সমগ্র ভারতের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হউক—আমি আমার আর্ত দেশবাসীর পক্ষ হইতে সমস্ত সমর্থ দেশবাসীর নিকট মনুষ্যত্বের নামে এই আবেদন জানাইতেছি। স্বাঃ পি সি রায়, ৯-৯-৪৩

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ

বাঙলাদেশ আজ দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। জনসাধারণ অনশন ও অর্ধাশনে কালাতিপাত করিতেছে। অনশনের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আনুষঙ্গিক

ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। খাদ্যাভাব এবং খাদ্য সমস্যা সমাধানে সরকারী নীতির শোচনীয় ব্যর্থতা সমগ্র প্রদেশকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই চরম সঙ্কটের দিনে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল হইতে বাঙালী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বসাধারণের সম্মিলিত প্রয়াসের একান্ত প্রয়োজন। রাজনীতিক দলাদলি এবং সাম্প্রদায়িক কলহ যেন মানবতার সেবার অন্তরায় না হয়। অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে সমস্ত খাদ্যশস্যের আমদানী হইতেছে তাহার যথোচিত পরিবেশন এবং বিত্তসম্পন্ন জনগণের অকুণ্ঠ দানে বর্তমান অভূতপূর্ব অবস্থার আংশিক পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। অন্নসত্র মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের দুর্গতি লাঘব করিতে পারে না। বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড এই মধ্যবিত্ত পরিবার সমূহকে বাঁচানো একান্ত প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা লইয়া আমরা কার্যে অগ্রসর হইয়াছি। সকলের সহযোগিতা ব্যতীত আমরা এই দুরূহ কার্যে সফলতা লাভ করিতে পারি না। স্বাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১০-৯-৪৩

মিঃ ফজলুল হক

আজ সোনার বাঙলায় যাহারা অনশনে মরিতেছে তাহারা আমাদেরই রক্ত, আমাদেরই ভাই-বোন। তাহারা বাঁচিলে বাঙলা বাঁচিবে, তাহারা মরিলে বাঙলা মরিবে। বাঙলাকে আজ বাঁচিতে হইবে, বাঁচাইতে হইবে। মৃতের অস্থির উপর যাঁহারা নিজেদের ঐশ্বর্যের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধ পরিকর, বাঙলার দুর্গতি মোচনের জন্য তাহাদের মুখাপেক্ষী থাকিয়া কোনও লাভ নাই। মৃত্যুপথের যাত্রী সমস্ত বাঙালীকে সমূহগতভাবে বাঁচিবার জন্য নিজেদের সমবেত চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হইবে। একে অপরকে সকলে সকলকে বাঁচাইবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, আমি আজ সেই আহ্বানই জানাইতেছি। স্বাঃ এ কে ফজলুল হক, ১১.৯.৪৩

শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু

বাঙলা দেশে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে সর্বত্র সহানুভূতির সঞ্চার হইয়াছে এবং দুর্গত জনসাধারণের দুর্গতি মোচনের উদ্দেশ্যে বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ তথায় নানারূপ সাহায্য প্রেরিত হইতেছে। যখন সমস্ত প্রতিষ্ঠানই যোগ্যতার সহিত সেবাকার্য চালাইতেছেন, তখন নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখা যে রিলিফ কমিটি খুলিয়াছেন, আমি যদি পৃথকভাবে সেই রিলিফ কমিটির কার্যের প্রশংসা করি, তাহা হইলে আমি অন্যায়ভাবে কোনও প্রভেদাত্মক কাজ করিতেছি বলিয়া মনে করা হইবে না বলিয়াই আমি আশা করি। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক এবং সভাপতি হিসাবে আমি সর্বান্তঃকরণে এই আবেদন সমর্থন করি এবং সমস্ত নারী ও নারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করিয়া নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলনের বিভিন্ন শাখাসমূহকে সক্রিয়ভাবে এই রিলিফ কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করি। আমি আশা করি, তাঁহারা সকলেই অবিলম্বে এবং উদারভাবে এই আবেদনে সাড়া দিবেন। সাহায্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করা যাইতে পারে—নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলন রিলিফ কমিটির অনারারী জয়েন্ট সেক্রেটারী, পি ৪৬৬ সাদার্ন এভিনিউ, কলিকাতা অথবা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিউমার্কেট ব্রাঞ্চ, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

গত ২২শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আহূত এক বিপুল জনসভায় নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত "বাঙলায় দুর্ভিক্ষ ও মহিলাগণের সেবাকার্য" সম্বন্ধে এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেন যে, তিনি অল্পক্ষণ পূর্বে কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে মহানগরীর হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনে বাঙলার দুর্দশা লাঘবের আকাঙক্ষা প্রবল হইয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার জন্য শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই, ইহা মানুষের সৃষ্ট দুর্দশা। স্ত্রীলোক এবং শিশুরাই ইহার নিদারুণ ফলভোগ করিতেছে। সুতরাং সর্বাগ্রে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, বাঙলার সর্বত্র শিশুদের জন্য শিশু-সদন গড়িয়া তুলিতে হইবে। দুঃস্থ স্ত্রীলোকদিগকে কেবল সাহায্য দান করিলেই মহিলাদের কর্তব্য শেষ হইবে না, স্ত্রীলোকেরা নিজেরা কিছু কিছু উপার্জন করিয়া যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। আরামে সময় কাটাইবার দিন আর নাই। সারা দেশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখা দিয়াছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে, শত সহস্র লোক মৃত্যুপথের যাত্রী হইয়াছে। আমি আশা করি, মহিলা সম্মেলন বাঙলার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিতে সক্ষম হইবেন, কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা এই বিপদের মধ্য দিয়া বাঙলার ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধির বীজ বপন করিতে পারিবেন।

(৬ কার্তিক ১৩৫০)

কলিকাতায় অনশনে মৃত্যু-তালিকা

১৬ই অক্টোবর হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ১০,০২০ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যাক্তিকে ভর্তি করা হয়। তন্মধ্যে হাসপাতালে ৩৩৫৯ জনের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ের মধ্যে রাস্তায় মৃতের সংখ্যা হল ৮১৮ জন। ১৬ই আগস্ট হইতে ২৩শে আগস্ট পর্যন্ত মোট ১৪৩টি মৃতদেহ রাস্তা হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। নিম্নে ২৫শে আগস্ট হইতে প্রতিদিনের মৃত্যু সংখ্যা প্রদত্ত হইল—

তারখ	হাসপাতালে মৃত	রাস্তায় মৃত
২৫শে আগস্ট	১৮	২২
২৬শে আগস্ট	২১	১৪
২৭শে আগস্ট	১৯	৪০
২৮শে আগস্ট	৬	৩০
২৯শে আগস্ট	২৩	৩১
৩০শে আগস্ট	২৪	৩৫
৩১শে আগস্ট	২৫	১৯
১লা সেপ্টেম্বর	২১	২৫
২রা সেপ্টেম্বর	৩০	১৯
৩রা সেপ্টেম্বর	২৯	২৮

তারিখ	হাসপাতালে মৃত	রাস্তায় মৃত
৪ঠা সেপ্টেম্বর	৩৬	২৫
৫ই সেপ্টেম্বর	৩০	২১
৬ই সেপ্টেম্বর	২৬	২২
৭ই সেপ্টেম্বর	৬৮	২২
৮ই সেপ্টেম্বর	৬৩	২৭
৯ই সেপ্টেম্বর	৪৪	—
১১ই সেপ্টেম্বর	৩৮	—
১২ই সেপ্টেম্বর	৬২	২৩
১৩ই সেপ্টেম্বর	৭১	২২
১৪ই সেপ্টেম্বর	৫৮	১৬
১৫ই সেপ্টেম্বর	৭৭	২১
১৬ই সেপ্টেম্বর	৩৯	১৭
১৭ই সেপ্টেম্বর	৫৮	১৩
১৮ই সেপ্টেম্বব	৫০	—
১৯শে সেপ্টেম্বর	৫৮	১৩
২০শে সেপ্টেম্বর	৫৫	১৯
২১শে সেপ্টেম্বর	৪৭	২৭
২২শে সেপ্টেম্বর	৫১	১৪
২৩শে সেপ্টেম্বর	৫৬	২৯
২৪শে সেপ্টেম্বর	৫২	৪০
২৫শে সেপ্টেম্বর	৫৪	—
২৬শে সেপ্টেম্বর	৫৩	৩১
২৭শে সেপ্টেম্বর	১১৭	—
২৮শে সেপ্টেম্বর	৮১	—
২৯শে সেপ্টেম্বর	৭১	—
৩০শে সেপ্টেম্বর	১৬৮	—
১লা অক্টোবর	৭০	—
২রা অক্টোবর	৭২	—
৩রা অক্টোবর	৯২	—
৪ঠা অক্টোবর	৭৯	—
৫ই অক্টোবর	৬৬	—
৬ই অক্টোবর	৭৩	—
৭ই অক্টোবর	৭৮	—
৮ই অক্টোবর	৬৬	—

তারিখ	হাসপাতালে মৃত	রাস্তায় মৃত
৯ই অক্টোবর	৬৬	—
১০ই অক্টোবর	১০২	—
১১ই অক্টোবর	৭৫	—
১২ই অক্টোবর	৮৬	—
১৩ই অক্টোবর	৮৩	—
১৪ই অক্টোবর	৮২	—
১৫ই অক্টোবর	৭৮	—
১৬ই অক্টোবর	৯৫	—
১৭ই অক্টোবর	৯০	—
১৮ই অক্টোবর	৮৫	—
	৩৩৫৯	৮১৮

মোট মৃত্যু সংখ্যা ৪১৭৭

(৬ কার্তিক ১৩৫০)

লঙ্গরখানার সংখ্যা

১৫ই অক্টোবর বাঙলা গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন যে, গত কয়েক— মধ্যে বাঙলার সর্বত্র লঙ্গরখানার সংখ্যা আরও বাড়ান হইয়াছে। শেষ সংবাদে প্রকাশ যে, মোট ৪১৭৯টি লঙ্গরখানার মধ্যে ৩২১২টি লঙ্গরখানার সরকারী খরচে, ১১৮৫টি সরকারী সাহায্যে এবং ৫৮২টি জনসাধারণের টাকায় পরিচালিত হইতেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আরও ১৬০৩টি লঙ্গরখানা খোলার তোড়জোড় চলিতেছে। এই সমস্ত লঙ্গরখানা হইতে ১৭ লক্ষ লোককে আহার্য দান করা হইতেছে।

(৬ কার্তিক ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষ কবলিত বাঙলার ভয়াবহ রূপ

কলিকাতা

কলিকাতা, ১৭ই নভেম্বর—১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত পনের দিনে শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে পুলিশ ১১১৩ জন নিঃস্বের মৃতদেহ সংগ্রহ করে এবং ঐ সময়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ১০১৪ জন নিঃস্বের মৃত্যু হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের হিসাবে দেখা যায় বিভিন্ন কারণে ঐ সময়ের মধ্যে ৩৮৩৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ১২৯০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

কলিকাতা, ২২শে নভেম্বর—গত ২০শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে। সেই সপ্তাহে কলিকাতা শহরে সর্বপ্রকার মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৭০০ ; তৎপূর্ব সপ্তাহে ছিল ১৯৬০। গত বৎসর এই সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা ছিল গড়ে ৬৫১।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম, ২৩শে নভেম্বর—পল্লী অঞ্চলের মৃত্যু সংখ্যার হিসাবে দেখা যায়, কক্সবাজার মহকুমার

অন্তর্গত কুতুবদিয়া দ্বীপে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত ১০ হাজার লোক মারা গিয়াছে। এই দ্বীপের লোকসংখ্যা ৪২ হাজার।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ডে প্রকাশ, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন পল্লী অঞ্চল হইতে দলে দলে নিরন্ন শহরে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত সর্বসমেত ২৬৫৯ জন মারা যায়। পূর্ব বৎসর ঐ সময়ের মধ্যে মাত্র ৩৬৫ জন মারা গিয়াছিল।

ঢাকা

ঢাকা, ১৩ই নভেম্বর—বহু সংখ্যক নিরন্নের মৃত্যু এবং কলেরা, বসন্ত ও বিষম জ্বর প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবে ঢাকা নগরীতে মৃত্যু সংখ্যা বিগত আগস্ট মাস হইতে দ্রুত গতিতে বর্ধিত হইতেছে। মফঃস্বল হইতে সংগৃহীত সংবাদে প্রকাশ এখনও জেলার বিভিন্ন নদীবক্ষে মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতেছে এবং নদীর কিনারাতে ও বিভিন্ন স্থানে শকুন ও শৃগাল দিবালোকেই পরিত্যক্ত মৃতদেহ উদরসাৎ করিতেছে। রিলিফ কার্যে উৎসাহী জনৈকা বিশিষ্টা মার্কিন মহিলা সম্প্রতি একটি গহনার নৌকায় নদীপথে ২৫ মাইল ভ্রমণ করিয়া বান্দুরা, গইলা ও হাসানাবাদ অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারীদের সেবাকার্য পরিদর্শন করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধিকে বলেন যে, উক্ত ২৫ মাইল ভ্রমণকালে তিনি দিনের বেলায় ৬টি মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখেন। এই সময়ে নদীর ধারে ও বিভিন্ন স্থানে শৃগাল কুকুর কর্তৃক কয়েকটি নরদেহ ভক্ষিত হইতে দেখেন। তিনি ইহাও বলেন যে, অনেক নিরন্ন মাতা তাঁহাদের কনভেন্টে উপস্থিত হইয়া ৪।৫ টাকায় কন্যা বিক্রয় করিতে চাহিয়াছে। ইহা ছাড়া অনেকদিন প্রাতঃকালে কনভেন্টের ফটকে পরিত্যক্ত শিশু পাওয়া গিয়াছে। আপন সন্তানকে বাঁচাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সন্তানবৎসল মাতা অথবা পিতা এইরূপে শিশুকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

ঢাকা, ২১শে নভেম্বর—গত মাসে ঢাকা শহরে ১৩৪৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টার হইতে ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালের জুন হইতে অক্টোবর—এই পাঁচ মাসের মৃত্যু হারের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর
১৯৪২	২১৮	২৫৫	২৭০	২৮৬	৩৭৩
১৯৪৩	৩৩০	৪৬২	৮৪১	১০৬০	১৩৪৫

নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ, ৪ঠা নভেম্বর—গত অক্টোবর মাসে নারায়ণগঞ্জ শহরে (মিউনিসিপ্যাল এলাকা) ৭০১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে (গত বৎসর অক্টোবর মাসে ৯২ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ৭০১ জনের মধ্যে ৪৩৩ জন অনশনক্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জে মারা গিয়াছে।

মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জ, ১০ই নভেম্বর—পল্লী অঞ্চল হইতে খবর পাওয়া যাইতেছে যে, ক্রমাগত অনশনের ফলে, পুষ্টির অভাব এবং ম্যালেরিয়ায় প্রত্যহ বহু লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। নভেম্বর মাসে মৃত্যু সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, এতাবৎ অনশনে ও

আনুষঙ্গিক কারণে মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় অনুমান ১৫ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং দিন মজুর শ্রেণীর লোকদের অধিকাংশই ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া দিয়া আসাম, ত্রিপুরা বা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। পল্লী অঞ্চলের দুর্গমতার জন্য মৃত্যুসংখ্যা ঐদিকে অত্যধিক হইলেও ঐ সকল অঞ্চলে কোন সাহায্য পৌঁছুতে পারে না। চিকিৎসা সাহায্য, বিশেষতঃ প্রচুর পরিমাণে কুইনাইনের প্রয়োজন। মুন্সীগঞ্জ শহরে এ পর্যন্ত অনাহারে দুইশত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।
মুন্সীসঞ্জ, ১৯শে নভেম্বর—বেসরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, এতাবৎ অনশন, পুষ্টির অভাব ও বিভিন্ন রোগে ২০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

মাণিকগঞ্জ

মাণিকগঞ্জ, ৩০শে অক্টোবর—দারুণ দুর্ভিক্ষে মাণিকগঞ্জের সর্বত্রই মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি মাণিকগঞ্জের মফঃস্বলে মাত্র ৩টি গ্রামে অনাহারে ৩৪ জন লোক মারা গিয়াছে।

ফরিদপুর

ফরিদপুর, ১০ই নভেম্বর—গত ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহে ফরিদপুরে ১০৪ জন কলেরায় মারা গিয়াছে।

মাদারীপুর

মাদারীপুর, ১০ই নভেম্বর—স্থানীয় কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে এবং স্টীমার স্টেশনের নিকটে দুইটি মৃতদেহ শৃগাল কর্তৃক অর্দ্ধভক্ষিত অবস্থায় দেখা যায়। মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে দৈনিক ২৫ জনেরও বেশি লোক মারা যাইতেছে।

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ, ৫ই নভেম্বর—বাঙলার বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহ বর্তমানে কিরূপ দুর্ভিক্ষ কবলিত হইয়াছে, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার, ভূমিহীন চাষী মজুর ও সমাজের নিম্নস্তরের বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের নিদারুণ দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সমগ্র ময়মনসিংহে ইতিমধ্যেই বহু লোক অনাহার ও অনাহারজনিত ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং বর্তমানে প্রত্যহই অনশনে মানুষের জীবনান্ত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের নিত্য সহচররূপে কলেরা, বিষম ম্যালেরিয়া জ্বর ও আমাশয় সর্বত্র দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। মফঃস্বলে অনেক স্থানে বস্ত্র ও জ্বালানী কাষ্ঠের অভাবে অনশন পীড়িতদের মৃতদেহ সৎকার করা ঘটিয়া উঠিতেছে না। বিভিন্ন মহকুমায় নদী ও খালে মৃতদেহ ভাসিয়া যাওয়া এখন যেন স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। শৃগাল কুকুরে মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছে—এ ঘটনাও জেলায় বিরল নহে। দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চল সমূহের মধ্যে টাঙ্গাইলের অবস্থা শোচনীয় । কিশোরগঞ্জ মহকুমা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ময়মনসিংহের উত্তর ভাগের দুই একটি পল্লী এলাকা ব্যতীত অন্য কোথাও গভর্নমেন্টের নির্ধারিত মূল্যে ধান ও চাউল পাওয়া যায় না। বিভিন্ন শহরে চোরাবাজারে অগ্নিমূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে চাউল ২৫ টাকা হইতে ৪৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু টাঙ্গাইল মহকুমা সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য নহে। উক্ত মহকুমার অনেক স্থানে অত্যধিক মূল্য দিয়েও চাউল সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য।

নেত্রকোণা

নেত্রকোণা, ২৯শে অক্টোবর—গতকল্য রাত্রে পতিতালয় হইতে ১২টি বালিকাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ সকল বালিকাকে দশ আনা হইতে দেড় টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল।

কুমিল্লা

কুমিল্লা, ২রা নভেম্বর—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত কুমিল্লা সদর হাসপাতালে মোট ১৩৭৮ জন নিরন্নকে ভর্তি করা হয়। তন্মধ্যে ২৪৮ জন মারা গিয়াছে। এখানকার বাজারে প্রকাশ্যভাবে ৩২্ টাকা মণ দরে আউশের এবং ৩৮্ টাকা মণ দরে আমনের চাউল বিক্রয় হইতেছে।

চাঁদপুর

চাঁদপুর, ৫ই নভেম্বর—যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, অক্টোবর মাসে চাঁদপুরে মোট ১২০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

চাঁদপুর, ২২শে নভেম্বর—গত ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহে চাঁদপুর শহরে নিরন্নদের মৃত্যু হার পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য দুই সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৯ এবং ২৮৪। পল্লী অঞ্চলে মৃত্যুর হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। চাঁদপুর থানার এলাকাস্থ বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের প্রদত্ত হিসাবে প্রকাশ, তাঁহার ইউনিয়নের অন্তর্গত ৭।৮ খানি গ্রামে গত ১লা হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত ১০৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। চাঁদপুর হইতে রেভারেন্ড বি এন ইউ ১৬ই নভেম্বর তারিখে লিখিতেছেন, মফঃস্বল অঞ্চলে ১লা জুন হইতে ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত ১৬,০৭৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১০ই নভেম্বর—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ঐ সকল স্থানে সাহায্যের অভাবে বহু লোক অনাহারে মারা যাইতেছে। কলেরা, আমাশয় ও ম্যালেরিয়া রোগেও বহু লোক মারা যাইতেছে। ঔষধপত্র, বিশেষ করিয়া কুইনাইন পাওয়া যাইতেছে না। সৎকারের অভাবে মৃতদেহগুলি নদীতে এবং বিলে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। কসবা থানা এলাকায় বিনাউটী ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে ৪০ জন মারা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৩০ জন অনাহারে মারা গিয়াছে।

নোয়াখালী

নোয়াখালী, ১৩ই নভেম্বর—৬ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে রিলিফ হাসপাতালে ১৯ জন অনাহারপীড়িত রোগীকে ভর্তি করা হয় ; তন্মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয় এবং ৩০ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঐ সময়ে ৭৭ জন অনশনপীড়িত রোগীকে চৌমুহনীস্থিত জেলা বোর্ডের রিলিফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ৩৭ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ৬৪ জন অনশন পীড়িত রোগীকে রিলিফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তন্মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হয় এবং ২২ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বহরমপুর

বহরমপুর, ৮ই নভেম্বর—বহরমপুরের অন্তর্গত সৈদাবাদ অঞ্চলে একটি বাগানে গত ৩রা নভেম্বর একটি পরিবারের ৩ জনকে—স্বামী, স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তানকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। প্রকাশ, উহারা নিঃস্ব।

বহরমপুর, ১৫ই নভেম্বর—মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মুর্শিদাবাদ জেলায় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এ পর্যন্ত ৬৯ জন লোক মারা গিয়াছে।

বরিশাল

বরিশাল, ৪ঠা নভেম্বর—গত ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত এই চারি সপ্তাহে বরিশাল শহরে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় ৮৬ জন অনশনক্লিষ্টের মৃত্যু হইয়াছে। ১লা নভেম্বর হইতে ৪ঠা পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বরিশাল, ৫ই নভেম্বর—গত জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাখরগঞ্জ জেলায় প্রায় ১ হাজার লোক অনাহারে মারা গিয়াছে।

বরিশাল, ১৬ই নভেম্বর—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, গত ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত বরিশাল জিলায় অন্যূন ১৬শত লোক অনশনে মারা গিয়াছে।

বর্ধমান

বর্ধমান, ২রা নভেম্বর—গত জুলাই মাস হইতে এই স্থানে শ্মশানে মৃতদাহের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। গত মাসে ২২৬টি মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী মাস সমূহের সংখ্যা যথাক্রমে জুন ৪০, জুলাই ৭৮, আগস্ট ৯৭, সেপ্টেম্বর ১৫২।

কাঁথি

কাঁথি (মেদিনীপুর), ৮ই নভেম্বর—কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত খেজুরী থানার ৩, ৪, ৬ নং ইউনিয়নে গত সপ্তাহে অনাহারে, ম্যালেরিয়া এবং কলেরা রোগে প্রায় পাঁচ শত লোক মারা গিয়াছে।

রাজশাহী

রাজশাহী, ৪ঠা নভেম্বর—রামচন্দ্রপুর অঞ্চলে ১১২ ব্যক্তি অনাহারে রহিয়াছে। গত দুই মাসে ১১৩ ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ, ৩রা নভেম্বর—সিরাজগঞ্জ ও সলপ এলাকার বহু অনশনক্লিষ্ট পরিবার ভিটে বাড়ি ও টিনের চালা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এবং কেহ কেহ তাহাদের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া খাদ্যের সন্ধানে আসাম ও অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

সিরাজগঞ্জ, ৮ই নভেম্বর—সিরাজগঞ্জ বাজারে চাউল নাই। দুঃস্থ জনসাধারণ বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত পরিবারবর্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

পাবনা

চালুহারা (পাবনা), ২রা নভেম্বর—চালুহারা ও বিশবাড়িতে গত সেপ্টেম্বর হইতে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত অনশনের ফলে ১০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ৫৪টি পরিবারে ২৪১ জন লোকের মধ্যে মাত্র ৭১ জন লোক বাঁচিয়া আছে।

দিনাজপুর

দিনাজপুর, ৩রা নভেম্বর—স্থানীয় সদর হাসপাতালে গত অক্টোবর মাসে ৯৮ জন অনশনপীড়িত ব্যক্তি মারা গিয়াছে।

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ৭ই নভেম্বর—অনাহারজনিত উদরাময় রোগে ২৩শে অক্টোবর হইতে ৭ই নভেম্বরের মধ্যে ৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এ পর্যন্ত ঐ রোগে জলপাইগুড়িতে ১২১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

রংপুর

ডোমার (রংপুর), ৫ই নভেম্বর—দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি নগ্নভাবে সর্বত্র প্রকটিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র জায়গায় প্রায় "এমার্জেন্সী হাসপাতালে" শতাধিক অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে কলেরা ও অনাহারজনিত প্রতিক্রিয়ায় মোট ২৭২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

নাটোর

নাটোর, ২৩শে নভেম্বর—কলেরা, ম্যালেরিয়া এবং অনশনে গত মাসে এই মহাকুমায় ৮ শতের উপর লোক মারা গিয়াছে।

(১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

দেশের কথা

কলিকাতায় চাউলের মূল্য

বাঙলা দেশের অনেক স্থান হইতেই চাউলের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং বরিশালেই এতদিন পর্যন্ত চাউলের মূল্য সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য ছিল ;এই সব জায়গাতেও চাউলের দাম মণকরা ১০ টাকা হইতে ১৩ টাকার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে । কিন্তু কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্তী বাণিজ্য-প্রধান অঞ্চলগুলিতে এখনও রেশন ব্যবস্থায় চাউলের মূল্য পূর্ববৎ অনেক বেশী রহিয়াছে ; অথচ সে চাউলের কাঁড়া আ-কাঁড়া বাছাই করিবার উপায় এ অঞ্চলের অধিবাসীদের নাই। এমন বিসদৃশ ব্যাপার আর কতদিন চলিবে?

(৯ অগ্রহায়ণ ১৩৫১)

কলিকাতার খাদ্য-সমস্যা

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মিত্র সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বৃহত্তর কলিকাতার খাদ্য যোগাইবার ভার ভারত গভর্নমেন্টের হাতে থাকিবার ঔচিত্য এবং তৎসম্পর্কিত গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, বৃহত্তর কলিকাতায় বরাবরই সকল দেশের সকল জাতি বাস করিতেছে। সম্প্রতি এই অঞ্চল মিত্রপক্ষের পূর্ব রণাঙ্গনের সরবরাহ-ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে। ফলে যুদ্ধ প্রচেষ্টা অথবা তৎসম্পর্কিত অন্যান্য অপরিহার্য কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিযুক্ত লোকজনের সংখ্যাবৃদ্ধিতে বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙলা আজকাল যুদ্ধের অগ্রবর্তী ঘাঁটি ; সুতরাং ভারতের অন্যান্য ঘাটতি প্রদেশের সঙ্গে কোনক্রমেই তাহার তুলনা চলে না। এইরূপ অবস্থায় ভারত সরকার যদি বৃহত্তর কলিকাতার খাদ্য যোগাইবার দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন, তবে দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে। শরীর-রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় মাছ, তরিতরকারী, দুধ প্রভৃতি সর্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের মূল্যই যুদ্ধের পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি

পাইয়াছে এবং তাহা জনসাধারণেয় ক্রয়শক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে বৃহত্তর কলিকাতার চাহিদার টানে বাঙলা দেশে চাউলের দর যদি আবার বৃদ্ধি পায়, তবে জনসাধারণের দুর্গতির সীমা থাকিবে না এবং বাঙলার বাহির হইতে খাদ্যশস্য সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইলে বাংলা দেশে পুনরায় দুর্ভিক্ষ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। আমরা শ্রীযুক্ত মিত্রের বিবৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করি এবং ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদকে অনুরোধ করি, বৃহত্তর কলিকাতার খাদ্য যোগাইবার দায়িত্ব ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প তিনি পরিত্যাগ করুন ; অবশ্য কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, এ ক্ষেত্রে আমাদের যুক্তি পরামর্শের মূল্য বিশেষ কিছুই নাই।

(৯ অগ্রহায়ণ ১৩৫১)

কারণ কি?

শ্রীযুক্ত দিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত "দীপশিখা" কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া বিশেষভাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বাঙলা দেশের কর্ত্তৃপক্ষ এ নাটকখানিতে আপত্তিকর কিছু দেখিতে পান নাই, কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, দিল্লীর পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশনকে এই নাটক অভিনয় করিতে অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। এই নাটকে বাঙলার দুর্ভিক্ষের চিত্র ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। যদি ইহাই আপত্তির কারণ হইয়া থাকে, তবে এই প্রচেষ্টার তীব্রভাবে আমরা প্রতিবাদ করিব। দেশের দুঃখদুর্দশার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে দেশের লোককে অজ্ঞ রাখিবার, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার এমন নীতি কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। জাগ্রত জনমতই দেশের দুঃখদুর্দশার প্রতিকার করিতে পারে। কর্তাদের কৃপাদৃষ্টির ওপর ভরসা করিয়া থাকিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া দিল্লীর কর্তৃপক্ষের এমন অনর্থক এবং অযৌক্তিক আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা কর্তব্য।

(১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৫১)

সংবাদপত্রের অপরাধ

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে "বসুমতী"র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সংবাদপত্রকে জনগণের স্বাধীনতার সংরক্ষক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে জনগণের উপর প্রভুত্বপর স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্রের রোষদৃষ্টি সংবাদপত্রসমূহের উপর স্বভাবতই আপতিত হইয়া থাকে। শ্রীঘোষ বলেন—আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে গেলে ১৯২০ সালের চিকাগো ট্রিবিউনের বিরুদ্ধে চিকাগোর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আনীত মামলার তত্রত্য প্রধান বিচারপতি টমসনের উক্তি স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে। তথাকার কর্তৃপক্ষের আর্থিক নীতির সমালোচনা করিয়া ঐ পত্রে যে মন্তব্য করা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের সুনাম ক্ষুন্ন হইয়াছে এই অভিযোগে এই মামলা আনা হইয়াছিল। বিচারপতি টমসন তাঁহার রায়ে বলেন,—সভ্যতার অগ্রগতির পথে মানুষের প্রধান প্রধান অধিকার সম্পর্কিত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের স্বাধীনতার সংগ্রামও শুরু হয়। ইতিহাসই আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, অভাব-অভিযোগের কথা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষের কোন স্বাধীনতাই নিরাপদ নহে। তারপর সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অভাব-অভিযোগ

প্রকাশ করিবার নানা পথ যখন খুলিয়া গেল, জনসাধারণ ও তাহাদের স্বৈরাচারী শাসকবর্গের মধ্যে সংগ্রাম তখন তিক্ততর হইয়া উঠিল। ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে লোকে সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে লাগিল—আর তখন হইতেই সম্পাদকের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন সুরু হইল।

পরাধীন ভারতে সংবাদপত্রসমূহের উপর নির্যাতনের এই নীতি এখনও চলিতেছে। এখানে সত্য প্রকাশে সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা নাই এবং কর্তৃপক্ষের কণ্ঠরোধের নীতি অব্যাহত ভাবে চলিতেছে। শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রবাবু তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন—

১৯৪৩ সালে ভারতে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল—বহু নরনারী অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, বাংলা গভর্নমেন্ট তৎকালে এই দুর্দৈবকে খাদ্যাভাব ঘটে নাই, এই মিথ্যা আশ্বাসের দ্বারা এড়াইবার চেষ্টা করেন এবং তাহারা পাঞ্জাব হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া বিপুল-ভাবে লাভ করিতেও ইতস্তত বোধ করেন নাই. তখন ভারত গভর্নমেন্ট কি করিতেছিলেন, জানেন কি? এ সম্বন্ধে সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট লিখিয়াছিলেন,—

বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর তৎকালে কলিকাতার দৈনিক পত্রসমূহে হাসপাতালে যে-সব লোক অন্নাভাবের জন্য পীড়িত অবস্থায় ভর্তি হইত অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে যে সংবাদ সরবরাহ করিতেন ভারত সরকার কর্তৃক সে-সব সাধারণ সত্য কথা পর্যন্ত বাহিরে প্রেরণ করিতে দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের ভারতস্থ সংবাদদাতাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল। যে-সব ভয়াবহ সত্য বিবরণের ভীষণতা সরকারী দুর্ভিক্ষ বিবরণ ব্যবস্থার মাহাত্ম্যপূর্ণ বর্ণনার দ্বারা হ্রাস পাইত, শুধু দুঃখদুর্দশার তেমন কোন কোন বিবরণই বিদেশে পাঠাইতে দেওয়া হইত। অথচ ঐসব সরকারী ব্যবস্থার অধিকাংশেই শুধু সদিচ্ছা মাত্র থাকিত। সংবাদদাতাগণ অকালীন অব্যবস্থার সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য ব্রিটিশ এবং মার্কিন জনসাধারণকে জানাইবেন, এমন উপায় রাখা হয় না।

অতঃপর শ্রীযুত ঘোষ বলেন,—

ঐ সময় বাংলা সরকারের নিকট হইতে সংবাদপত্রসমূহ যেসব আদেশ, উপদেশ পরামর্শ প্রভৃতি পাইত, আমার বিশ্বাস, এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে, যখন সেগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হইবে। এই সময় 'স্টেটসম্যান' প্রথমে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা সম্বন্ধে বর্ণনা এবং চিত্রসমূহ প্রকাশ করিয়া সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরের সকলের দৃষ্টি বাঙলার শাসকের কুব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করে। এমন সম্মানের অধিকার অন্য কোন সংবাদপত্র লাভ করিতে পারে নাই।

ভারত যতদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ না করিবে, ততদিন এদেশের সংবাদপত্র জীবনের এই দুর্গতি দূর হইবে না, ইহা নিশ্চয়।

(২১ মাঘ ১৩৫১)

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৭ আগস্ট— অনাহারে এবং অল্পাহারের ফলে রাস্তায় মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত লোকদের চিকিৎসার জন্য গভর্নমেন্ট কলিকাতায় যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদনুযায়ী গতকল্য কলিকাতায় ৫০ জনকে রাস্তা হইতে তুলিয়া লইয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইহাদের মধ্যে ৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হইবার পর মারা গিয়াছে।

মাদারীপুরে ১৫ই আগস্টের এক সংবাদে প্রকাশ যে গত তিন সপ্তাহে তথাকার বিভিন্ন রাস্তায় ৪০টি মৃতদেহ পাওয়া যায়।

বহরমপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, আজিমগঞ্জ রেল স্টেশনের নিকট একটি অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণকায় মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

মুলতুবী প্রস্তাব—"গভর্নমেন্ট বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ করেন নাই ; এতৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে ডাঃ ব্যানার্জী, শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত ও মৌলবী আবদুল গণি তিনটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, সভাপতি সেগুলি বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন।"

১৮ই আগস্ট— অদ্য কলিকাতায় এ আর পি কর্মিগণ অনাহারে মৃতপ্রায় ৯৩ জন লোককে বিভিন্ন রাস্তা হইতে কুড়াইয়া হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ইহাদের মধ্যে ৯ জন পরে মারা যায়।

১৯শে আগস্ট— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথ হইতে এ আর পি কর্মিগণ অনাহারে মুমূর্ষু ১৮১ জন নরনারীকে কুড়াইয়া হাসপাতালে প্রেরণ করেন। তাহার মধ্যে ১৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হইবার পর এবং ৫ জন হাসপাতালে যাইবার পথে মারা যায়।

নাটোরের এক সংবাদে প্রকাশ, নাটোর শহরে ও মহকুমায় খাদ্য সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। গতকাল নাটোর স্টেশনে তিনজন ও শহরে দুইজন অনাহারে মারা গিয়াছে।

২০শে আগস্ট— আগামী ২৮শে আগস্ট হইতে বাঙলা সরকার দেশের সর্বত্র ধান ও চাউলেব মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং ধান ও চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। আউশ ধান উঠিলে যে সমস্ত অঞ্চলে ধান বাড়তি হইবে বলিয়া জানা যাইবে, সেই সমস্ত অঞ্চল হইতে বাঙলা সরকার ধান ও চাউল ক্রয় করিবেন বলিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাঙলা দেশ হইতে ধান ও চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গত ৫ দিনে কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা হইতে প্রায় ১২০ টি মৃতদেহ সরান হইয়াছে। শহরের রাস্তায় অনশনে মৃতপ্রায় ১৬০ জন লোককে অদ্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইহাদের মধ্যে ১৯ জন মারা গিয়াছে।

২১শে আগস্ট— অদ্য কলিকাতার রাস্তা হইতে মৃতকল্প ৪৮ জন লোককে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ৬ জন বেহালা হাসপাতালে মারা গিয়াছে এবং ২ জন ক্যাম্পবেল হাসপাতালের পথে মারা গিয়াছে।

উলুবেড়িয়ার এক সংবাদে প্রকাশ রাউতো গ্রামে খাদ্যাভাবে সম্প্রতি ৪ জন লোক মারা গিয়াছে।

২৩শে আগস্ট— অদ্য কলিকাতার ক্যাম্পবেল হাসপাতালে ৩৯ জন অনশনক্লিষ্ট লোককে ভর্তি করা হয়। অদ্য বেহালা এ আর পি হাসপাতালে ৭ জন অনশনক্লিষ্ট লোক মারা গিয়াছে।

(১১ ভাদ্র ১৩৫০)

২৪শে আগস্ট — বাংলা সরকার ভারত রক্ষা নিয়মাবলী অনুসারে খাদ্যশস্য মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশে ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নলিখিত হারে বাঁধিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—১৯৪৩ সালের ২৮শে আগস্ট হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কৃষকগণ ধান মণ করা ১৫ টাকার বেশী দরে এবং পাইকারী ব্যবসায়ীগণ চাউল মণ করা ৩০ টাকার বেশী দরে বিক্রয় করিতে

পারিবে না। ১৯৪৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কৃষকগণ ধান মণ করা ১২॥ বেশী দরে এবং পাইকারী ব্যবসায়ীগণ চাউল মণ করা ২৪ টাকার বেশী দরে বিক্রয় করিতে পারিবে না। ১৯৪৩ সালের ২৫শে সেপ্টে ম্বর হইতে কৃষকগণ ধান মণ করা ১০্ টাকার বেশী দরে এবং পাইকারী ব্যবসায়ীগণ চাউল মণ করা ২০্ টাকার বেশী দরে বিক্রয় করিতে পারিবে না।

পটুয়াখালির ২২শে আগস্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ ; পটুয়াখালিতে চাউল ৫০্ [টাকা] মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। ২১শে আগস্ট তিনজন মুসলমান খাদ্যাভাবে মারা গিয়াছে। ঢাকার ২৩শে আগস্ট সংবাদে প্রকাশ ; ঢাকায় অনাহারক্লিষ্ট তিন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

২৫শে আগস্ট— অদ্য কলিকাতায় ১৪ জন লোক অনাহারে মারা গিয়াছে। মুন্সীগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সংবাদ পৌছিবার পর বাজার হইতে চাউল অদৃশ্য হইয়াছে। চাউলের দর মণ করা ৪৫্ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। প্রত্যহ লোকের অনাহারে মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। নাটোরের সংবাদে প্রকাশ ; নাটোরে অনাহারে ৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

২৬শে আগস্ট— কুমিল্লার সংবাদে প্রকাশ যে, এ পর্যন্ত কুমিল্লায় অনশনের ফলে ১৩৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, গত দেড় মাসের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে নিরাশ্রয় ভিক্ষুকদিগের মধ্যে এক শতের অধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। নাটোরের সংবাদে প্রকাশ, নাটোরে প্রত্যহ ৩ হইতে ৬ জন অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বরিশালের সংবাদে প্রকাশ, ভোলায় প্রতি মণ চাউল ৪৩্ হইতে ৪৫্ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। রাস্তাঘাটে প্রায়ই মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

২৭শে আগস্ট— বঙ্গীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত এক প্রেস নোটে প্রকাশ, আউশ ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে যে-সকল জেলায় উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে পূর্বে ঘোষিত নীতি অনুসারে বঙ্গীয় সরকার তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি জেলা হইতে এজেন্টের মারফতে ধান ও চাউল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নির্বাচিত ঐ ছয়টি জেলার নাম—ময়মনসিংহ, রংপুর, মালদহ, নদীয়া, যশোহর এবং দিনাজপুর।

কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিনা অনুমতিতে একদিনে কোনও প্রীতিভোজ অথবা সামাজিক এবং ধর্ম সংক্রান্ত কোন অনুষ্ঠানে ৫০ জনের অধিক ব্যক্তিকে ভোজ দান বাঙলা গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে।

২৮শে আগস্ট— কলিকাতার বাজারে যে মাঝারী ও সরু চাউল ৩৫্ টাকা হইতে ৪২্ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত, গভর্নমেন্ট কর্তৃক চাউলের দর বাঁধিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্য হইতে সেই সকল চাউল বাজারে একরূপ দুস্প্রাপ্য হইয়াছে। খুব মোটা চাউল যাহা আগে ৩১্ টাকা হইতে ৩৩্ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত, তাহা সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে অর্থাৎ ৩২ টাকা দরে (খুচরা) বাজারে সামান্য পাওয়া যাইতেছে।

গতকল্য কলিকাতার রাস্তা সমূহ হইতে অনাহারে মৃতকল্প ৮৮ জন লোককে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং শব অপসারণকারী পুলিশ বাহিনী রাস্তাসমূহ হইতে ৪০টি মৃতদেহ অপসারিত করে।

২৯শে আগস্ট— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৮১ জন মৃতকল্প ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯ জন মারা গিয়াছে।

৩০শে আগস্ট— গতকল্য কলিকাতায় ২৩জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

(১৮ ভাদ্র ১৩৫০)

৮ই সেপ্টেম্বর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ১৬৫ জন অনাহারে মৃতকল্প ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই দিন হাসপাতালে মোট ৩৬ জনের মৃত্যু ঘটে এবং পুলিশ স্কোয়াড রাস্তা হইতে ২৭ টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করে।

পাবনার সংবাদে প্রকাশ ; অনাহারের ফলে অদ্য পাবনায় ৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে তিন জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জে ৫ জন লোক অনাহারে মারা গিয়াছে।

১০ই সেপ্টেম্বর— বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য স্যার জগদীশ প্রসাদ অদ্য বাঙলার প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিনের হস্তে প্রদত্ত একখানি স্মারকলিপিতে বলেন, "বাঙলায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, স্মরণীয়কালের মধ্যে এরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই।" সম্প্রতি ফরিদপুর জেলা পরিদর্শন করিবার সময় সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে স্যার জগদীশ বলেন," ফরিদপুরে একটি লঙ্গরখানায় আমি একজন লোককে কুকুরের ন্যায় লেহন করিয়া খাইতে দেখি।"

বর্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য বর্ধমান শহরে ৪ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তি মারা গিয়াছে। কাঁথির সংবাদে প্রকাশ, শহরের রাস্তায় রাস্তায় অনাহারে মৃত্যু সংখ্যা ক্রমে অত্যধিক বাড়িয়া চলিয়াছে ; গত আগস্ট মাসে কাঁথি শহরে ১২৭ জন লোক অনাহারে মারা গিয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর— চাঁদপুরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১১ই আগস্ট হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে ৩৯ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তি স্থানীয় এলগিন হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ২৫শে জুলাই হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অতিরিক্ত হাসপাতালে ১৮৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত আগস্ট মাসে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা হইতে কুড়াইয়া প্রায় ১০০টি মৃতদেহের সৎকার করা হইয়াছে।

কলিকাতায় অনাহারে মৃতপ্রায় নরনারীকে বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৪৬১ জন পরে হাসপাতালগুলিতে মারা যায়। উক্ত কালের মধ্যে শব-অপসারণকারী পুলিশ স্কোয়াড মোট ৪৭৬টি মৃতদেহ শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে অপসারণ করে।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত ৪ঠা হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৬৮ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ; তন্মধ্যে ৬ জন ভর্তির পরেই মারা যায়। প্রত্যহই রাস্তায় মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

১২ই সেপ্টেম্বর—কুমিল্লার সংবাদে প্রকাশ, সরকারের নিয়ন্ত্রিত দর ২৬ টাকা মূল্যে এখানকার বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছে না. বাজার হইতে চাউল উধাও হওয়ায় লোকে চাউল কিনিতে পাইতেছে না। কেবলমাত্র সরেস আতপ চাউল ৭০ টাকা মণ দরে পাওয়া যাইতেছে।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে অনাহারে মৃতকল্প মোট ১২৮ জনকে ভর্তি করা হইয়াছে।

এই দিন হাসপাতালসমূহে মোট ৩৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। শব অপসারণকারী পুলিশ স্কোয়াড শহরের রাস্তা হইতে ৩৬টি মৃতদেহ সরাইয়াছে ; তন্মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ২৩জন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(১ আশ্বিন ১৩৫০)

১৪ই সেপ্টেম্বর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ১১৮ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় তন্মধ্যে ৪২ জনের মৃত্যু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ৩২টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয়। তন্মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

অনাহারে মৃত্যু সংবাদ— ১১ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ঢাকায় অনশনে ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং দুর্বলতাবশতঃ আরও ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জ শহরে মোট ৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে বগুড়ায় মোট ২৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর— ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যশোহর, বরিশাল, ঘাটাল, মুন্সীগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে এই মর্মে টেলিগ্রাফ পাইয়াছেন যে, চাউল বাজারে আদৌ পাওয়া যাইতেছে না— লোকে অনশনে আছে।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ২০০ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় ;তন্মধ্যে ৫৬ জনের মৃত্যু ঘটে। শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ৩৯টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে ;তন্মধ্যে ২১ জনের অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

অনাহারে মৃত্যু সংবাদ— গত সপ্তাহে টাঙ্গাইল শহরের রাস্তায় ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সিরাজগঞ্জে আরও তিন জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ২০০জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় ;তন্মধ্যে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ৩০টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয় ;তন্মধ্যে অনাহারে ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অনাহারে মৃত্যু সংবাদ—আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কুমিল্লার হাসপাতালে ১০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। নওগাঁ (রাজশাহী) মহকুমার অন্তর্গত রানীনগর থানার কয়েকটি গ্রামে গত কয়েক সপ্তাহে প্রায় তিন শতাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১৭ই সেপ্টেম্বর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৪১ জন অনাহারে মৃতকল্প ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় ;তন্মধ্যে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ৪১টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয়। তন্মধ্যে ১৩টি মৃতদেহ অনশনঘটিত।

অনাহারে মৃত্যু সংবাদ— বাঁকুড়ায় এ পর্যন্ত ৪৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জে তিন জন, পাবনায় তিন জন এবং জিয়াগঞ্জে একজনের মৃত্যু হইয়াছে। আগস্ট মাসে নারায়ণগঞ্জে রাস্তায় ১৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর— কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৯৫ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়, তন্মধ্যে ৫০ জনের মৃত্যু ঘটে।

অনাহারে মৃত্যু— মাদারীপুর শহরে এ পর্যন্ত অনাহারে পীড়িত ১৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত ১লা হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে রাস্তায় ১১২ জনের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জে এ পর্যন্ত ৫৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর— কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ২৫০ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয় ;তন্মধ্যে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ৪০টি মৃতদেহ অপসারিত হয় ; তন্মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ১৩।

(৮ আশ্বিন ১৩৫০)

২১শে সেপ্টেম্বর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ২৮৮ জন অনাহারে মৃতকল্প ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় ;তন্মধ্যে ৪৭ জনের মৃত্যু হয়। এই দিন পুলিশ স্কোয়াড রাস্তা হইতে ৪৭টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করে। তন্মধ্যে ২৭ জনের মৃত্যু অনশনঘটিত।

২২শে সেপ্টেম্বর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ২৩০ জন অনাহারে মৃতকল্প ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় ;তন্মধ্যে ৫১ জনের মৃত্যু হয়। ইহা ছাড়া পুলিশ স্কোয়াড রাস্তা হইতে ৩৯টি মৃতদেহ সরায়। ইহাদের মধ্যে ২৪ জনের মৃত্যু অনশনঘটিত।

২৩শে সেপ্টেম্বর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৪০ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় ;তন্মধ্যে ৫৬ জনের মৃত্যু হয়। এই দিন কলিকাতার রাস্তা হইতে ৫২টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয় ;তন্মধ্যে ২৯ জনের অনশন মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ হইতে বাঙলা গভর্নমেণ্টের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কার্য পরিচালনা ব্যবস্থা এম. এস. ইস্পাহানী লিমিটেডকে কিছুদিনের জন্য বাঙলা সরকারের খাদ্যশস্য ক্রয়ের সোল এজেন্ট নিয়োগ করার তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সহিত সরকারি কার্যের সমর্থন করা হয়।

ভারতের বিশেষত বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কমন্সসভায় বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ভারত সচিব মিঃ আমেরী বলেন,—"কলিকাতা নগরীসহ বাঙলাদেশ ভারতের বর্তমান খাদ্য সঙ্কটের কেন্দ্রস্থল। কলিকাতা নগরী ও বাঙলার বিভিন্ন জেলার মর্মন্তুদ অবস্থার বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। গত সাত মাসে কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা স্বাভাবিক মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা ৩০ ভাগ বেশী। বস্তুত উদ্বেগের কারণ বর্তমান।"

২৫শে সেপ্টেম্বর— বাঙলাকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা এবং নিরন্নদিগকে খাওয়াইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস (কংগ্রেস পার্লামেন্টরী দল) যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ২৮-১২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

অদ্য কলিকাতায় মোট ৯২ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে হাসপাতালে ৫২ জন এবং রাস্তায় ৪০ জন মারা গিয়াছে।

২৬শে সেপ্টেম্বর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতাল সমূহে ২৫৬ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় এবং তন্মধ্যে ৫৪ জনের মৃত্যু হয়।

(১৫ আশ্বিন ১৩৫০)

৩০শে সেপ্টেম্বর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৬৮ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

১লা অক্টোবর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৭২ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৩রা অক্টোবর— অদ্য কলিকাতা শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ৯২ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৯ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৫ই অক্টোবর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৬৬ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৬ই অক্টোবর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৩ অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৭ই অক্টোবর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৮ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৮ই অক্টোবর— অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৫৯ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

(২৯ আশ্বিন ১৩৫০)

১৮ই অক্টোবর— মেদিনীপুর জেলায় এক সপ্তাহকাল সফর শেষে ফিরিয়া আসিয়া নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্তা রাজন নেহরু এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "নরমাংসের স্বাদ গ্রহণের আশায় কুকুর এবং শকুনি মুমূর্ষু শিশুর পাশে বসিয়া আছে—এ দৃশ্য কাঁথিতে অসাধারণ কিছু নহে।"

ময়মনসিংহ জেলার পল্লী অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—কচুগাছ এবং আরও নানা লতাজাতীয় গাছ আজকাল গ্রামে খুব কমই দেখা যায় কারণ গ্রামবাসীরা ইহাই তাহাদের বর্তমানের একমাত্র সম্বল করিয়াছে। রাস্তায় ঘাটে মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। কলেরা, স্থানে স্থানে বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। শত শত লোক প্রতিদিন এই জেলায় মারা যাইতেছে। সমস্ত জেলাটাই যেন শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার অবস্থা সম্পর্কে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—"এই অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। খাদ্যের অভাবে প্রত্যহ দুই চার জনের মৃতদেহ রাস্তার ধারে, হাটের সম্মুখে, কাছারীর প্রাঙ্গণে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।"

১৯শে অক্টোবর— কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৯১ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

২০শে অক্টোবর— অদ্য প্রাতে ভাইকাউন্ট ওয়াভেল ভারতের বড়লাটরূপে শপথ গ্রহণ করেন। লর্ড লিনলিথগো ও তদীয় পত্নী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৯০ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

২১শে অক্টোবর— ডায়মণ্ডহারবারের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থা বর্ণনাতীত। প্রতি গ্রাম হইতে দৈনিক বহু অনাহারে মৃত্যু সংবাদ আসিতেছে। শৃগাল কুকুরে নরমাংস ভক্ষণ করিতেছে। সৎকারের কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই।

কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৮৩ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

২২শে অক্টোবর— পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর পরিভ্রমণের পর গতকল্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি ঐ সমস্ত অঞ্চলের দুর্দশা সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, শহর ও পল্লী অঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই জনসাধারণের অনশন ব্যতীত গত্যন্তর নাই; কিন্তু শহর অপেক্ষা পল্লী অঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয়। গ্রামবাসীদের বিশেষত নারী ও শিশুদের কষ্ট দেখিলে চক্ষে জল আসে। স্বামী কর্তৃক পত্নী ত্যাগ এবং পিতামাতা কর্তৃক সন্তান ত্যাগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি আরও বলেন যে, যেখানেই যাওয়া যাক্ না কেন, সেখানেই মৃতদেহ এবং অনাহারে শীর্ণ লোক দেখা যায়। রাস্তায় নিঃস্ব লোকদিগকে চলন্ত মৃতদেহের ন্যায় দেখায়। তাহারা যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে উহা অলৌকিক ব্যাপার হইবে। ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বারদী ইউনিয়ন হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথায় একজন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির শরীরের কিয়দংশ একটি শৃগালে ভক্ষণ করিয়াছে।

কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৮১ জন অনশনাক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তাসমূহ হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৪২৭টি অনশনক্লিষ্টের মৃতদেহ অপসারিত হইয়াছে।

সরকারীভাবে সংগৃহীত হিসাব হইতে নির্ধারিত হইয়াছে যে, গত ১৬ অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে কলিকাতায় অনাহারে ১০১৮ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

২৩শে অক্টোবর — কুমিল্লা হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন— ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলে দেখিলাম, অনশনক্লিষ্ট নরকঙ্কালের দল। ইহাদের না আছে অন্ন, না আছে বস্ত্র। কোনও কোনও পল্লীতে মাঝে মাঝে মৃত ও অর্ধমৃত মানুষ দেখা যায়।

কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৮৬ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

২৪শে অক্টোবর— কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৬৬ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

২৫শে অক্টোবর— নিখিল ভারত মহিলা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতার কাহিনী এক বিবৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বিবৃতির এক স্থানে বলিয়াছেন—"খড়্গপুর ও কাঁথির মধ্যবর্তী অঞ্চলে আমি তিনটি মৃতদেহ ও পাঁচটি নরকঙ্কাল পড়িয়া থাকিতে দেখি। একটি মৃতদেহ পূর্বেই জীবজন্তুতে আক্রমণ করিয়া তাহার নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল। শকুনিরা প্রথমে মৃতদেহটি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারপর একটি কুকুর সে কার্য সমাধা করিতেছিল। আর একটি স্থানে একজন বৃদ্ধাকে সদ্য মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার দেহ তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই। তাহার কঙ্কালসার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তাহার মুখের চেহারা ভীতিপ্রদ। একটি স্ত্রীলোককে একখণ্ড ময়লা ও একটি পাত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়া মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। সে দৃশ্য মর্মস্পর্শী।"

(১৩ কার্তিক ১৩৫০)

২৩শে নভেম্বর— কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৪৪ জন নিরন্নের মৃত্যু ঘটে।

২৪শে নভেম্বর— কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৫৬ জন নিরন্নের মৃত্যু হয়।

২৫শে নভেম্বর— কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৪৬ জন নিরন্নের মৃত্যু ঘটে।

২৬শে নভেম্বর— কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৩৭ জন নিরন্নের মৃত্যু ঘটে।

বাঙলার বর্তমান সঙ্কটে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নেপালের মহারাজা নেপালে মজুত উদ্বৃত্ত ধান ও চাউল বাঙলার সাহায্যকল্পে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

২৭শে নভেম্বর— কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৩১ জন নিরন্নের মৃত্যু হইয়াছে।

২৮শে নভেম্বর— কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৪৬ জন নিরন্নের মৃত্যু হয়।

(১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

৩০শে নভেম্বর— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৫৭ জন নিরন্নের মৃত্যু হয়।

১লা ডিসেম্বর— কান্দীর এক সংবাদে প্রকাশ, কান্দী সাব ডিভিসনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কলেরা, ম্যালেরিয়া ও খাদ্যাভাবজনিত রোগে কান্দী মহকুমায় ৫০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৩৪ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

২রা ডিসেম্বর— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ২৪ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

৩রা ডিসেম্বর— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ২৭ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ২১ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

৫ই ডিসেম্বর— ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সিদ্ধিগঞ্জ গ্রামে অনাহার, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগে মোট জনসংখ্যার ১২শত লোকের মধ্যে ৮ শত লোক মারা গিয়াছে বলিয়া ঢাকা জেলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার বসু জানাইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ঐ অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৩৩ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

(২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

৭ই ডিসেম্বর— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ২৭ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

৮ই ডিসেম্বর— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৩১ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

৯ই ডিসেম্বর— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৪০ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

১০ই ডিসেম্বর— গত ডিসেম্বর মাসে ঢাকা শহরে নানা কারণে ১ হাজার ৫ শত ৫৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

১১ই ডিসেম্বর— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১৯ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

(৯ পৌষ ১৩৫০)

১৪ই ডিসেম্বর— ভোলার সংবাদে প্রকাশ, অনশনে এবং ম্যালেরিয়া ও আমাশয় প্রভৃতি রোগে ভোলা মহকুমায় এ পর্যন্ত অন্যূন ৪০ হাজার লোক মারা গিয়াছে।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ২২ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

১৬ই ডিসেম্বর— কমন্স সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব মিঃ আমেরী বলেন, সারা বাঙলায় দুর্ভিক্ষে কত লোক মারা গিয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে ১৬ই আগস্ট হইতে ১১ই ডিসেম্বর (১৯৪৩) কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যার হিসাব এই,—(১) নিরন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয় ১৬২৮৫ জন। ইহাদের মধ্যে ৬১৩৬ জন মারা যায়। এতদ্ব্যতীত ১লা আগস্ট হইতে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় পুলিশ এবং বেসামরিক সাহায্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ৯২১৬টি মৃতদেহের

সৎকার করে। তবে এই মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে কতকগুলি অনাহারে মৃত্যু না-ও হতে পারে। ২৭শে জুন হইতে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত সারা বাঙলায় কলেরা রোগে ৭৭৯৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। [(২)-এর কোনো উল্লেখ নেই।]

(৯ পৌষ ১৩৫০)

১৮ই ডিসেম্বর— বাঙলা গভর্নমেণ্ট এক প্রেস নোটে জানাইয়াছেন যে, গত ১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সমগ্র বাঙলায় এখনও ৫ হাজার ৭ শত ২০টি লঙ্গরখানা হইতে ২০ লক্ষের অধিক সংখ্যক লোককে খাওয়ানো হইতেছে।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ২৩ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

২১শে ডিসেম্বর— ভারতের মুসলমানদের প্রতি এক আবেদনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন জানাইতেছেন যে, "চট্টগ্রাম শহরে বিগত পাঁচ মাসে তিন হাজার লোক মারা গিয়াছে। নোয়াখালি জেলায় ২১ লক্ষ লোকের মধ্যে দুই লক্ষ হইতে আড়াই লক্ষ লোক ইতিমধ্যেই মারা গিয়াছে এবং আরও প্রায় দুই লক্ষ লোক মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা), নীলফামারী (রংপুর) এবং কান্দী (মুর্শিদাবাদ) এই তিনটি মহকুমার প্রত্যেকটি গত কয়েক মাসের মধ্যে অনাহারে পুষ্টির অভাবে, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগে প্রায় ৫০,০০০ করিয়া লোক মারা গিয়াছে। গত পাঁচ মাসে ফরিদপুরে ৫,৪৬,৯৭১ জন ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩০,০৭৫ জন মারা গিয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর— বরিশালের সংবাদে প্রকাশ, গত জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্যন্ত বরিশাল জেলায় অনাহার, কলেরা, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর প্রভৃতিতে ৩২.৭০১ জন লোক মারা গিয়েছে।

(১৬ পৌষ ১৩৫০)

১১ই জানুয়ারী— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১৭ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।
১২ই জানুয়ারী— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৯ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।
১৩ই জানুয়ারী— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১১ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।
১৪ই জানুয়ারী— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১৫ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।
১৫ই জানুয়ারী— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১২ জন নিরন্নের মৃত্যু হয়।
১৬ই জানুয়ারী— অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ২২ জন নিরন্নের মৃত্যু হয়।

(৮ মাঘ ১৩৫০)

বঙ্গশ্রী

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

বাঙ্গালার দুর্দিন

"বাঙ্গালায় খাদ্য-তণ্ডুলের অভাব নাই, লোকে এমন কি চাষী পর্যন্ত, দুষ্টামি করিয়া চাউল ধরিয়া রাখিয়া অন্নাভাব ঘটাইতেছে" বলিয়া খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী মহোদয় আজ তিনমাস বাঙ্গালাদেশকে বুঝাইয়া আসিতেছেন। ক্ষুধার তাড়না ভুলিয়া যাহাতে লোকে চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, "তক্তাপোষের" তলা হইতে তাঁহার খাদ্যান্বেষণ প্রচেষ্টাকে যাহাতে কেহ সমালোচনা করিতে না পারে তাহার জন্য তিনি এক জরুরী আইন লটকাইয়া দিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছেন, অথচ তাঁহার সেই অনুসন্ধানের ফল যে খুব আশাপ্রদ হইয়াছে কিংবা চাউলের দর যে অসম্ভব হ্রাস পাইয়াছে এমন নহে, তথাপি তিনি আর এক দফায় বিবৃতি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ২৭শে আষাঢ় ব্যবস্থাপক সভায় কিন্তু তিনি বলেন যে, "প্রকৃতপক্ষে সমস্ত স্থান হইতে অন্নের অপ্রতুলতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ইহাই বাঙ্গালাদেশের প্রকৃত চিত্র।" যখন চাউলের অভাবে হাহাকার পড়িয়াছে, তখন যিনি বলিয়াছেন, অভাব নাই ; এবার যখন তিনিই অভাব আছে বলিতেছেন, তখন দেশের প্রকৃত অবস্থা কী? এ অবস্থা তাঁহার বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যে করুণ দৃশ্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, যে মর্মন্তুদ কাহিনী পল্লী অঞ্চল হইতে আসিয়া কানে পৌঁছিতেছে, তাহাতে কাহাকেও সত্য ঘটনা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যখন দ্রব্যমূল্য অনবরতই বাড়িয়া চলে তখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করিতে হইবে—

১. লোকের দান বন্ধ হওয়ায় লোক দলে দলে রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায় কি না ;

২. লোকে আর ধার পায় কি না ;

৩. তণ্ডুলের বাজারে তীব্র বেচাকেনা আছে কি না ;

৪. অপরাধের আধিক্য দ্বারা দেশের মধ্যে চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে কি না ;

৫. খাদ্যের সন্ধানে পশুগণের দিকে দিকে ভ্রমণ পরিলক্ষিত হইতেছে কি না ;

৬. লোকের অস্বাভাবিকভাবে ঘুরিয়া বেড়ান পরিলক্ষিত হইতেছে কি না ;

৭. অধিকতর ভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন চলিতেছে কি না ;

যখন কোন সরকারী কাজে অধিকতর মজুর আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা কিছুদিন ধরিয়া অধিকতর দান করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখনই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রাদেশিক সরকারকে তার যোগে অবস্থা জানাইবেন এবং সরকার কোন একটি জেলায় বা কয়েকটি জেলার দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিবেন।

লোক অস্বাভাবিকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, লোকের নিকট ধার পাওয়া যায় না, লোকের অন্ন দান করিবার শক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছে, এ সব কি আর সরকারী অনুসন্ধান দ্বারা নির্দ্ধারিত করিবার প্রয়োজন আছে? এখনও সাধারণ চাউলের দাম ৩২্ হইতে ৩৫্ টাকা মণ ; সুতরাং তণ্ডুলের বাজারের বেচাকেনার তীব্রতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন নাই। ২৩শে আষাঢ় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার নাজিমুদ্দিন বলিয়াছেন, সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশে প্রতিদিনই অপরাধের সংখ্যা অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অত্যধিক আর্থিক দুর্দশাই ইহার একমাত্র কারণ ; "Throughout the province the figures of crimes are daily increasing rather than decreasing and as to the reasons for the increase of such crimes, this must be due to the present economic situation."

তাহা ছাড়া ১৮ই আষাঢ় (৩রা জুলাই) চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেছেন যে, চাউলের দারুন অভাব (Serious shortage of rice–A.P.) হইয়াছে। তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের অবস্থার আর বাকী কি রহিল? এ অবস্থা অতীব ভীষণ ; কিন্তু ভীষণতর অবস্থা হইতে ভীষণতম অবস্থা, যাহা এখনও আসিতে বাকী আছে, তাহারই জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হইতে আমরা সতর্কিত করিতে চাই। বঙ্গশ্রী বর্ত্তমান অভাবের চিত্রের পূর্বাভাষ আট বৎসর আগেই দিয়া আসিয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য ও দেশের দুর্ভাগ্য আমরা অবহিত হই নাই। আজ সত্যই বড় দুর্দ্দিন।

(শ্রাবণ ১৩৫০)

নিখিলবঙ্গ খাদ্য সম্মেলন

সরকারী ব্যবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব দূর করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে যে পরিমাণ লোকের সাহায্য হইতেছে, তাহার তুলনায় বহুগুণ লোক গুরুতর কষ্ট ভোগ করিতেছে। তাহার উপর ১১ই আষাঢ় তারিখে কলিকাতা ইনষ্টিটিউট হলে বেসরকারী খাদ্য সম্মেলন হওয়ায় লোকে আশা করিতেছিল যে, এরূপ প্রতিষ্ঠানও কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সভায় লোক সমাগম ও পত্রিকাদিতে তাহার বিবরণী প্রকাশ ভালই হইয়াছে। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধান প্রধান অভিনেতার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সেদিন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। মাত্র দেড় মাস তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব গিয়াছে, আজ তাঁহারাই খাদ্য সম্মেলনের উদ্যোগী, আশা করা গিয়াছিল সরকারী দপ্তরে যে সকল ত্রুটী তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন তাহা নিবারণ করিয়া এই সম্মেলনে কোন কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু কয়েকটি মন্তব্য গ্রহণ করা এবং তাহা পত্রিকা মারফত প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়া ইহারা সকলেই দুবেলা ভরপেট খাইয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছেন মনে করিতে পারি। প্রতিদিন পত্রিকাদিতে নানা সুপরামর্শ প্রচারিত হয়, তাহার উপর সভায় গৃহীত মন্তব্যের নূতন কিছু মূল্য সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একটী মন্তব্যে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীত্ব গঠন করিবার কথা বিশেষ জোরের সহিত বলা হইয়াছে। সন্দেহ হয়, ইহাই হয়ত সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা না হইলে এরূপ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইলে "ডাল-ভাত" ব্যবস্থা কিরূপে সুগম হইবে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। [যদি] একটী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে ব্যাপকভাবে এই সমস্যা অন্ততঃ আংশিকভাবেও সমাধান করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেও কিছু কাজ হয়।

প্রতি জেলায় কয়েকটি করিয়া কেন্দ্র স্থাপন করিয়া অন্ন সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিলে বুঝা যায় যে খাদ্য সম্মেলন সফল হইয়াছে ;আর তাহা না হইলে বুঝিতে হইবে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করাই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

(শ্রাবণ ১৩৫০)

"জ্বলে দীপমালা..."

চারিদিকে অন্নের অভাবে হাহাকার উঠিয়াছে ; সাধারণ লোকের দুর্দশা অবর্ণনীয় ; প্রয়োজনের অনুপাতে নিতান্ত কম হইলেও হৃদয়বান ব্যক্তিরা দরিদ্র নিরন্নকে অন্ন দিবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সময় ধনী লোকদিগের বিবাহাদি সামাজিক কর্ম্মে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আলোক-নিয়ন্ত্রণের সমস্ত বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করিয়া ইঁহারা দীপমালায় প্রাসাদ সজ্জিত করিতেছেন, বুভুক্ষু অনাহারক্লিষ্ট লোক যখন এক মুষ্টি চাউল আটা পায় না, তখন ইঁহারা পোলাও লুচি করিয়া কেবল আত্মীয় স্বজন নহে, বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যাহাদের পরিতৃপ্ত করিতে হয় সেইরূপ অজস্র লোকদিগকে ভুরিভোজন করাইতেছেন, অপচয় করিয়া দেশদ্রোহিতা করিতেছেন। এই সকল ধনী কেহ কেহ অন্ন, বস্ত্র, দরিদ্রের নামে সংগৃহীত চাউল, গোপনে বিক্রয় করিয়া ধনগৌরব দেখাইতেছেন। তাঁহারা হৃদয়হীন, তাঁহাদের দীপমালা আজ তাঁহাদের মনের অন্ধকার প্রকট করিতেছে। যদি এই সকল লোকের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান না থাকে, সরকার আইন করিয়া ইঁহাদের কণ্ডুয়ান নিবৃত্তি করিলে দরিদ্র লোক আরও হয়ত একবেলা খাইতে পায়।

(ভাদ্র ১৩৫০)

বড়লাটের বক্তৃতা

বড়লাট বাহাদুর ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় পরিষদের যুগ্ম অধিবেশনের এক বক্তৃতায় তাঁহার কার্য্যকালের এক ফিরিস্তি দিয়াছেন। তাহাতে বহু কথাই আছে, কেবল ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার এই দারুন অন্নকষ্টের কথা বা তাহার প্রতিকারের চেষ্টার কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয়, ইংরেজ শাসনে, ইংলন্ড ছাড়া কোথাও নাগরিকদিগের অন্ন-বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, বিশ্রাম প্রভৃতি লাট দপ্তরের গণ্ডীর বাহিরে ;কেবল শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারিলে সকল কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইল। তিনি কি এই সমাগত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটীও সদয়বাণী খুঁজিয়া পাইলেন না?

(ভাদ্র ১৩৫০)

ভারতের অন্ন-সমস্যা ও মিঃ আমেরী

ভারতের অন্ন সমস্যা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব মিঃ আমেরী বলিয়াছেন যে, চাষীরা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়ার্থ আর তেমন আনিতেছে না এবং অনেকেই খাদ্যশস্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুত করিতেছে। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার হইতে আমেরী সাহেব ভারতের অন্ন সমস্যা সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা প্রাপ্তির সূত্র আমরা অবগত নহি, তবে

ভারতের কৃষিজীবীদের অবস্থা সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের চাষীরা বর্ত্তমানে তাহাদের জীবনধারণের উপযুক্ত খাদ্যাদিই উৎপন্ন করিতে পারে না, যৎসামান্য যাহা উৎপন্ন করে তাহাও জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। এ হেন অবস্থায় তাহারা খাদ্য-শস্যাদি বাজারে না আনিয়া ঘরে মজুত রাখিবে—এমন কথা প্রলাপ ভিন্ন কিছুই নয়। এমন একটী দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকিয়া প্রকৃত দায়িত্ব সম্বন্ধে অবচেতন মিঃ আমেরীর নিকট অনুরোধ, তিনি যেন ভারতের বর্ত্তমান অন্নসমস্যার প্রকৃত কারণ কি তাহা অবগত হইতে সচেষ্ট হন।

(ভাদ্র ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি

বিষ্ণুপুর (ইউনাইটেড প্রেস) হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, পথের উপর পরিত্যক্ত অন্নের অংশ লইয়া একটি কুকুর ও আর একটি বালকের মধ্যে কাড়াকাড়িতে কুকুর বালকটিকে দংশনে গুরুতররূপে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে, অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘাটাল (১৬ই আগস্ট) ৩০শে শ্রাবণ—এক সপ্তাহ হইল সিংপুর গ্রাম নিবাসী পঞ্চুরাম কাটালের পত্নী তাহার দুগ্ধপোষ্য কন্যাটিকে অন্নাভাবের দরুন স্থানীয় শীতলচন্দ্র সূত্রধরের পত্নীকে দিয়া চলিয়া যায়। গতকল্য দাসপুর থানার ভরতপুর গ্রামের লক্ষণচন্দ্র জানা তাহার তিন বৎসরের শিশুপুত্রটিকে পরিত্যাগ করিবার জন্য স্থানীয় বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার স্ত্রী এক বৎসর হইল বাতে শয্যাশায়িনী, সে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা সংসার চালাইতে অক্ষম হওয়ায় শিশুটিকে পরিত্যাগ করিতে চাহে।...

...চারিদিকে অন্নাভাবে বহু পরিবার অনশনে কালাতিপাত করিতেছে। প্রতিদিন সহরে বহু কঙ্কালসার অর্দ্ধনগ্ন মুর্ত্তি দেখা যাইতেছে, তাহা মর্মন্তুদ।—নিঃ সঃ

পাবনা (১৪ই ভাদ্র)—একটি আশ্রয় ও অন্নহীন স্ত্রীলোক তাহার তিনটি শিশুসন্তান লইয়া সমস্ত দিন চেষ্টার ফলে এক সের চাউল সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার সময় সহরে আসিতেছিল। পথে অপর এক ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তাহা ছিনাইয়া লয়। স্ত্রীলোকটি করুণভাবে কাঁদিতে থাকে। ইউ পি।

চাঁদপুর (১৩ই ভাদ্র)—চাঁদপুরের মুসলমান যুবক সমিতি মে মাসে ২৯, জুন মাসে ২০, জুলাই মাসে ১২০ এবং ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত ১৬০ জন বেওয়ারিশ মৃতদেহের কবর দিবার ব্যবস্থা করে। লাশগুলি পথের উপর পাওয়া গিয়াছে এবং মৃত্যু অনশনঘটিত বলিয়া মনে হয়। ইউ পি।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ—৮ই ভাদ্র (২৫শে আগস্ট) তারিখের সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতার রাস্তায় মৃতদেহ পড়িয়া থাকার সংবাদে লন্ডনে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিশ্বাস (?) যে, ইণ্ডিয়া অফিস অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। এ বিশ্বাস (?) যে কাহার তাহা জানা যায় নাই। সেদিনও ইণ্ডিয়া অফিসের কর্ত্তা মিঃ আমেরী বলিয়াছেন, বাঙ্গালায় চাউলের অভাব নাই; লোকের ক্রয়শক্তি বাড়িয়া বেশী পরিমাণে খাইতেছে, জমা রাখিতেছে এবং চাষী বাজারে মাল ছাড়িতেছে না। তাহার পর কয়েকদিনের মধ্যে একেবারে সম্পূর্ণরূপে মত বদলাইয়াছে আমরা বিশ্বাস করি না।

(আশ্বিন ১৩৫০)

নতুন বড়লার্ট লর্ড ওয়াভেলের কলিকাতা সফর

গত ২৬শে অক্টোবর মঙ্গলবার ভারতের নতুন বড়লাট লেডি ওয়াভেলসহ কলিকাতায় আসেন এবং রাত্রে বাঙ্গালার গভর্নর স্যার থমাস রাদারফোর্ড সহ নগরীর বিভিন্ন আর্ত্ত কেন্দ্রে পরিদর্শনে বাহির হন। যথাক্রমে তিনি রাসবিহারী এভিন্যু, গড়িয়াহাটা মার্কেট, বালিগঞ্জ ষ্টেশন, ডায়মণ্ড হারবার, ইন্টালী-মার্কেট প্রভৃতির যে যে কেন্দ্রে কঙ্কালসার ভিক্ষুক শ্রেণী ভিড় করিয়া আছে, সর্ব্বত্রই মোটর হইতে অবতরণ করিয়া সর্ব্বহারাদের একটি বিস্তৃত চিত্র গ্রহণ করিবার জন্য টর্চের সাহায্যে ঘুরিয়া দেখেন। ভিক্ষুক শ্রেণীর মধ্যে তখন অধিকাংশই নিদ্রিত। কিন্তু তাহাদের বিধাতাপুরুষের চক্ষে হয়ত ঘুম ছিল না। আজ পর্য্যন্ত সরকারী দপ্তর হইতে বাংলার এই বৃহত্তর ভিক্ষুক শ্রেণীর কোনো প্রতিকারই সাধিত হয় নাই। এ যাত্রাও এই নির্ম্মম দৃশ্য দেখিবার পরেও বড়লাট-বাহাদুর যথার্থই ইহার আশু কোনো প্রতিকারের দিকে দৃষ্টি দিবেন কি না—তাহা তাঁহার এই আকস্মিক সফর হইতে কিছু একটা অনুমান করিয়া উঠা শক্ত।

(কার্ত্তিক ১৩৫০)

খাদ্যাভাবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে রোগ ও মহামারী

বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য আজ চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। যে দেশের বারো আনি অংশ ধানের ফসলে ভরিয়া যায়, বর্ত্তমান মহাসমরের কঠিন নির্ম্মমতায় আজ সেই বাংলার অধিবাসীদের এক মুষ্টি অন্ন জুটিতেছে না! ইতিমধ্যে বহুবার তাহার দৃষ্টির সামনে সরকারী ইস্তাহার আসিয়া হাজির হইয়াছে—'গ্রো মোর ফুড'। কিন্তু 'গ্রো' করিতে করিতে যখন বাঙ্গালার চাউল বাহিরে রপ্তানী হইতে আরম্ভ করিল, তখন একমাত্র অভিযোগ ও দাবী ভিন্ন বিষয়টার উপর বাঙ্গালীর আর হাত রহিল না! বাজারের চালু ব্যবসায়ে তথাপি যে স্বল্প সংখ্যক মহাজনীর হাতে চাউল ছিল, এক সময় প্রতিমণ আর চল্লিশ টাকাতেও মিলিল না। সম্প্রতি ঢাকা হইতে প্রতিদিন যে সমস্ত লোক কলিকাতায় আসিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ঢাকার সাধারণ বাজারে মণ প্রতি ৮৫্ টাকা করিয়াও চাউল পাওয়া দুঃসাধ্য ;এমনকি ইতিমধ্যে বহুক্ষেত্রে ১৫০্ টাকার উপরে দাম উঠিয়াছে। ফলে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে কলেরা ও মহামারীর যে বীভৎস প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, তাহা বর্ণনা ও চিন্তার বাহিরে। মফঃস্বল শহরের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ প্রায় একই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। ফলে অর্দ্ধেক ক্ষেত্রেই যাহারা পারিয়াছে, ভিখারী মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু 'হা হতোস্মি'। যে আশায় মানুষ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল, দেখিতে দেখিতে তাহাতেও বালি পড়িতে সুরু করিল। কলিকাতায় পর্য্যন্ত আজ চাউল মহার্ঘ্য তো বটেই, রীতিমত দুস্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। ধানের দেশের লোক আজ একেবারে নিরন্ন।

খাদ্যাভাবে প্রতিদিন যে কত সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার অতি সামান্যই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, এবং ততোধিক সামান্য স্বীকৃত হয় সরকারী দপ্তর কর্ত্তৃক। একমাত্র গত ১৮ই অক্টোবর হইতে ২১শে অক্টোবরের মধ্যে এ. পি ও ইউ. পি কর্তৃক বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের যে মৃত্যুব হার বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তাহাতে — (ক) গত ১৮ই ও ২০শে অক্টোবরের মধ্যে

মুন্সীগঞ্জ সহরে ১৩ জনের অনশনে মৃত্যু হইয়াছে। (খ) গত ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা সহরে ৬৮ জন কলেরায় অক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে ৫৭ জন মারা গিয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে আমাশয় রোগে ৯০ জন আক্রান্ত ও ৭০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির সাপ্তাহিক রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, গত ৩ সপ্তাহে অন্যান্য রোগে ৫৩৩ জন মারা গিয়াছে। (গ) ২১শে অক্টোবর কলিকাতা ও উপকণ্ঠের হাসপাতালসমূহে ৮৩ জন ক্ষুৎপীড়িত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং ২০৩ জনকে ভর্তি করা হইয়াছে। এবং উক্ত তারিখেই ক্যাম্বেল হাসপাতালে ২১ জন, বেহালা এ আর পি হাসপাতালে ৪৬ জন, লেক ক্লাব হাসপাতালে ৪ জন, কামারহাটি হাসপাতালে ৮ জন, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী হাসপাতালে ১ জন, উত্তরপাড়া সনৎকুমার হাসপাতালে ৩ জন ক্ষুৎপীড়িত মারা গিয়াছে।

এই বিজ্ঞপ্তি হইতে দেখা যায়—-মাত্র ১ সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে উল্লিখিত অঞ্চলসমূহেরই মৃত্যুহার ৮৩৯। অন্যান্য অঞ্চলসমূহও যে ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিমুক্ত তাহা নয়। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলসমূহ হইতে আমরা যে সংবাদ পাইতেছি, তাহা বর্ণনাতীত। গড়পড়তা হিসাবে তবেই দেখা যাইতেছে, শুধু দুই মুষ্টি অন্নের জন্য বাঙ্গালীর জীবন কিভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে! সরকারী দপ্তরে আবেদন নিবেদনের চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার ন্যায়দণ্ড শাসনদণ্ডরূপেই খাড়া রহিল, এতটুকু উৎসারিত প্রীতির সন্ধান পাওয়া গেল না।

(কার্তিক ১৩৫০)

বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর বিবৃতি

অনাহারে দুর্ভিক্ষে যখন বাংলার প্রাণ ওষ্ঠাগত, সাধারণের জীবনে যখন আর শেষ সম্বলটুকুও রহিল না, তখনও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞের কণ্ঠ হইতে তারস্বরে ঘোষিত হইল—বাংলার দুর্ভিক্ষ লইয়া বড় বেশী বাড়াবাড়ি শুরু হইয়াছে। অর্থাৎ ভাবখানা এই যে, দুর্ভিক্ষে অনশনে দিনের পর দিন বাঙ্গালী মরিয়া চলিলেও জাতীয় মুখপত্রগুলিতে তাহার বিন্দুমাত্র ছায়াপাত হওয়া তো কর্ত্তব্য নহেই, বরঞ্চ অবৈধ। দিল্লীর দরবারে যাইয়া পর্য্যন্ত তাই বিশেষজ্ঞ মহাশয় গাহিয়া আসিলেন—-বাংলার বাজারে চাউল মিলিতেছে না বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে , তাহা মিথ্যা। বরঞ্চ চাউল, আটা, ময়দা প্রভৃতি সবই ক্রমশঃ সুলভ হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ বিশেষজ্ঞ মহাশয়ের বক্তব্য যে কতখানি ভিত্তিহীন, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মহোদয়ের বিবৃতি তাহা জনসমাজের চোখের সম্মুখে একেবারে খুলিয়া ধরিয়াছে।

বিগত কিছুদিনের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জনপদ এবং সহর ও গ্রামাঞ্চলগুলি ঘুরিয়া অনাহারক্লিষ্ট পরিচর্য্যাহীন জনসাধারণের যে মুমূর্ষু অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে তিনি একটুও দ্বিধাবোধ করেন নাই। বিবৃতি প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—

"সর্বত্রই একটী অবিশ্বাস্য দুর্গতি দেখা যায়! সহর ও পল্লী অঞ্চল উভয়তঃই জনসাধারণের অনশন ব্যতীত গত্যন্তর নাই ;কিন্তু সহর অঞ্চল অপেক্ষা পল্লী অঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয়। গ্রামবাসীদের, বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের কষ্ট দেখিলে চোখে জল আসে। স্বামী কর্ত্তৃক পত্নী

ত্যাগ এবং পিতা মাতা কর্ত্তৃক সন্তান ত্যাগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ঢাকা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি কয়েক স্থানে দুঃস্থ নিবাস খোলা হইয়াছে। দুঃস্থদিগকে ঐ সমুদয় স্থানে আশ্রয় দেওয়া হয়। যে সমস্ত দুঃস্থ লোক পুষ্টির অভাবজনিত ম্যালেরিয়া, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের জন্য জরুরী হাসপাতালসমূহ খোলা হইয়াছে। তথাপি যেখানেই যাওয়া হউক না কেন, সেইখানেই মৃতদেহ এবং অনাহারে শীর্ণ লোক দেখা যায়। রাস্তার নিঃস্ব লোকদিগকে চলন্ত মৃতদেহের ন্যায় দেখায়। তাহারা যদি বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তবে উহা অলৌকিক ব্যাপার হইবে। দুঃস্থ নিবাসসমূহে ও জরুরী হাসপাতালসমূহে যাহাদিগকে রাখা হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। মিঃ আমেরী কমন্সসভায় একাধিকবার বলিয়াছেন যে, অনশনের ফলে প্রতি সপ্তাহে মাত্র এক হাজার লোকের মৃত্যু হইতেছে। আমি অসঙ্কোচে ইহা বলিতে পারি যে, এই ধরণের বিবৃতি বৃটিশ জনসাধারণের নিকট প্রকৃত তথ্য গোপনের একটী প্রচেষ্টা মাত্র। আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি দৃঢ়তার সহিত ইহা বলিতে পারি যে, খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। একটী বড় মহকুমায় আমাকে বলা হয় যে, কেবলমাত্র অনশনের ফলে প্রতি সপ্তাহে ৭৫০ হইতে ১ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, শীতাগমনে শীতবস্ত্রের অভাবে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। সহরগুলিতে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। চাঁদপুর ও মুন্সীগঞ্জের অবস্থা দেখিয়া কাঁথির ভয়াবহ অবস্থাই আমার স্মরণ হইল। আমি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে চাহি না ;কিন্তু স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা যদি অসঙ্কোচে না বলি, তাহা হইলে বাংলা তথা দেশের প্রতি আমার কর্ত্তব্যহানি হইবে। আমি বাংলায় না আসা পর্যন্ত মনে করিতাম যে, বাংলা গভর্ণমেন্টের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীগণ আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি র জন্য দুর্গতি অতিরঞ্জিত করিয়া গভর্ণমেন্টকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিতেছেন। কিন্তু এখন আমার নিশ্চি ত বিশ্বাস, বাংলার জনহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ নগ্ন সত্যই প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রকৃত অবস্থা ভারতীয় এবং বৃটিশ জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া বাংলার হিতসাধন করিয়াছেন।"

সুতরাং এই অতি বড় সহজ কথাটা অনায়াসেই প্রণিধানযোগ্য যে, পণ্ডিতজীর ন্যায় একজন অবাঙ্গালী জননায়ক পর্য্যন্ত যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার মুমূর্ষু চিত্র জননায়ক তথা বৃটিশ নেতৃবর্গের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে এতটুকুও কুণ্ঠা বা শঙ্কা বোধ করিলেন না, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কোন বিশেষজ্ঞ মহোদয়ের অমন ধৈর্য্যশীল গলাবাজি যে এক রকম মাঠে মারা গেল, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

(কার্তিক ১৩৫০)

কলিকাতায় মৃত্যুর হার

কলিকাতায় দুই সপ্তাহে, অর্থাৎ নভেম্বর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে ৩৮৩৫ জন লোক না খাইতে পাইয়া মারা গিয়াছে, পুলিশ রাস্তা হইতে ১ হাজার ১ শত ১৩টী মৃতদেহ অপসারণ করিয়াছে। বিভিন্ন হাসপাতালে ১ হাজার ১৪ জন মারা গিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের রিপোর্টে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৮৩৫ জন।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

ছয় কোটী টাকা ঘুষ

অঙ্কটী খুবই ছোট! স্যার জিয়াউদ্দীন আমেদ দিল্লীর আইনসভায় বলিয়াছেন, তিনি ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন যে, কোন অঞ্চলে তাহাদিগকে উৎকোচ প্রদানের জন্য প্রায় ছয় কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

* * *

মিঃ নিউম্যান দিল্লীর আইনসভায় বলিয়াছেন যে, এই দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্ট। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, সরকার নিজের প্রয়োজনে চোরাবাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছেন।

* * *

সৈয়দ মুর্ত্তাজা সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহার এই ৮৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থার মতন অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন নাই বা শুনেন নাই।

তিনি আরও বলেন, বাঙ্গালাকে খাদ্যশস্য সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, বাঙ্গালা মাত্র তাহার এক দশমাংশ পাইয়াছে।

* * *

মিঃ দেশমুখ বলিয়াছেন, এই দুর্ভিক্ষ অবস্থা কর্তারা সৃষ্টি করিয়াছেন।

* * *

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ১৫ই নভেম্বর দিল্লীর আইনসভায় বলিয়াছেন বাঙ্গলার শত শত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ইউরোপীয় মালিকগণ অবৈধভাবে খাদ্যশস্য মজুত করিয়াছে, বাঙ্গালার ঘাটতির জন্য তাহারাই দায়ী। তাহারা খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য উন্মত্তের ন্যায় ছোটাছুটি করিয়াছিলেন।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

দায়ী কে?

দিল্লীর উচ্চ পরিষদে ভারতীয় সদস্যগণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, বাঙ্গালাব এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের জন্য তদন্ত করা হৌক— কে দায়ী? কোন কোন সদস্য একথাও বলিয়াছেন যে, লর্ড লিনলিথগো, মিঃ আমেরী এবং বাঙ্গালার গভর্ণর স্যার জন হার্ব্বার্টকে দায়ী করিয়া অভিযুক্ত করা হৌক। সদস্যগণের এই প্রস্তাবের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার এই লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্য দায়ী কে— তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে! দেশের সকল শ্রেণীর লোকই এই কথা বলিয়া আসিয়াছে যে, এই দুর্ভিক্ষ মনুষ্য সৃষ্ট। সরকারী এজেন্টগণ বেপরোয়াভাবে সরকারী প্রশ্রয় পাইয়া ধান, চাউল ও গমের দর বাড়াইয়া দিয়াছিল এবং তাহাদের দেখাদেখি দেশীয় মহাজনও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াই বেশী মূল্য-দিয়া ধান, চাউল আটক করে। তারপর সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে বলে সরকারী কর্ম্মচারীগণও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে চাউল, ধানের ব্যাপারে টাকা রোজগার করিয়াছে ; যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলেও তাহারা দায়ী ;ইহা ব্যতীত কলকাতাস্থ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ যুদ্ধের অছিলায় ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য ধান চাউলের মূল্য বাড়াইয়া তাহা খরিদ করিয়া বসিয়াছে। দেশ যদি পরাধীন না হইত, তাহা হইলে উহার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ আদায় হইত!

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

মজুতকারী কাহারা?

এ প্রশ্ন সরকার তুলিয়াছেন এবং দেশের লোকও তুলিয়াছে। সরকার, কৃষক মহাজন ও দেশীয় ব্যবসায়ীগণকে দোষ দিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালার জনসাধারণ বলে, মজুতকারী সরকার অর্থাৎ সরকারের এজেন্টগণ এবং বাঙ্গালার ইউরোপীয় বণিকগণ এবং তাহারাই "মুনাফাখোর"। নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করিলে সরকারী এজেন্টদের গুদাম হইতে এবং ইউরোপীয় মহাজনদের গুদাম হইতে এখনও লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ও গম বাহির হইবে। যখন সমস্ত বঙ্গদেশের লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে, তখন সরকারী এজেন্টগণ ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ বিশগুণ মূল্যে চাউল ও গম বিক্রয় করিয়াছে, এবং কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়াছে।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

ভিখারী অপসারণ

খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘ্যতা দেখা দিয়াছে একদিনে নয়। কিন্তু চব্বিশ টাকা দরে চাউল উঠিতেই এবং তদনুপাতে অন্যান্য প্রাণধারণোপযোগী খাদ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্য দেখা দিতেই দেখিতে দেখিতে কলিকাতার রাজপথ অনাথা দুঃস্থ সর্ব্বহারাদের ভিড়ে ভরিয়া উঠিল। ইহাদের সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক। প্রতিদিন ভোর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের করুণ চিৎকার ও বিচ্ছিন্ন মৃত্যু নাগরিকবৃন্দকে শোকাপ্লুত করিয়া তুলিয়াছে। অথচ দীর্ঘকালের মধ্যেও সরকারী পক্ষ হইতে ইহার কিছু একটা পথ বা মীমাংসা করা হয় নাই।

এই অবস্থায় যখন কলিকাতার রাজপথ ক্রমাগত শ্মশান হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং এমন কি মহানুভব "স্টেটসম্যান" পত্রিকা পর্য্যন্ত সেই সব দুঃস্থ নরকঙ্কাল ও তাহাদের মৃত্যু দৃশ্যগুলি অনবরত চিত্রে প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এমন সময় সম্ভবতঃ প্রেরণার চাপে পড়িয়াই বাঙ্গালা সরকার ভিখারী অপসারণে উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে অধিকাংশ ভিখারীই অপসারিত হইয়া গেল। কিন্তু কে কোথায় গেল, তাহার ঠিক রহিল না. নিশীথের আড়ালে যখন তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক দলে দলে লরি বোঝাই করিয়া সহরের বহুদুরে লইয়া যাওয়া শুরু হইল, তখন মা ও ছেলে ভাগ হইয়া গেল, স্বামী আর স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল! তবু তাহারা গেল বটে, অর্থাৎ তাহাদিগকে অপসারণ করা হইল। এই বীভৎসতা আরও যে কত করুণ ও কি মর্ম্মন্তুদ তাহা প্রকাশের নয়।

সম্প্রতি এই দোষ ঢাকিতে যাইয়া বাঙ্গালা সরকার এক প্রেস নোট বাহির করিয়াছেন। তাহাতে ভিখারী অপসারণ সম্বন্ধীয় নানা কথার অবতারণা করিয়া বলা হইয়াছে যে—প্রধান প্রধান সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শক্রমে গভর্নমেন্ট নিরাশ্রয়দিগকে স্ব স্ব গ্রামে পাঠাইবার পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। নিরাশ্রয়দিগের নিজেদের এবং কলিকাতার নাগরিকগণের স্বার্থে সামান্য বল প্রয়োগ ভিন্ন গভর্নমেন্টের উপায়ন্তর নাই। চিকিৎসক যেমন রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে রোগ প্রতিষেধক ইনজেকসন্ লইতে বাধ্য করেন, গভর্নমেন্টেরও তেমনি নিরাশ্রয়দিগকে অপসারণের জন্য তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে নৈতিক অধিকার আছে। গভর্নমেন্ট লক্ষ্য করিয়াছেন যে, নিরাশ্রয়দিগের মধ্যে গুজব রটাইয়া এবং গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের মনে সন্দেহ

এবং অবিশ্বাস জন্মাইয়া দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাইতে সম্মত করার সরকারী নীতি ব্যর্থ করিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতা সহরের রাস্তাগুলি নিরাশ্রয়দিগের দ্বারা পরিপূর্ণ রাখিবার সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্য লইয়া এই আন্দোলন চালান হইয়াছে। কারণ, এই অবস্থার সুযোগ লইয়া রাজনৈতিক এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধন করাই তাহাদের লক্ষ্য। অমৃত বাক্যস্রোত বটে। Guilty mind is always suspicious.

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষে বাংলার ন্যূনতম ক্ষতি

গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে নারী সেবা-সঙ্ঘের এক হস্তশিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে এক আলোচনা সভায় বর্ত্তমান বাংলার যে ভয়াবহ চিত্র উদঘাটিত হইয়াছে, তাহার দিকে দেশবাসী এবং বিশেষ করিয়া প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায় : বাংলার মোট ৬০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষ পরিবারই গতবারের দুর্ভিক্ষের ফলে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩৫ লক্ষ নরনারী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আবার উপার্জ্জনক্ষম পুরুষের সংখ্যাই অধিক। প্রায় ৬ লক্ষ চাষী, ১৫ লক্ষ তাঁতী ও অন্যান্য গ্রাম্য শিল্পোপজীবী, ৪ লক্ষ জেলে, ২৭ লক্ষ চাষী মজুর—অর্থাৎ প্রায় ৬০ লক্ষ নরনারী ও শিশু দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশের মোট ১ কোটি ঘরবাড়ীর মধ্যে ১০ লক্ষেরও অধিক ঘরবাড়ীর এইরূপ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে যে, সেগুলি সম্পূর্ণই সংস্কার করিবার বাহিরে, এবং ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ লোকের এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পর্য্যন্ত নাই। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৩ কোটি লোক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। তন্মধ্যে ১২/১৩ লক্ষ লোক অচল ও পঙ্গু। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে গভর্নমেন্ট বাংলাকে বাঁচাইতে পারেন নাই। এখনও বাংলার চারিপাশে দুর্ভিক্ষের ছায়া প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিতেছে। গভর্নমেন্টের কর্ম্মতৎপরতা তজ্জন্য কতদূর ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে তাহার নির্দ্দেশ দেশবাসীর পাওয়া আবশ্যক।

(মাঘ ১৩৫১)

অরণি

চাউল

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে এই আতঙ্কজনক সংবাদ দেওয়া হইল যে, বাংলায় ১৯৪২-৪৩এ গড়পড়তা হিসাবে মোট ৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, এই প্রদেশে বাৎসরিক প্রয়োজন ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮ শত টন। এই বিপুল ঘাটতির সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র সহরে চাউলের দাম দেখিতে দেখিতে মণ করা ৭/৮ টাকা বেশী হইয়া ২০/২২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। মফঃস্বলেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। উৎপন্ন ও মজুত ধান চাউলের এইসব সরকারী বরাদ্দের হিসাবের উপর আমাদের বিশেষ কোন আস্থা নাই। যে সকল উপায়ে এবং যে সকল ব্যক্তির দ্বারা গতানুগতিকভাবে এই সকল তথ্য সংগৃহীত হয় সে সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল। তবে দুঃখের বিষয়, শিথিলভাবে সংগৃহীত এই সকল তথ্য লাভের ব্যাপারীদিগকে প্ররোচিত করে এবং তাহারাই বাজার দরকে অস্বাভাবিক করিয়া তোলে। বাঙ্গলায় চাউলের অভাব আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অল্প দিনের ব্যবধানে এত বেশী মূল্যবৃদ্ধি অত্যন্ত সন্দেহজনক। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কি মন্ত্রিমণ্ডলী কি স্থায়ী শাসকগণ যে ঔদাসীন্য ও অক্ষমতা দেখাইয়া আসিয়াছেন তাহাতে চোরাবাজার ফাঁপিয়া উঠিবেই। গম, আটা, ময়দা, ডাল, কাপড়, ঔষধ সর্ব্বত্রই চোরাবাজারের অবাধ রাজত্ব। তাহার মধ্যে একক চাউল স্বাধীনভাবে বাজারে বিচরণ করিবে, ইহা হইতেই পারে না। কাজেই লোভীদের দৃষ্টি ইহার উপর ভালোভাবেই পড়িয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল আলোচনা চলিতেছে। ব্যবস্থা পরিষদেও আলোচনা হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রিমণ্ডলের সদাসমর্থক য়ুরোপীয় দলের নেতা মিঃ রস্ পর্য্যন্ত মন্ত্রিমণ্ডলের অক্ষমতার জন্য ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। বাণিজ্য ও শ্রমিক মন্ত্রী নবাব হবিবুল্লা সাহেব বাঙ্গলার খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা গোলে হরিবোল দিয়া উপস্থিত দায়িত্ব এড়াইবার কৌশল মাত্র। কতটুকু ব্যবস্থা ভারত সরকার করিবেন, আর কতটুকুই বা প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট করিবেন সুযোগ্য মন্ত্রী মহাশয় তাহা এখনও ঠাওর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই অবস্থা দেখিয়া 'স্টেটসম্যান' পর্য্যন্ত সরকারী ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। চোরাবাজারের ব্যাপারী এবং জোতদার শ্রেণীর মজুতকারীদের উপর দোষ চাপাইয়া উপস্থিত দায়িত্বের কোন মীমাংসা হইবে না। একথা মনে রাখিতে হইবে। ভারত রক্ষা বিধানে জনসাধারণ নিরুপায় ও অসহায়। তাহারা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন বে-সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে তাহার সুযোগ ও অবসর অতি সঙ্কীর্ণ। আসাম ও বাংলার সীমান্তের জেলাগুলিতে

ধান চাউল আদানপ্রদানের স্বাভাবিক পথ যেরূপ নির্ব্বোধ উপায়ে বন্ধ করা হইয়াছে তাহার কোন প্রতিবিধান হয় নাই। বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট দীর্ঘকাল হইল চাউলের বাজারের প্রধান খরিদ্দার। ঢাকার নবাব বলেন যে, গভর্নমেন্ট তাঁহাদের মজুত ধান ও চাউল কলিকাতা ও অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলে রাখিবেন এবং আবশ্যক হইলেই তাহা বাজারে ছাড়িবেন। এই সকল অনির্দ্দিষ্ট ও অস্পষ্ট আশ্বাস যে কত মূল্যহীন তাহা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে জনসাধারণ সহজেই বুঝিতে পারে। নোট প্রচলনের আধিক্য, সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটি ও অন্যান্য কারণে বাংলার খাদ্য সমস্যা যেভাবে জটিল হইয়া উঠিতেছে অবিলম্বে তাহার প্রতিকার না হইলে আগামী বর্ষাকালের পূর্ব্বেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা দিবে। ধামাচাপা না দিয়া সরকারী ও বেসরকারী মিলিত চেষ্টায় এই কঠোর সত্যের সম্মুখীন হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রহ্মদেশ হইতে যে চাউল বাংলার ঘাটতি পূরণ করিত তাহার আশা এখন ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কেননা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল, ব্রহ্ম অভিযানের এখন আর কোন সুরাহা হইবে না। কিন্তু আমাদের আরও আশঙ্কা এই যে, বাঙ্গলার শিয়রে দণ্ডায়মান জাপান এই খাদ্য সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিতে পারে। আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়াও এ সম্পর্কে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করিবার সময় আসিয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী যে সাহস ও দক্ষতার সহিত এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন সে সম্বন্ধে আমরা প্রায় হতাশ হইয়াছি। সম্ভবতঃ বাংলার শাসক সম্প্রদায়ও ইঁহাদের যোগ্যতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। বিরামহীন, আপোষহীন সংগ্রামের ভূতপূর্ব সিপাহী মিঃ সন্তোষ বসু অস্বীকার করিলেও প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট কর্ম্মচারী নিয়োগে মন্ত্রীদের মত লওয়া হয় নাই। সে যাহা হউক, মন্ত্রীরা ছাড়াও বাঙ্গলাদেশে যোগ্য লোকের অভাব নাই। খাদ্য সমস্যা সমাধানে গভর্নরের কর্ত্তব্য অবিলম্বে জেলা ও মহকুমার শাখা-প্রশাখা সমন্বিত একটি প্রাদেশিক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান খোলা এবং সেই প্রতিষ্ঠান মারফৎ খাদ্য সরবরাহ, বিক্রয় ও বন্টনের ব্যবস্থা করা। বে-সরকারী সহযোগিতা ব্যতীত এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিবে।

(২৮ ফাল্গুন ১৩৪৯)

সাময়িকী

বাঙ্গলায় প্রচুর চাউল আছে, আসিয়াছে এবং আসিতেছে—এই শ্রেণীর সরকারী আশ্বাস সত্ত্বেও বাঙ্গলার সহর ও পল্লী হইতে চাউলের অগ্নিমূল্য এবং সংগ্রহের অসুবিধার অনেক উদ্বেগজনক সংবাদ আসিতেছে। এই অবস্থার জন্য কেবল গোপন মজুতদার বা অসাধু ব্যবসায়ীরাই দায়ী নহে, গত এক বৎসরের সরকারী নীতিও দায়ী। গভর্নমেন্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচুর চাউল কিনিয়াছেন এবং অন্তর্বাণিজ্যের চলাচল কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ করিয়াছেন ; তাহার প্রতিক্রিয়া বর্ত্তমান সঙ্কটের জন্য বহুলাংশে দায়ী। সম্ভবতঃ ইহা বুঝিতে পারিয়া গভর্নমেন্ট তাঁহাদের অযৌক্তিক বিধিনিষেধ শিথিল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, গত জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলাদেশে ধান চাউল আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল, তাহার কড়াকড়ি হ্রাস করা হইবে। এখন হইতে বাঙ্গলাকে তিনটি ব্যবসায়ী অঞ্চলে ভাগ করা হইবেঃ (১) উত্তরবঙ্গ (রাজসাহী বিভাগ), (২) পূর্ব্ববঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ), (৩) প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান

বিভাগ। দার্জিলিং ও চট্টগ্রাম জিলা এবং কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল হইতে বিনা লাইসেন্সে ধান চাউল অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যাইবে না। তাহা ছাড়া ঐ সকল অঞ্চলে আমদানী রপ্তানীর উপর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না। তবে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে ২০ মণের বেশী শস্য রপ্তানী করিতে হইলে খাদ্যশস্য ক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট অনুমতি লইতে হইবে। এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ফলে কিছু সুবিধা হইবে বটে ; কিন্তু বন্টনব্যবস্থা ও সরবরাহ ব্যবস্থা একটা ব্যাপক পরিকল্পনার মধ্যে আনাইয়া পারিবারিক প্রয়োজনরূপ প্রত্যেক ক্রেতাকে ন্যায্য মূল্যে চাউল ক্রয়ের সুবিধা করিয়া না দিতে পারিলে চোরা বাজারের অসাধু ব্যাপারীদের শায়েস্তা করা যাইবে না।

(২৬ চৈত্র ১৩৪৯)

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ও খাদ্যমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর যথেষ্ট উদ্যম সত্ত্বেও সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। সরকারী পরিকল্পনার সমালোচনা আমরা সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রে দেখিতেছি। এই সঙ্কটের জন্য মুনাফালোভী মজুতদারেরা যে প্রধানতঃ দায়ী এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই এবং ইহাদের বিরুদ্ধে সরকারী ও বেসরকারী অনেক সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু বালিডাঙ্গা ও হাওড়ার মজুতদারদিগের বাদ দিয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র মজুতদারদিগকে গোপন শস্য বাহির করিতে বাধ্য করার যে কারণ দেখানো হইয়াছে তাহা অনেকেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। কেহ মনে করেন কলিকাতার প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের গভর্ণমেণ্ট সমীহ করিয়া চলিতেছেন। কলিকাতা ও হাওড়ায় বহু খাদ্যশস্য মজুত আছে। এগুলি বাহির করিতে বাধ্য করা উচিত। রাঘব বোয়ালের গায়ে হাত না দিয়া চুনোপুঁটি মারিবার চেষ্টা জনসাধারণের মনে বিশ্বাস ও আশার সঞ্চার করিবে না। মিঃ সুরাবর্দ্দী আশ্বাস দিয়াছেন যে কলিকাতার জন্য এক স্বতন্ত্র অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া বড় বড় ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিকদিগকে তাহাদের মালের হিসাব দাখিল করিতে বাধ্য করা হইবে। আমরা ভরসা করি, এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অযথা বিলম্ব হইবে না।

(২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)

কলিকাতা শহরের অবস্থা চারিদিক হইতে সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার জানাইয়াছেন যে কলিকাতায় কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। তাঁহার মতে পানীয় জলে কোন দোষ ঘটে নাই ; শহরে অত্যধিক জনসমাগমের ফলেই সম্ভবতঃ এই রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রোগের অপরাধ নাই। একে ত সহরের ভিক্ষুক শ্রেণী রহিয়াছে। তাহার উপর জঠরানলে উত্তপ্ত হইয়া শত শত নরনারী মফঃস্বল হইতে সহরের রাজপথে আসিয়া সেই শ্রেণী বৃদ্ধি করিয়াছে। পথের শ্মশানে পড়িয়া সেই সকল অসহায় বুভুক্ষিত নরনারী সভ্য সমাজের উদ্বৃত্ত পচা আবর্জনার মধ্যে মহামূল্য খাদ্যের কণা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং চোখ মুখ বুজিয়া তাহারা অনেক কিছুই উদরাসাৎ করিতেছে। অথচ এই সব আবর্জ্জনা শীঘ্র অপসারিত করিবার উপায় নাই। কর্পোরেশনের মেয়র অসহায়ভাবে বলিয়াছেন যে, যথাযথ পেট্রোলের অভাবে একবেলা অপসারণের কাজ বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। যেখানে ১৮ হাজার গ্যালনের প্রয়োজন সেখানে সহরে অধিবাসী বৃদ্ধি হইবার পরেও ১০ হাজার গ্যালনের বেশী পেট্রোল দিতে গভর্ণমেন্ট অস্বীকার করিয়াছেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য পেট্রোলের প্রয়োজনকে আমরা অস্বীকার করি না এবং তাহার সকল ব্যবস্থাই হইতেছে।

কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব পালনে গভর্নমেন্ট কতখানি অগ্রণী হইয়াছেন, তাহাও জানিবার প্রয়োজন।

(২৪ আষাঢ় ১৩৫০)

দুর্ভিক্ষ ও বন্যা ছাড়া বাঙ্গালীর মুখে আর কোন কথা নাই, মনে কোন চিন্তা নাই। কলিকাতার রাজপথে ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর মৃতদেহ—চট্টগ্রাম, নোয়াখালিতে ক্ষুধার তাড়নায় উন্মাদিনী নারী দেহ বিক্রয় করিতে অগ্রসর, ময়মনসিংহের শত শত সর্ব্বস্বান্ত কৃষক স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া গোয়ালপাড়া ধুবড়ীতে অন্নের হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে. দামোদরের দুর্দ্দম বন্যাস্রোতে শত শত পরিবার গৃহহারা—এমন সময়ে সংবাদ আসিয়াছে পাঞ্জাবের চাউলের ব্যাপারী সঙ্ঘ জানাইতেছেন, ২২ লক্ষ মণ বিভিন্ন শ্রেণীর চাউল মজুত আছে, তাহা অন্য প্রদেশে রপ্তানী করা যাইতে পারে। সংবাদটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ও বাঙ্গলা সরকারের কর্ণগোচর হইয়াছে। এই চাউল বাঙ্গালায় আনিবার জন্য কোন ব্যবস্থা হইবে কি?

(২৭ শ্রাবণ ১৩৫০)

কলিকাতা বন্দর হইতে বহু পরিমাণ চাউল দক্ষিণ আফ্রিকায় চালান দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহার প্রতিবাদ করিয়া বিভিন্ন ভারতীয় বণিক সঙ্ঘ ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট তার প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারত হইতে চাউল বাহিরে পাঠান হইবে না এই আশ্বাস ভারত গভর্নমেণ্ট দিয়াছিলেন। এই গুপ্ত চালানী কারবার কাহার স্বার্থে কাহার দ্বারা হইতেছে তাহা আমরা জানি না। তবে সরকার ব্যাপারটী ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন যে সামান্য কয়েক হাজার মণ চাউল দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠান হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা কেবলমাত্র ভারতীয় নাবিকদের জন্য। ভারতীয় নাবিকদের প্রতি এই সরকারী দরদ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায় খাদ্যের কোন ঘাটতি নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে আগত বিদেশী সৈন্যেরা স্ব স্ব দেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া খাইতেছে না। তাহা হইলে ভারতীয় নাবিকদের বেলায় এরূপ ব্যবস্থার কারণ কি? পাঞ্জাবের চাউল গম বাঙ্গলায় আসিতে পারিতেছে না অথচ বাঙ্গলার চাউল কলিকাতা বন্দর হইতে স্বচ্ছন্দে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় অবাধে চলিয়া যাইতেছে। এ দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপূর্ব সৃষ্টি।

(৩ ভাদ্র ১৩৫০)

বাঙ্গলার খাদ্য-সমস্যা

বাঙ্গলায় খাদ্য সঙ্কট আকস্মিকভাবে দেখা দেয় নাই। জাপান আসাম-বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় মানুষকে বঞ্চনা করিবার নীতির অনুসরণ করিয়া যখন গভর্নমেন্ট দালাল ও উপদালাল মারফৎ বাঙ্গলার কয়েকটি জিলা হইতে প্রচুর ধান-চাউল খরিদ করিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং খাদ্যশস্যের অব্যাধ চলাচলের পথ বন্ধ করিলেন, তাহার পর হইতে চাউল, চিনি, আটা, ডাউল প্রভৃতির মূল্য বাড়িতে লাগিল এবং কোন কোন অঞ্চলে কতকগুলি জিনিস একেবারেই অদৃশ্য হইল। এক বৎসরে সরকারী সরবরাহ-বিভাগের পরামর্শে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও

বন্টন ব্যবস্থা বারম্বার নানাভাবে প্রয়োগ করিয়াও গভর্ণমেন্ট প্রতিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে সরবরাহ-বিভাগটাই ঢালিয়া সাজান হইল। এক ডজন সিভিলিয়ান আসিলেন, আরও অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল,—মুনাফা শিকারীদের ভীতি প্রদর্শন, মজুতদারদের শায়েস্তা করিবার হুমকী, নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বিক্রয়ের দোকান খোলা প্রভৃতি, কিছুতেই জনসাধারণের দুর্গতি দূর হইল না। হক্-মন্ত্রিমণ্ডল খেদ করিয়া বলিলেন, তাঁহাদের পরামর্শ না লইয়া গভর্নর তাঁহাদের ইচ্ছামত কাজ করিতেছেন। অবশেষে বঙ্গীয় আইনসভায়ও মুসলীম লীগ দল খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য হক-মন্ত্রিমণ্ডলীকেই দায়ী করিয়া তীব্র ভাষায় আলোচনা করিলেন। মেষ পালক ও নেকড়ে বাঘের অভিনয় আমরা দেখিলাম। হকসাহেব রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইলেন।

গভর্নরের বহু প্রার্থিত ও আস্থাভাজন স্যর নাজীম নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলেন। মিঃ সুরাবর্দ্দী নূতন খাদ্য মন্ত্রী হইয়া ঘোষণা করিলেন, কিছু সময় পাইলেই আমরা সমস্যা সমাধান করিয়া ফেলিব। হকসাহেব বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতায় বিভাগীয় কেলেঙ্কারী ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। মিঃ সুরাবর্দ্দী পরোক্ষভাবে ঐগুলির উত্তর দিতে গিয়া বলিলেন—সহরে ও মফঃস্বলে নিদারুণ খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আমরা সচেতন। তাঁহার মতে বাঙ্গলায় যে খাদ্য মজুত আছে তাহাতে এত অধিক মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ নাই। আমরা মূল্য কমাইবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিব এবং মজুতদারদের গুপ্ত গোলার দ্বার খুলিব। গোপন মজুতদারদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনটাও অত্যন্ত পুরাতন ও একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। লোভী ব্যবসায়ীদের প্রচুর দোষ আছে, কিন্তু একমাত্র তাহারাই দায়ী নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। গভর্নর নূতন অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া কলিকাতা ও বঙ্গদেশের একশ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে গোপন বা বিধিসঙ্গতভাবে মজুত খাদ্য শস্য অনুসন্ধান করিবার ভার দিয়াছেন। ইঁহারা যে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন, মজুত মাল, খাতাপত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করিবেন। এই অর্ডিন্যান্স নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীর মুনাফাখোর মজুতদার ফাটকা বাজারের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান। গত শনিবার প্রভাতে খাদ্য মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী এক সাংবাদিক সভায় বলিয়াছেন—"যদিও বাড়তি খাদ্য নাই, তবে প্রয়োজন মত শস্যের অভাব নাই।" সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই। তবে শীঘ্রই তিনি দেখাইতে সক্ষম হইবেন যে, প্রয়োজন মত খাদ্যদ্রব্য বাঙ্গলায় রহিয়াছে এবং শীঘ্রই সমগ্র অঞ্চলে সমানভাবে বন্টনের ব্যবস্থা হইবে। খাদ্য সমস্যার এই দিকটার উপর আরও অধিক জোর দেওয়া উচিত ছিল। সরবরাহ বিভাগের অদূরদর্শিতা রেলওয়ে ব্যবস্থার সহিত যোগাযোগের অভাবেই বাঙ্গলা দেশের এই দুর্দ্দশা। খাদ্য মন্ত্রী আরও আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভারত-গভর্নমেন্ট নিয়মিতভাবে আটা ও চাউল বাঙ্গলার জন্য সরবরাহ করিতেছেন। বর্ত্তমান মাসের ১৪ লক্ষ মণ চাউল, ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার মণ গম এবং ৬ লক্ষ ৫২ হাজার মণ [অন্যান্য] খাদ্যশস্য বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট পাইয়াছেন! বাঙ্গলা সরকার গত বৎসর তাঁহাদের দালাল দিয়া যে চাউল কিনিয়াছিলেন এবং যাহা নিয়মিতভাবে ভারত সরকারের নিকট পাইতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই গোপন মজুতদারদের গোলায় যায় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গত দুই মাসে পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় ৩৫ হইতে ৪০ টাকা মণে চাউল বিক্রয় হইতেছে কেন? ইহা হইতেই বুঝা যায় লোভী ব্যবসায়ীর লোভ ছাড়াও সরকারী বন্টনব্যবস্থার মধ্যে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। গত চার বৎসরে ভারতের রেলওয়ে ব্যবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই ; বরঞ্চ অনেক দিকে

অবনতি হইয়াছে। সামরিক সরবরাহের দোহাই দিয়া ঘটা করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া রেল-বিভাগের অকর্ম্মণ্যতা ঢাকিবার চেষ্টা বড় বেশী হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। নদীবহুল পূর্ববঙ্গে ষ্টীমারের সংখ্যা এবং নৌকার সংখ্যা কমিয়া যসাওয়ায় সঙ্কট ঘনীভূত হইয়াছে। মিঃ সুরাবর্দ্দী সরকারী ব্যবস্থার এই দিককার ত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইয়াছেন কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে গেলে এদিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৩০ বৈশাখ ১৩৫০)

বাঙ্গলার খাদ্য-সমস্যা

বাঙ্গলার খাদ্যসমস্যা দিনে দিনে তীব্রতর হইয়া এখন এক শোচনীয় সঙ্কটে পরিণতি লাভ করিতে চলিয়াছে। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী প্রথমাবধি গোপন মজুতদারদের সতর্ক করিয়া ঘন ঘন বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন ; কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী সর্বপ্রকার সতর্কবাণী ও হুমকী অগ্রাহ্য করিয়া চাউলের মূল্য নির্ব্বিবাদে বাড়াইয়া চলিয়াছে। কলিকাতায় কন্ট্রোলের দোকান হইতে বহু লোককে প্রত্যহ রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইতেছে। মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী প্রথমে এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন— বাংলাদেশে চাউলের এখন অভাব হয় নাই যাহার জন্য এই অস্বাভাবিক দুর্ম্মূল্যে বাজারে চাউল বিক্রয় হইতে পারে ; এই অযৌক্তিক দুর্ম্মূল্যতার জন্য দায়ী চোরাবাজারের ব্যবসায়ী গোপন মজুতদারদের ষড়যন্ত্র। এ কুচক্রী ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন। সম্প্রতি মিঃ সুরাবর্দ্দীই আবার জনসাধারণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"চাউলের খরচ কমান, এবং চাউলের পরিবর্ত্তে অপর কোন জিনিষ ব্যবহার করুন।....ইহার কারণ এই নয় যে বাংলায় পর্য্যাপ্ত চাউল নাই, পরন্তু বাজারে ছাড়িবার মত যথেষ্ট চাউল নাই, এবং চাউলের মূল্য এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে উহা দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয় শক্তির মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে।" বাংলায় পর্য্যাপ্ত চাউল আছে, অথচ বাজারে ছাড়িবার মত যথেষ্ট চাউল নাই—এই স্ববিরোধী উক্তির অর্থ বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। চাউল থাকা সত্ত্বেও চাউলের দুষ্প্রাপ্যতার কারণ ইহাই যে, চাউল গোপন মজুতদারদের চোরা বাজারে আটক পড়িয়া আছে এবং সেই অদৃশ্য গুদাম হইতে চাউল বাহির করিবার মত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা বাংলা গভর্নমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে পারে নাই ; আর নিজেদের এই নিরুপায় অক্ষমতা প্রকারান্তরে অস্বীকার করিবার জন্য তাঁহারা আজ জনসাধারণকে চাউলের খরচ কমাইতে নির্দ্দেশ দিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলার জনসাধারণের একমাত্র জীবিকা চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা লাঘব করিবার জন্য চাউলের খরচ কমাইবার উপদেশ দিবার অর্থ দরিদ্র জনসাধারণকে উপবাসী থাকিতে পরামর্শ দেওয়া। চাউলের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু ব্যবহার করিতে হইলে সেই জিনিষটির সরবরাহের ব্যবস্থাও মন্ত্রিমণ্ডলীকেই করিতে হইবে। হিন্দু জনগণকে আশু সাহায্য দানের ব্যবস্থা অবিলম্বেই করা উচিত। শুধু পরিবর্ত্ত জিনিষের নাম বলিয়া এবং তাহার দর বাঁধিয়া দিলেই চলিবে না। জনসাধারণের হাতে সেই জিনিষ পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থাও মন্ত্রিমণ্ডলকেই করিতে হইবে। কারণ দেখা গিয়াছে যে, বাঁধা দরে চাউল পাইবার বিধান থাকিলেও জনসাধারণ তাহা পায় না। বাঙ্গলাদেশে কি পরিমাণ চাউল মজুত আছে সে সম্বন্ধে বাঙ্গলা গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে অদ্যাবধি সঠিক কোন হিসাব প্রকাশিত হয় নাই। এক-এক

সময় এক-এক প্রকার হিসাব বাহির হইতেছে। আসল কথা হইতেছে ইহাই যে, বাঙ্গলাদেশে মজুত চাউলের পরিমাণ গভর্নমেণ্ট নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, চোরাবাজারের চতুর ও ক্ষমতাশালী কারবারীরা গভর্নমেণ্টর চোখে ধূলা দিয়া তাহাদের অদৃশ্য গুদামে গোপনে চাউল মজুত করিয়া চলিয়াছে এবং সেই গুদামের সন্ধান লইয়া মজুত মাল বাহির করিয়া আনিবার ব্যবস্থা গভর্নমেণ্ট কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর একান্ত প্রয়োজন সর্ব্বদলের সহযোগিতা ও জনসাধারণের সমর্থন লাভ করা। ইহা ব্যতীত গোপন মজুতদারদের শায়েস্তা করিবার জন্য কোন উপায় নাই। সাধু অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী খাদ্য সমস্যার সমাধানে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছেন না ; লীগ ছাড়া বাঙ্গলার অন্যান্য জন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা তাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই । লীগ, কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি জন প্রতিষ্ঠানের ঐক্যবদ্ধ সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতাই বাঙ্গলার খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে। বাঙ্গলার খাদ্য সঙ্কটের সাম্প্রতিক তীব্রতা ও ব্যাপকতা বাঙ্গলার বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, তাঁহারা যদি আজও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও অনাহারের করাল গহ্বরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবেন। বাঙ্গলার মুস্লিম লীগকে আজ বাঙ্গলার সর্ব্বদলের সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য পারস্পরিক ক্ষুদ্র বাদ-বিসম্বাদের রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সৌভ্রাত্রের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গলার কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি অন্যান্য দলকে নিঃসঙ্কোচে এবং সাগ্রহে মুস্লিম লীগের প্রসারিত সেই হস্ত গ্রহণ করিয়া আমলাতন্ত্রের বাধা সত্ত্বেও বাঙ্গলাদেশে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। এই ঐক্যই বর্ত্তমান সঙ্কটে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা— সকলেই আজ জাতীয় প্রয়োজনের এই অপরিহার্য্যতা উপলব্ধি করুন।

(২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)

বঙ্গীয় খাদ্য-সম্মেলন

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতায় বঙ্গীয় খাদ্য সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলা হইতে ৪৭৪ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় খাদ্য সমস্যা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য বাঙ্গালী প্রধানগণ যে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা আশার কথা। সম্মেলনে বিভিন্ন জিলার প্রতিনিধি লইয়া, শ্রীযুক্ত সরকারের সভাপতিত্বে এক স্থায়ী বঙ্গীয় খাদ্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। আমরা আশা করি দল ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলেই এই সমিতির সহিত সহযোগিতা করিয়া নিরন্ন বাঙ্গলাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন।

শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার অভিভাষণে সরকারী খাদ্যনিয়ন্ত্রণ নীতি বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তি দ্বারা সকল ত্রুটি উদঘাটিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেবল ত্রুটি উদঘাটন করেন নাই, গঠনমূলক প্রস্তাব দ্বারা এই অবস্থার মধ্যেও মূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ যে সম্ভবপর তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত সরকারের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ

করিলে উপকৃত হইবেন। সরবরাহ ও বন্টনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং বরাদ্দ বাঁধিয়া দিয়া বিক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে পরামর্শ নলিনীরঞ্জন দিয়াছেন, তাহা একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সুপরামর্শরূপেই বাঙ্গলা সরকারের গ্রহণ করা উচিত।

খাদ্য সঙ্কট দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীরা কৃষক সমিতির কর্ম্মীদের সহিত মিলিত হইয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক খাদ্য-কমিটি গঠন করিবার আন্দোলন করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় কংগ্রেস, মুস্লিম লীগ, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের লইয়া দেশের নানা কেন্দ্রে বহুজন রক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। খাদ্য সমিতি এইভাবে সকল দলের সম্মেলনে জনরক্ষা সমিতি গঠন প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। জিলা, মহকুমা ও পল্লী সমিতিগুলি যখন সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত তখন গভর্নমেন্টের উচিত, এই সকল সমিতির সহায়তা গ্রহণ করা। সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা কমিটি গঠিত হইলে তাহা জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক হইবে না। বঙ্গীয় স্থায়ী খাদ্য সমিতি যদি এই সকল স্থানীয় সমিতিগুলির নিকট হইতে অভাব অভিযোগের তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্টের উপর উপযুক্ত চাপ দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অধিকতর দুর্গত অঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখ অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব হইবে। বাঙ্গলার আইনসভার বিভিন্ন দলগুলির সমর্থনে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলে তাহা শক্তিশালী হইত এবং শাসকগণের অনেক অবস্থার প্রতিকার করিতে পারিত। একাধিক বক্তা বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর অনুসৃত খাদ্যনীতির দৌর্ব্বল্যের সমালোচনা করিয়াছেন। ঐ সকল ত্রুটি যে অবিলম্বে সংশোধিত হওয়া আবশ্যক, খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ও তাহা স্বীকার করিবেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে যে আলোচনা হইবে, এই সম্মেলন তাহারই পূর্ব্বাভাষ। সকল দেশের নেতৃবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা ক্ষুধার্ত জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত হউক, আমরা ইহাই প্রত্যাশা করিতেছি।

(১৭ আষাঢ় ১৩৫০)

গোড়ায় গলদ

অবশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদেও খাদ্য-সঙ্কট লইয়া একটা আলোচনা হইয়া গেল। বাঙ্গলাদেশ বেদনা ও ক্ষোভের সহিত শুনিল, বর্ত্তমান বা অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যাশা করিবার মত কিছুই নাই। খাদ্যমন্ত্রী স্যার আজিজুল হক বলিয়াছেন, দোষ কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের নহে ; প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির দীর্ঘকালের অবিবেচনা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবই সমস্যাকে এমন ভয়াবহ করিয়াছে! ১৯৩৯-৪২ এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রত্যেক আন্তঃপ্রাদেশিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা খাদ্য-সমস্যাকে সমগ্রভাবে দেখিতে পারেন নাই। গত ডিসেম্বর মাসেও বাঙ্গলার একজন সরকারী প্রতিনিধি প্রয়োজন হইলে বাঙ্গলার জন্য চাউল কি ভাবে পাওয়া যাইবে ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমানে আমাদের কোন বক্তব্য নাই ; ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে বলিব।" অর্থাৎ সঙ্কট যখন ঘনীভূত হইয়াছে তখনও এই সবজান্তা শাসকটি নির্ব্বিকার ছিলেন। বাঙ্গলায় প্রচুর চাউল আছে এই ভ্রান্ত ধারণা লইয়া কালকর্ত্তন করিতে করিতে যখন সত্যই চাউলের দর অসম্ভব চড়িতে লাগিল তখন কর্ত্তারা রব তুলিলেন গোপন মজুতদারদের দোষেই ইহা ঘটিতেছে, মুনাফালোভীদিগকে

শায়েস্তা করিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু সেজন্য চেষ্টা কতটুকু হইল তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ব্যর্থতা আমরা দেখিয়াছি।

সার আজিজুলের বক্তব্য হইতে বুঝা গেল : (১) প্রাদেশিক শাসকগণের অবিবেচনা ও অক্ষমতায় সমস্যা জটিল হইয়াছে। (২) নিজেদের অবিবেচনা ও অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য ইহারা দীর্ঘ দুই বৎসর কাল অপরের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিজেদের সাধুতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। (৩) কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের নির্দ্দেশও বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের অসহযোগিতার ফলে নিষ্ফল হইয়াছে, কেন না কোন প্রদেশে ঘাটতি বা তাহার সমতা বিধানের কোন পরিকল্পনা হয় নাই। ইহা ছাড়া আরও অনেক বাধা আছে, মাল গাড়ীর স্বল্পতা, বন্যার জন্য রেল চলাচলে বিঘ্ন, জাহাজে খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতে গেলেও কলকব্জা বিগড়াইয়া বিলম্ব হয়। এই সকল উপস্থিত বাধা এবং ভবিষ্যতের বাধা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গলাদেশে খাদ্যশস্য প্রেরণের একটা প্রাণান্তকর চেষ্টা কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট করিবেন। সার আজিজুলের এই কর্ম্মনির্দ্দেশহীন স্তোকবাক্যের মূল্য অধিক নহে। যে শাসক শ্রেণীর কর্ত্তব্যহীনতার ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাঁহাদের কি উপায়ে শায়েস্তা করা যাইতে পরে তাহা স্যার অজিজুল বলেন নাই। ইউরোপীয় দলের নেতা স্যর হেনরী রিচার্ডসন এবং মিঃ গ্রিফিথ্স্ পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের নির্ব্বোধ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার নিন্দা করিয়াছেন। অবাঞ্ছনীয় রাজনৈতিক আন্দোলন দাবাইয়া রাখিয়া কড়াভাবে পাহারীদারই করাই যাঁহারা জীবনের প্রথম ও শেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের নিকট বিশেষ প্রত্যাশা করিবার কি-ই বা আছে।

তাঁহারা দীর্ঘকাল জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে, গোপন মজুতদার ও মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করিয়া শীঘ্রই খাদ্যাভাব দূর করিতেছি। সিভিলিয়ানী ব্যর্থতার বহু প্রমাণ পাইবার পরও স্যর আজিজুল পুনরায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেন, "আমি আশা করিতেছি তাহাতে পারস্পরিক বিশ্বাস ও অধিকতর সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা আমাদের সাহায্য করে না। যতদিন তাহারা স্বার্থসিদ্ধি করিবার সুযোগ পাইবে এবং তাহাদের মুনাফা নিরাপদ থাকিবে ততদিন তাহারা অপরের ভাগ্যের প্রতি উদাসীন থাকিবেই। আমার নিবেদন, জনমত এই সকল মজুতদার ও ফাটকাবাজের বিরুদ্ধে অভিব্যক্ত হউক। আমি এবং আমার বিভাগ প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হইয়া দেখিয়া লইব যে, উহারা যেন কোন মতে পরিত্রাণ না পায়।" এই "নির্বিষ সর্পের ব্যর্থ ফণা আস্ফালনের" মূল্য কতটুকু চোরাবাজারের মুনাফাশিকারী স্বদেশী ও বিদেশী বণিককুলের তাহা জানিতে বাকী নাই। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট নির্দ্দেশ দিলেন পূর্ব্বাঞ্চলে খাদ্যশস্যের অবাধ চলাচলের ব্যবস্থা হউক— তাহার সুযোগ লইল মুনাফাশিকারী ধনীরা এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি নানা উদ্ভট বাধা সৃষ্টি করিয়া উহা পণ্ড করিল। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে গভর্নমেণ্টের বারম্বার ভুলের সুযোগ চতুর ব্যবসায়ীরা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে—মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাহারা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। জাভা আক্রমণের সূচনায় বাঙ্গলা গভর্নমেণ্ট শত্রুকে বঞ্চিত করিবার নীতি লইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল হইতে দালাল মারফৎ চাউল ক্রয় করিয়া চোরাবাজারের ফাটকাবাজদিগকে ছয় টাকা মণের চাউল ৫/৬ গুণ দামে বিক্রয় করিবার সুযোগ কিরূপ অসহায়ভাবে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে কাহিনী স্যর আবদুল হালিম গজনবী পরিষদে ব্যক্ত করিয়াছেন। স্যর হেনরী রিচার্ডসন ক্ষুব্ধভাবে বলিয়াছেন,

লোকে অনশনে মরিতেছে, অথচ বহু বিলম্বে গঠিত খাদ্য বিভাগের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই। ঘটনার পর ঘটনায় গভর্নমেন্ট কোন শিক্ষাই লাভ করেন নাই, কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই, ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। মুনাফালোভী ফাটকাবাজারের দমন বা কঠোর দণ্ড দিতে আমলাতান্ত্রিক ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনাও তিনি করিয়াছেন। অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই, বাঙ্গলার সরবরাহ-বিভাগে দেড় গণ্ডা সিভিলিয়ন বসান হইয়াছে, আরও পাকা ও ঝানু কর্ম্মচারী রহিয়াছেন, তাঁহারা এতদিনেও আসল চোরাবাজার হইতে এক ছটাক চাউল বাহির করিতে পারেন নাই! অবশেষে কলিকাতায় ও হাওড়ায় ঘটা করিয়া মজুত খাদ্যশস্যের সন্ধান করা হইল, তাহার ফলে চোরাবাজারের গভীর অতলে বিচরণকারী রাঘব-বোয়ালেরা যে জালে আটকাইয়াছে এমন সংবাদ আমরা পাই নাই। চোরাবাজার পরিস্ফীত অবাধ। শুধু কি খাদ্যশস্য,—কাপড়, কাগজ, লোহালক্কড়, ঔষধপত্রও সমস্তই আজ মুনাফালোভীদের চক্রান্তে চোরাবাজারে অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হয়। পুলিশ, আইন, শাসক, বিচারালয় সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া চোরাবাজারের ব্যাপারীরা, জনসাধারণের অর্থ অপহরণ ও জীবনীশক্তি শোষণ করিতেছে। কেন না, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে ইহারা বুঝিয়া লইয়াছে "অসারের তর্জ্জন গর্জ্জনই সার।" একটা জাতির ক্ষুধার অন্ন তস্কর অপহরণ করিয়া ধনী হইতে অতি ধনী হইতেছে, আর অক্ষম শাসক শ্রেণী কমিটি, কনফারেন্স করিয়া এবং ইস্তাহার প্রচার করিয়া কেবলই আশ্বাস দিতেছেন!

জরাজীর্ণ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহার প্রতিকার হইবে না; এই সত্যটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে স্বীকার করিতে হইবে। রাজনৈতিক সমস্যাকে অচল রাখিয়া অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে। এই অবস্থা সেই লিন্‌লিথগো-গভর্নমেণ্টের অদূরদর্শী দমন নীতির সৃষ্টি। নিজের সৃষ্টির সম্মুখে বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া শাসকগণ আত্মদোষক্ষালনের বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন ও সহযোগিতা তারা সমূলে নষ্ট করিয়া আজ অপরকে দোষ দিতেছেন। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুরকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে গান্ধিজী ও কংগ্রেসকে ডাকিয়া আনিতে হইবে। জওহরলাল কম্বু কণ্ঠে আহ্বান করিলে মুনাফালোভী মহলে যে অতঙ্কের সৃষ্টি হইবে, সশস্ত্র সিভিলিয়ানতন্ত্রের অস্ত্রঝঙ্কারেও তাহা হইবার নহে।

(২৭ শ্রাবণ ১৩৫০)

জনযুদ্ধ

শ্মশানে বাংলার মা কাঁদিতেছে।
মুমূর্ষু ভাই-বোন আপনাদের সকলের মিলন চায়।
বাঙ্গালীর উজ্জ্বল স্বদেশ প্রেম মৃত্যু-মহামারীকে পুড়াইয়া ছাই করুক!

সোনার বাংলার প্রায় ৫০ লক্ষ লোক অনাহারে ও মহামারীতে মরিয়া শেষ হইয়াছে। আরো এক কোটি লোক মৃত্যুর দুয়ারে হাজির। ম্যালেরিয়া, কলেরা, শোথ ও বসন্ত বাংলার গ্রামের পর গ্রাম ছাইয়া ফেলিয়াছে। মেদিনীপুর, ঢাকা, হুগলী, ফরিদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও ২৪ পরগণায় ম্যালেরিয়া মড়কের আকারে দেখা দিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেবই বলিয়াছেন,—বহু গ্রামের শতকরা ৫০ জন লোক ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। বাংলার এমন কোন জেলা বাকী নাই যেখানে না আছে অনাহার, না আছে ম্যালেরিয়া মহামারী।

গভর্নমেণ্ট দিয়াছে ৩০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন, আর ৩০,০০০ পাউণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে। কখন যাইবে কে জানে? তাহাতেই বা কয় জনের চিকিৎসা হইবে? ২৮০০ চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইবে। ৯০ হাজার গ্রামের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুবই সামান্য। তাহার উপর রোগীর পথ্য নাই। গ্রামের লোকের অধিকাংশেরই কোন সংস্থান নাই। বহু জায়গায় ধান কাটার লোক নাই।

সব চেয়ে বড় সমস্যা, ক্ষেতের আমন ধান চাষীর হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে। ধান সরাইতেছে মজুতদার ব্যবসায়ী। চাষীর জমি হস্তান্তর করিতেছে মজুতদার-মহাজন। কুইনাইন যাইতেছে চোরাবাজারের গহ্বরে।

শিশু ও মাতার অবমাননা আমরা রাস্তায় দেখিতেছি। মৃতদেহ মাঠে-ঘাটে নদীতে পড়িয়া থাকে। মনুষত্বের অসম্মানে ও পূতিগন্ধে সারা বাংলার আবহাওয়া ঘৃণ্য ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে।

তবু বাংলায় যারা বাঁচিয়া আছে তাহারা জাগিয়া ওঠে না! বাংলার জননেতাদের এখনও চৈতন্য হয় নাই।

হিন্দু মহাসভার নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে দেশের ঐক্যের ফাঁকা আওয়াজ প্রায়ই তুলিয়া থাকেন। কিন্তু সারা বাংলাকে তিনি কি একসূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা করিয়াছেন? ধান চাল যাহাতে দেশের লোক পায় তাহার জন্য মজুতদারী ব্যবসায়ের ধ্বংস কবিবার কোন আন্দোলন করিয়াছেন? রিলিফের মধ্যে সব দলকে কি একত্রিত করিয়াছেন? কমিউনিষ্ট ও লীগ কর্মীদের সহিত একযোগে বাংলাকে বাঁচাইবার কোনও কথা বলিয়াছেন? না, তাহার জন্য কোন চেষ্টা

করিয়াছেন? নেতা হিসাবে তিনি এসবই পারেন কিন্তু তাহা না করার কি যুক্তি আছে জনসাধারণ তাহা জানিতে চায়। বাংলার কংগ্রেস কর্মীরা তাহাদের স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল ঐতিহ্য ভুলিয়া গিয়াছে। মানব সেবার চরম দুঃখের দিনে কংগ্রেস-কর্মীরা যেন কোথায় তলাইয়া গিয়াছেন। কলিকাতা হইতে কংগ্রেস নেতারা ফতোয়া দেন—'কমিউনিষ্টদের সাথে একযোগে কাজ করিও না।' আপনারই গ্রামের কংগ্রেস কর্মীকে জিজ্ঞাসা করুন মানুষের দুঃখে, রিলিফের কাজে, খাদ্যের ব্যবস্থায় কারা তাঁহার নিরলস সাথী? নিশ্চয়ই তিনি বলিবেন—কমিউনিষ্ট কর্মীরা।

নেতৃত্বের এই অন্ধতাই আজ বঙ্কিমচন্দ্র, দেশবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের বাংলাকে দুঃস্থ করিয়াছে, অনাহারে রাখিয়াছে, মৃত্যুর পথে ঠেলিতেছে।

মুসলিম লীগও আজ বাংলার সর্ব্বগ্রাসী সমস্যাকে বুঝিয়া উঠে নাই। কর্মীরা জনসাধারণের যন্ত্রণার চাপকে তাঁহাদের নেতাদের সামনে হাজির করিতে পারেন নাই। লীগ মন্ত্রীত্ব জনসাধারণকে ছাড়িয়া আমলাতন্ত্র ও মজুতদার ব্যবসায়ীর উপর ভরসা করিয়াছে। যাহারা গত বছর চাল মজুত করিয়া দর উঠাইয়াছিল একশ দেড়শ টাকায় আবার কোন ভরসায় মন্ত্রীত্ব তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াছেন? গভর্নমেণ্ট ধান না কিনিলে শহরের লোক খাইবে কি, ঘাটতি জেলায় কে ধান চাল পাঠাইবে? সেই মুনাফালোভী মজুতদার ব্যবসায়ী চাউলের রাজারা? মিথ্যা আশা। নাজিমুদ্দীন, সুরাবর্দ্দী কেন অন্যান্য জননেতাদের সহিত এই মজুতদারী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মিলিবেন না?

নাজিমুদ্দীন, শ্যামাপ্রসাদ ও কংগ্রেস নেতাদের বাংলার বুভুক্ষু নরনারী জিজ্ঞাসা করে বাংলার এত বড় দুর্যোগেও আপনারা মিলিবেন না? মৃত্যু ও মহামারীর উপর আসিয়াছে জাপানী বোম। হাজার হাজার বাঙ্গালীর রক্তে বাংলার মাটি রাঙাইতেছে। বাংলার নরনারীকে এই মহামারী ও মজুতদারীর মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইবার জন্য আপনাদের পথে কোন বাধা পাহাড়ের মত দাঁড়াইয়া আছে? আপনারা না মিলিলে জাতীয় নেতাদের মুক্তি কি সম্ভব? আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করার অর্থ বাংলার সম্পূর্ণ ধ্বংস।

শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, নারী! তোমরা তোমাদের নেতাদের চোখ খুলিয়া দাও। তোমরা সকলে শয্যাশায়ী রোগীর শিয়রে আসিয়া এক হইয়া দাঁড়াও। বাংলার ডাক্তার! তোমার চিকিৎসার জ্ঞান ও দেশপ্রেম লইয়া এস। গ্রামে গ্রামে দেশকর্মীদের সঙ্গে একযোগে মেডিকেল রিলিফ স্কোয়াড বাহির কর, রুগ্ন বাংলাকে বাঁচাও. সঙ্ঘবদ্ধ হও! গ্রামে ও শহরের পাড়ায় পাড়ায় তোমরা জনগণের যে দুর্ভেদ্য ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পার তাহার চাপে লীগ-কংগ্রেস-মহাসভার নেতৃত্ব জনগণের কাছে আসিবে। তাহারা তখন বাংলার জনসাধারণের যে নেতৃত্ব করিবে তাহা হইবে বাংলাকে বাঁচাইবার নেতৃত্ব. তাহা মজুতদারী, স্বাধীন ব্যবসা, মহামারী আর আমলাতান্ত্রিক বাধা চূর্ণ করার নেতৃত্ব।

দুর্ব্বার বেগে বাংলার নর-নারী অগ্রসর হউক। আত্মরক্ষা ও রোগ চিকিৎসার জন্য প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে সম্মিলিত খাদ্য ও রিলিফ কমিটি গড়িয়া উঠুক, এই মিলিত শক্তি ম্যালেরিয়া রোগ ও মজুতদারী চূর্ণ করুক। বাংলাকে আমরা বাঁচাইব। আমাদের স্বদেশ প্রেম কখনই ব্যর্থ হইবে না। সোনার বাংলা ভারত ও দুনিয়ার সামনে স্বাধীনতার যুদ্ধের ময়দানে তাহার গৌরব-মণ্ডিত স্থান আবার অধিকার করিবে।

(২০ পৌষ ১৩৫০)

সম্পাদকীয়

রেশনিং চাই—ঔষধ চাই

হাটে বাজারে সর্বত্র মজুতদারেরা হানা দিতেছে, চাউলের দাম বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশে ঔষধ নাই, গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইতে বসিয়াছে। লোভী শোষক, নিষ্ঠুর মজুতদার দেশের চাউল ও ঔষধ কব্জার মধ্যে পুরিয়া জনগণকে হত্যা করিতেছে।

আমলাতন্ত্র এখনও শহরতলীতে রেশনিং চালু করে নাই। শহরে রেশনিং না করার অর্থ—মজুতদারকে গ্রাম হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়া শহরে চোরাবাজার ফাঁদিবার সুযোগ দেওয়া। সমস্ত শহরে চোরা বাজার নষ্ট করিয়া গ্রামের প্রয়োজনীয় চাউল গ্রামে রাখিবার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সমানভাবে বণ্টন করা হউক— এই দাবীই রেশনিং-এর দাবী। এ দাবী আজ প্রত্যেক নরনারীর মূল গণতান্ত্রিক দাবী। অবিলম্বে প্রত্যেক শহরে রেশনিং চাই, গ্রাম অঞ্চলে বাঁধা দরে সকল জিনিষ বিক্রীর ব্যবস্থা চাই।

প্রত্যেক নরনারীর বাঁচিবার জন্য ঔষধ চাই। আমলাতন্ত্র প্রত্যেকের জন্য ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করিতে বাধা। চোরাবাজার হইতে ঔষধ বাহির কর। বিদেশ হইতে ঔষধ আন, ব্যাপকভাবে তাহা সরবরাহ কর। বাংলার প্রতি শহর প্রতি গ্রাম হইতে এই দাবী ধ্বনিত হউক।

রেশনিং চাই, ঔষধ চাই—এই দুই দাবী আজ জনগণের সর্ব্বপ্রধান দাবী। এই দুই দাবীর যাহারা বিরোধী তাহারাই জনগণের বিরোধী।

এই দুই দাবীর জন্য দেশময় জন-ঐক্য গড়িয়া উঠুক, তাহা হইলে আমলাতন্ত্রকে ইহা পূরণ করিতেই হইবে।

আমরা বাংলাকে ধ্বংস হইতে দিব না।

(২০ পৌষ ১৩৫০)

কলিকাতায় আবার কাঙ্গালীর মিছিল

গ্রাম্য জীবন পুনর্গঠন না করিয়া রিলিফ কিচেন বন্ধ করার ফল

কলিকাতায় দুঃস্থদের মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে। ১০ই জানুয়ারি যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ৩২৮ জন দুঃস্থের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার আগেকার পর পর দুই সপ্তাহে যথাক্রমে ২৯৯ ও ৩০২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কর্পোরেশন হেলথ অফিসারের মতে "মফঃস্বল অঞ্চলে এখনও খাদ্য পরিস্থিতি সঙ্কটজনক বলিয়া বহুসংখ্যক দুর্গত ব্যক্তি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া জমায়েত হইতেছে।"

গৃহস্থদের দরজায় ক্ষুধিতের মর্ম্মভেদী চীৎকার অনেকদিন বন্ধ ছিল, আবার কয়েকদিন হইতে সেই চীৎকার শুরু হইয়াছে। রাত্রে গৃহস্থের দরজায় আবার আর্ত্তনাদ উঠিতেছে, "মা, এক মুঠো ভাত দাও।"

এই নূতন দুঃস্থের দল কোথা হইতে আসিতেছে? সরকারী প্রেস নোটে বলা হইয়াছে—অবস্থা উন্নতির দিকে যাইতেছে, কিন্তু কলিকাতায় নূতন দুঃস্থের মিছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার পরিচয় দেয়।

২১শে জানুয়ারি শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ফিরিতেছি। একটি পরিবার মাথায় মোট লইয়া যাইতেছে, দেখিয়া দুঃস্থ পরিবার মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহারা কলিকাতায় নূতন আসিয়াছে। ঢাকা জেলায় মুন্সিনগরে তাহারা ক্ষেত খামারের কাজ করিত। গ্রামে দারুণ মড়ক লাগিয়াছে, তাহাদের অভিভাবক অসুখে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। রোজগার করিবার সামর্থ্য নাই। তাই তাহার বউ, ১২/১৩ বছরের ছেলে, বিধবা ভাই বউ এবং তাহার এক পাল ছেলে কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহারা কাজ পাইলে কাজ করিতে প্রস্তুত আছে।

বালীগঞ্জে যেখানে গাঁড়িয়াহাট ও সাদার্ন এভিনিউ মিশিয়াছে তাহার কাছেই রোজ সকালে ছোলা সিদ্ধ বিক্রি হয়। কিছুদিন আগেও এখানে দুশো আড়াইশ'র বেশী লোক খাইত কিনা সন্দেহ, এখন এখানে লোকের সংখ্যা ৪/৫ শত হইয়াছে। ভিড় এখানে দিন দিন বাড়িতেছে।

হাওড়া পুলের কাছাকাছি পোস্তা জায়গায় এক ঝাঁক বাঙ্গালী মেয়ে ও শিশুর ভিড় দেখিয়া থামিলাম। কাছেই একটি ছেলে ডাষ্টবিন হইতে ভাত খুঁটিয়া খাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহার বাড়ী মেদিনীপুর। মার সঙ্গে সে কলিকাতায় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, কিছুদিন হইল জ্বরে তাহার মা মারা গিয়াছে। তাহার পাশে একটি ৩০/৩৫ বছরের মেয়ে বসিয়াছিল। পাশের বাড়ী হইতে গরুকে ভাত খাইতে দিয়াছিল। সেই গরুটিকে তাড়াইয়া দিয়া সে ভাত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। কলিকাতার রিলিফ কিচেন বন্ধ, কাজেই এই ভাবেই এখন তাহারা চালায়। তাহার বাড়ী বাগনানে। কিছুদিন আগে সে গ্রামের রিলিফ কিচেনে ফিরিয়া গিয়াছিল। সে কিচেন এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই শহরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এ অঞ্চলের কাঙ্গালীরা বড়বাজারে একটি দানছত্রে কলাই সিদ্ধ খাইয়া কোন রকমে পেট চালায়।

শিয়ালদহে বেলেঘাটা স্টেশনের গাড়ী হইতে নামিল কাঙ্গালীর মিছিল। সংখ্যায় তাহারা ৩০০ জন। ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছে। তাহাদের একটা দলকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম:—"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?" "ডায়মণ্ড হারবার হইতে।" "তোমরা এইভাবে রোজ যাতায়াত কর কেন?" "আমরা দু তিন দিন অন্তর যাতায়াত করি। গ্রামের লঙ্গরখানাগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের নিজেদের জমি নাই। ধান কাটিয়া যাহা পাইয়াছিলাম তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে, কতক খাইয়াছি, কতক বেচিয়া ঔষধ পথ্য কিনিয়াছি, এখন আর কিছুই সম্বল নাই।"

"গ্রামে কি তোমরা কাজ পাওনা?"

"গ্রামে পুরুষদের জন্য কাজ আছে, মেয়েদের জন্য কাজ নাই। কাজের উপযুক্ত পুরুষেরা রোগে শয্যাগত, কাজেই আমরা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছি।"

বড়বাজারে পাঞ্জাব সেবা সমিতির রিলিফ কেন্দ্রে দেখিলাম ৫০০ কাঙ্গালী। তাহারা হাওড়া জেলার আমতা, উলুবেড়িয়া ও আন্দুল হইতে আসিয়াছে। দশদিন আগে তাহাদের স্থানীয় রিলিফ কিচেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আগের বছর প্রথম দিকে তাহারা গৃহস্থের ধান ভানিয়া রোজগার করিত, কিন্তু এবার কেহ তাহাদের দিয়া ধান ভানাইতেছে না, হয় জমা করিয়া রাখিতেছে অথবা চাউলের কলের মালিকের কাছে বেচিয়া ফেলিতেছে।

এখানে আর একটি দল দেখিলাম, তাঁহারা এখানকার নূতন কাঙালী। সকলেই মেয়ে। বাড়ীর পুরুষেরা চটকলে কাজ করিত, কয়লার অভাবে চটকল বন্ধ, কাজেই তাহারা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। এইরকম দুইটি পরিবার সেখানে দেখিলাম। এখানে যত কাঙাল আছে তাহাদের মধ্যে

শতকরা ২০ বা ২৫ জন হইবে গ্রামের দিনমজুরদের পরিবার, পুরুষেরা দুঃস্থ, মেয়েরা গ্রামে কাজ পায় না, লঙ্গরখানা বন্ধ তাই দলে দলে শহরে আসিতেছে।

কলিকাতায় যে সব দুঃস্থরা আসিতেছে তাহাদের সংখ্যা এখনো ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই, কিন্তু যে ধরনের লোক আসিতেছে সে ধরনের লোক হাজারে হাজারে হাজির হইবে। সরকার রিলিফ কিচেন বন্ধ করিয়া দিতেছে, অথচ গ্রাম্য জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য গঠনমূলক কাজ আরম্ভ হয় নাই। রোগে মহামারীতে হাজার হাজার মেয়ে ও ছেলে কাঙাল হইয়া পড়িতেছে, প্রচুর আমন ধান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের জন্য বাঁচিবার কোন পথ নাই। একদিকে বড়লোকের অতুল ঐশ্বর্য্য। আর একদিকে দুঃস্থতা ও মৃত্যু। সরকার বলিতেছেন অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই, দিন দিন গুরুতর হইতেছে। গ্রাম্য জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখনই অগ্রসর হইতে হইবে, এই মুহূর্তে গ্রামে গ্রামে কুটীরশিল্প বিস্তারের জন্য ব্যবস্থা করিলে এবার কাঙালীর অভিযান বন্ধ করা যায়। রোজগার করিতে পারে অথচ রোজগারের পথ নাই, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে রোজগার বন্ধ হইয়াছে, এইরকম নরনারীই শহরে বেশী আসিতেছে।

(স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ৬ মাঘ ১৩৫০)

স্বাধীনতার ডাক

দেশের চরমতম বিপদের মাঝখানে আসিয়াছে স্বাধীনতা দিবস। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পূণ্য জন্মভূমি বাংলাদেশ আজ মহাশ্মশানে পরিণত। হাজার হাজার পরিবার উজাড় হইয়া গিয়াছে, এক একটি গোটা অঞ্চলই জন-মানবহীন, গ্রামগুলি খাঁ খাঁ করিতেছে।

বাংলায় পঞ্চাশ লক্ষ দেশবাসী জীবন দিয়াছে, কারণ আমরা, তাহাদের দেশভক্ত স্বদেশবাসীরা মুনাফাখোর ও মজুতদারদের হাত হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখের খাদ্য উদ্ধার করিতে পারি নাই, অপদার্থ আমলাতন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতা এমনি চরমে উঠিয়াছে যে সেও কিছু করিতে পারে নাই।

এই ভাবে পঁচিশ লক্ষ দেশবাসী ক্ষুধার দুঃসহ যাতনায় তিলে তিলে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিতেও আমরা জনগণকে একত্র করিয়া উহাদের রক্ষা করিতে পারি নাই। এমনি করিয়া গত বৎসর গান্ধীজী যখন তিলে তিলে মরিতে বসিয়াছিলেন তখন আমরা তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য মুসলিম জনগণকে সক্রিয় করিতে পারি নাই। সৌভাগ্যের বিষয় গান্ধীজীর জীবন কোন রকমে রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু আমাদের এই পরাজয়ের ফলে বাংলার নিরপরাধ ৫০ লক্ষ নরনারী ও শিশু আজ প্রাণ বলি দিল।

এ সব কথা মনে করিলে লজ্জায় আমাদের সকলেরই মাথা নত হইয়া আসে।

(স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ৬ মাঘ ১৩৫০)

ভারতের পিছনে বিদেশের জনমত

বাংলার খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বিলাতের কমিউনিষ্ট নেতা হ্যারি পলিটের দাবি ঃ—

১) গভর্নমেণ্টের হাতে যে স্টক আছে তা অবিলম্বে বাহির করিয়া বিনা মূল্যে দুঃস্থদের খাদ্য দেওয়া হউক।

২) মজুতদারীর ঘরের মজুত ধান চাল ও শস্য বাজেয়াপ্ত করা হউক।

৩) দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় যে বাড়তি খাদ্য আছে তা ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক।

(স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ৬ মাঘ ১৩৫০)

খাদ্য সংকটের ভয়াবহ পরিণতি
বাংলার নারী সমাজ ধ্বংসের মুখে

৪ মাস আগেই খাদ্য সংকটের প্রচণ্ড ধাক্কা গ্রাম্য জীবনের উপর আসিয়াছে। তার ফলে আমরা দেখিয়াছি হাজারে হাজারে মেয়ে পুরুষ শিশু শহরে আসিয়া দুঃস্থে পরিণত হইয়াছে। অনাহারে মরিয়াছেও তাহারাই। কিন্তু শুধু এখানেই শেষ নয়। খাদ্য সংকট গ্রাম্য জীবনে চরম ভাঙ্গন আনিয়াছে—মেয়েদের সমাজ জীবনকে পঙ্গু করিয়াছে। প্রথম অবস্থায় আমরা দেখিয়াছি—স্ত্রীপুত্রকে ছাড়িয়া পুরুষেরা গ্রাম হইতে খাদ্যের সন্ধানে শহরে চলিয়া গিয়াছে, অসহায় স্ত্রীপুত্র শেষ পর্যন্ত দুঃস্থে পরিণত হইয়াছে। ২৪ পরগণার গ্রাম হইতে মেয়েরা শহরে চলিয়া আসিয়াছিল, তারপর যখন গ্রামে ফিরিয়া গেল, তাহাদের স্বামীরা তাহাদের ঘরে লইল না। এমনিভাবেই ঘর-ভাঙ্গন শুরু হইল। অভাবের জ্বালায় স্বামী স্ত্রী পুত্রকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, এই রকম খবর ঢাকা, জলপাইগুড়ি, নেত্রকোণা, ফরিদপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া মা নিজের সন্তানকে মারিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ খবর মেদিনীপুর জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছে। মা হইয়া মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে দিয়াছে, এই খবর যশোহর, দিনাজপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছে। নেত্রকোণা, ফরিদপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার গ্রাম হইতে অনেক মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

দাস প্রথার মত মেয়ে বিক্রয়

অভাবের তাড়নায় বাপ বা স্বামীরাও আজ এমন নির্ম্মম হইয়া যাইতেছে যে স্ত্রী কন্যার ইজ্জত রক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রংপুরের নীলফামারী মহকুমার খবরে প্রকাশ যে এক মাসে প্রায় ১০০ ঘর চাষী তাহাদের পরিবারকে টাকার বিনিময়ে জোৎদারের কাছে বিক্রি করিয়াছে। দেশীবাই অঞ্চলে মাত্র ১০০ ঘর লোকের বাস, তারই মধ্যে ৫০ ঘর চাষী পরিবার এই ভাবে ঘর ছাড়া হইয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রাম রিলিফ হাসপাতালে যে সব দুঃস্থা নারী থাকে, দেখা যায় যে তাদের অধিকাংশই যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইহাদেরই একজনের কলেরা হয়। তখন সে হঠাৎ ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল হইতে ২টি টাকা বাহির করিয়া নার্সকে দেয়। ঐ টাকা কোথা হইতে পাইল জিজ্ঞাসা করা হলে জানিতে পারা যায় ইহা তার সন্তান বিক্রয়ের দাম। প্রথম সন্তান বিক্রয় তারপর দেহ বিক্রয় ইহাই দুঃস্থদের জীবনের গতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(১৯ মাঘ ১৩৫০)

বাংলার বিধ্বস্ত গ্রামগুলি নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে

বাংলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে যে অনুসন্ধান হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গত বৎসর দুর্ভিক্ষের ফলে ৩৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের আঘাতে গত বৎসর প্রায় ১ কোটি নরনারী দুঃস্থ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে ৬৫ লক্ষ বাঁচিয়া আছে তাহারা নিরাশ্রয়। ক্ষিতীশবাবুর বিবৃতিতে জানা যায় যে মৃতদের মধ্যে উপার্জনক্ষম পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশী। কৃষকদের ভিতর শতকরা ৩০ জন জমিজমা বিক্রী করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। জেলেরা নৌকা হারাইয়াছে, তাঁতীদের তাঁত গিয়াছে, কামার, কুমার, চাষী প্রভৃতি সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ফকির সাজিয়াছে। দুর্ভিক্ষের পর আসিয়াছে মহামারী। মহামারীর আক্রমণে দুর্গতদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। অসহায় দুঃস্থদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক ও শিশু। ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষিতীশবাবু বলিয়াছেন,—"স্ত্রীলোক এবং শিশুদের এই বিরাট বাহিনীকে যদি জীবন ধারণের সুযোগ না করিয়া দেওয়া হয় এবং আপাতত তাহারা অর্থ সাহায্য না পায় তাহা হইলে তাহাদের ভিতর বর্ত্তমান বৎসরে মৃত্যুর হার সাংঘাতিকভাবে বাড়িবে। যদি এই পরিবারগুলিকে অবিলম্বে স্বাবলম্বী করিবার ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে গণিকাবৃত্তি প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবে।"

বিশেষজ্ঞদের বিবরণ হইতে জানা যায়, বাংলার ৬৫ লক্ষ নরনারী দুর্ভিক্ষের আঘাতে যাযাবর ভিক্ষুক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে।

(৯ চৈত্র ১৩৫০)

গ্রাম না কবরস্থান

৬ই এপ্রিল সকালবেলা সিদ্ধিচেনাজ্ঞ গ্রাম অভিমুখে রওনা হই। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মধ্যে এই গ্রামটি। শুনিয়াছিলাম যে এই অঞ্চলটিতেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সবচেয়ে বেশী ধাক্কা লাগিয়াছে। এক ঘণ্টা চলার পর গ্রামে আসিয়া পৌছিলাম। সিদ্ধিচেনাজ্ঞ গ্রামটি চিনিতে কষ্ট হইল না। সামনেই চোখে পড়িল ভাঙ্গা বাড়ি খালি পড়িয়া আছে আর চারিদিকে কবরের সারি। ইহা দেখিয়াই নতুন লোকেও গ্রামটিকে চিনিতে পারে।

গ্রামের ভিতরেও এই একই দৃশ্য। যে দিকে তাকাই কেবল কবর আর ভাঙ্গা বাড়ি। দু-একটি বাড়ি চোখে পড়িল, যার উঠানের মধ্যেই কবর। এই কবর স্থানের মধ্যে মাঝে মাঝে জানোয়ারের মত দু-একটি উলঙ্গ মূর্তি দেখা গেল। গতবারের অভাব ও এবারের ম্যালেরিয়া এই দুইয়ের সঙ্গে লড়াই করিয়া এরা বাঁচিয়া আছে—যেন গ্রামের স্মৃতি রক্ষার জন্য।

সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য মায়ের ব্যাকুল চেষ্টা

ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল "কি দেখছ বাবা সব গেছে।" একটি মেয়ে, তার পাশে একটি শিশু। মেয়েটি তার করুণ কাহিনী বলিতে লাগিল। মেয়েটির স্বামী মারা যায়

ম্যালেরিয়ায়। ছেলেটিকে বাঁচাইবার জন্য মেয়েটি আবার বিবাহ করিল। পর পর ৩টি স্বামীই রোগে মারা গেল। ৪র্থ বার বিবাহ করিয়াও আজ মেয়েটি নিরুপায়। স্বামী ইহাদের খাওয়াইতে না পারিয়া ১৫ দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

(১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১)

বাংলার সংকট রুখিতে সমবেত প্রচেষ্টা চাই

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা

লাহোর ১৫ই মে—লাহোরের ফোরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন—"কেবলমাত্র দলগত প্রচেষ্টায় বাংলায় বর্তমান বিপুল সংকট দূর হইবে না। বাংলার এই সংকট দূর করিতে হইলে সকলকে সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ভিন্ন এই জটিল সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে। তবু নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকিতে পারি না। এই সংকটকালে প্রত্যেকেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত।

দুর্ভিক্ষের কবলে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান করিয়া মৃত্যু সংখ্যা ৩০ লক্ষ [যদ্দৃষ্ট] বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আজ পাঞ্জাব, অন্ধ্র মাদ্রাজ, বোম্বে, ইউ পি ভারতের এই সমস্ত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে জাতি বর্ণের সমস্ত বাধা ভাঙ্গিয়া ছাত্র সমাজ বাংলার এই দুর্দ্দশাকে রুখিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।"

(১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১)

মেদিনীপুরকে বাঁচাইতে এক হও

গত বছর মেদিনীপুর জেলায় ৫০ হাজার লোক অনাহার ও মহামারীতে মরিয়াছে। তমলুক, সূতাহাটা, নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া, মহিষাদল প্রভৃতি অঞ্চলে হাজার হাজার লোকের একমাত্র সম্বল ছিল লঙ্গরখানা। শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়া, শতকরা ৩০ জন কলেরা ও বসন্তে এবং শতকরা ৬০ জন শোথে ভুগিয়াছে। গত বছরের এই অবস্থা সামলাইয়া না উঠিতেই আবার মেদিনীপুরে অনাহার দেখা দিয়াছে। বীজ ধান ও বলদের অভাবে এবার ৩০ ভাগ আউসের জমিতে ফসল হয় নাই। আমন ধান যা হইয়াছিল, তারও অধিকাংশ মহাজনের ঘরে। বর্তমানে শতকরা ১০ জন কৃষকের ঘরে ধান একেবারে নাই। পাঁশকুড়া থানার ১৫ নং ইউনিয়নে একটি গ্রামে ১০০ ঘরের মধ্যে ৩৫ ঘরে কোনো খাবার নাই। কলাগাছিয়া গ্রামে শতকরা ৫০ জন না খাইয়া আছে। শতকরা ৫০ জনের বস্ত্র নাই। ইহার উপর বসন্ত, ম্যালেরিয়া আবার ছড়াইতেছে। দুধের অভাবে শিশু মৃত্যু বাড়িতেছে।

(৭ আষাঢ় ১৩৫১)

সাময়িকপত্র পরিচিতি

উদ্বোধন : স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাক্ষিক পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৫ -এ। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবেকানন্দ ছাড়াও স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ চিন্তাবিদদের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত। দশম বর্ষ (১৩১৪-১৫) থেকে পত্রিকাটি মাসিকে রূপান্তরিত হয়। যদিও ঘোষিতভাবে এটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র নয় তবু মিশনের আদর্শ, লক্ষ্য ও সংগঠনের সঙ্গে এর সংযোগ স্পষ্ট। পত্রিকাটি এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

প্রবাসী : প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩০৮। মাসিক প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হত। বস্তুত বাংলার বাইরে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র হিসেবে *প্রবাসী*-র ভূমিকা অবিস্মরণীয়। পত্রিকার জন্যেই লেখা রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতাটি দিয়েই পথ চলা শুরু। কথা-সাহিত্য ছাড়াও শিল্প ও চিত্রকলা, শিক্ষা সংক্রান্ত নিবন্ধ ইত্যাদির জন্য *প্রবাসী* তার জীবৎকালে জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছিল। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে সমকালীন রাজনীতি ও বিভিন্ন ঘটনাবলীর সবিস্তার আলোচনার কারণে পত্রিকাটি ঐতিহাসিক ও সমাজ-গবেষকদের কাছেও মূল্যবান দলিল হিসেবে আদৃত হয়। লেখক সূচিতে রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও যোগেশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ছিল। বাংলার বাইরের বাঙালিদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়েও *প্রবাসী*-র বিশেষ মনোযোগ ছিল। 'গ্রন্থ পরিচয়' বিভাগে প্রবাসী বাঙালীদের লেখা গ্রন্থের বিবরণ থাকত।

ভারতবর্ষ : মাসিক। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩২০। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম পরিকল্পক, কিন্তু এটি প্রকাশের আগেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাই এর প্রথম সংখ্যাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' কবিতা এবং তাঁর স্মৃতিতে রচিত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও নরেন্দ্র দেবের 'শোকগাথা' প্রকাশিত হয়। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদকীয় ঘোষণায় বলা হয়েছিল— "আমরা আশা করি যে এই রাজপুরুষগণ যাঁহারা বাংলা ভাষা পড়েন না, তাঁহাদিগকে এই বাঙ্গলাভাষা সাহিত্য পড়াইব এবং প্রাচ্য ভাব সম্পদে প্রতীচ্যকে সম্পদশালী করিব।...আমাদের অভিলাষ যে জনসাধারণকে ভাব ও রুচির অধঃস্তর হইতে এক মায়াময় রাজ্যে টানিয়া তুলিব...আমাদের সাধনা যে, আমাদের মাতৃভাষাকে সমবেত মানবমণ্ডলীর সম্মুখে গৌরবের সিংহাসনে বসাইয়া তাহার মাথায় মহিমার রাজমুকুট পরাইয়া দিব এবং যে জাতির এই ভাষা তাহাকে সমুচিত সম্মান করিতে জগতকে আদেশ করিব, আমরা বঙ্গ ভাষার সেই সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে স্বাগত সম্ভাষণ দিতে আসিয়াছি।" *ভারতবর্ষ* তার প্রকাশকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এর 'বিবিধ

প্রসঙ্গ' বিভাগে চিত্রসহ স্থানীয় বিভিন্ন ঘটনার নাতিদীর্ঘ বিবরণ, 'সংকলন' বিভাগে নানা প্রাচীন গ্রন্থ ও পত্রিকা থেকে সংগৃহীত বিচিত্র ও বিশেষ বিশেষ তথ্যবহুল জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুনর্মুদ্রণ. 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে সাহিত্য জগতের সংবাদ কণিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হত। প্রতি সংখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকরদের শিল্পকর্মও প্রকাশ করা হত। *ভারতবর্ষ*-র লেখক তালিকায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী প্রমুখ স্বনামধন্য লেখক-লেখিকারা থাকতেন। অনুরূপা দেবী-র 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাস প্রথম এই পত্রিকাতেই ধারবারিকভাবে প্রকাশিত হয়।

মৌচাক : ছোটদের মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩২৭। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মৌচাক' কবিতা "ঝরছেরে মৌচাকের মধু..." দিয়ে এর যাত্রা শুরু। প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনবদ্য সৃষ্টি 'বুড়ো আংলা'। রবীন্দ্রনাথের কবিতাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এঁরা ছাড়াও লেখক তালিকায় ছিলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ তৎকালীন প্রথম সারির সাহিত্যিকরা। চারুচন্দ্র রায়ের অলংকরণ ছিল এই পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ। পত্রিকাটি এখনও প্রকাশিত হয়।

মাসিক বসুমতী : বৈশাখ ১৩২৯-এ এই পত্রিকার সূচনা। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার ঘোষ। সম্পাদকীয় 'পত্র-সূচনা'-য় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঘোষণা ছিল—"ভাবের প্রচার যত সঠিক হয়, উন্নতির পথ ততই জাতির পক্ষে সুগম হয়। সেইজন্য আমরা যথাসাধ্য সাহিত্যিক সহায়তায় দেশের সেবা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" বলা হয়েছিল—"দেশের সর্ববিধ উন্নতি রাজনীতিক উন্নতি সাপেক্ষ, সেইজন্য আমরা রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করিব। বিজ্ঞানের কথা, শিল্প বাণিজ্যের কথা, ঐতিহাসিক কথা, কৃষি প্রভৃতির উন্নতির আলোচনা, সামাজিক সমস্যার আলোচনা—এই পত্রিকায় থাকিবে।...গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। যাহাতে ইহার চিত্র সম্পদ প্রবন্ধ গৌরবের উপযোগী হয় সে দিকেও আমরা দৃষ্টি রাখিব।"

প্রকাশ কালে *মাসিক বসুমতী* যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এর কবিতা বিভাগে কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিখ্যাত কবির কবিতা, গল্প-উপন্যাস বিভাগে স্বর্ণকুমারী দেবী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়দের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সমৃদ্ধ প্রবন্ধ বিভাগের লেখক তালিকায় ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের পাশাপাশি অনেক অনামী লেখকও। প্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্যও ছিল এই পত্রিকার এক বৈশিষ্ট্য। অমৃতলাল বসুর রসরচনা 'চরকা', 'নারীমন্দির' বিভাগে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'নারীত্ব', স্বাক্ষরবিহীন 'নবজাগরণে নারীর অংশ', প্রতিভা দেবীর জীবনী, মনোরমা ঘোষের 'বঙ্গনারীর কাজ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়। 'চয়ন' বিভাগে বিজ্ঞান জগৎ ও দেশবিদেশের নানা সংবাদ, 'মাসপঞ্জী' বিভাগে রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমকালীন ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ ছাড়াও 'সম্পাদকীয়' বিভাগে থাকত নানাবিধ বিষয়ের মূল্যবান আলোচনা। *বসুমতী*-তে প্রকাশিত চিত্রগুলিও ছিল যথেষ্ট শিল্পসমৃদ্ধ।

শিশুসাথী · মাসিক। বৈশাখ ১৩২৯ থেকে সূচনা। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের কোনো নাম ছিল না। অনুমান করা হয় প্রথম সম্পাদক বৃন্দাবনচন্দ্র ধর। পরবর্তী সম্পাদক আশুতোষ ধর। লেখক তালিকায় ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, শিবরতন মিত্র, হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রমুখ শিশু সাহিত্যিক। পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল রূপকথার পরিবেশন। ফণী গুপ্ত ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী-র অলংকরণে পত্রিকাটি ছিল

সমৃদ্ধ। ফণী গুপ্তের 'চিত্র দৃষ্টে গল্পরচনা' ফিচারটিও ছিল শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়। ১৩৩৩ থেকে *শিশুসাথী* বার্ষিক পূজা সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। এটিই সম্ভবত প্রথম শিশুপাঠ্য পূজাবার্ষিকী।

শনিবারের চিঠি : ১০ শ্রাবণ ১৩৩১, শনিবার থেকে ডবল ক্রাউন ষোলো পৃষ্ঠার ফর্মায় খামের আকারে মুড়ে সাপ্তাহিক হিসেবে এই পত্রিকার যাত্রা শুরু। প্রথম সম্পাদক ছিলেন যোগানন্দ দাস। ১৩৩১-এর ফাল্গুন পর্যন্ত সাপ্তাহিক হিসেবে পত্রিকাটি চলে বন্ধ হয়ে যায়। দু বছর পর ১৩৩৩-এ পত্রিকাটির তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ থেকে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৩৩৫ আশ্বিন থেকে সম্পাদনার দায়িত্বে আসেন সজনীকান্ত দাস—যাঁর নামের সঙ্গে পত্রিকাটি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সজনীকান্তের মৃত্যুর পর পরিমল গোস্বামী, রঞ্জনকুমার দাস প্রমুখের সম্পাদনায় পত্রিকাটি কিছুকাল প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রকাশকালে ব্যঙ্গরচনার জন্য *শনিবারের চিঠি* অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে এক সময় চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম এ পত্রিকার ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন। *শনিবারের চিঠি*-র অধিকাংশ লেখাই ছদ্মনামে প্রকাশিত হত।

দীপালী : সাপ্তাহিক। প্রথম প্রকাশ—চৈত্র ১৩৩৪। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আশুতোষ সান্যাল। সম্পাদকীয় ঘোষণায় ছিল— " 'দীপালী' সাহিত্য ও নাট্যকলার পত্র। কেবল রসসাহিত্য আমাদের আলোচনার বিষয়।...রাজনৈতিক কোন আলোচনা 'দীপালী' গণ্ডীর বহির্ভূত।" এই পত্রিকার লেখক সূচিতে ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, মৃণালিনী গুপ্তা, মায়া রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিরা। অলংকরণে অজস্র চিত্র ছাড়াও নাট্য ও চলচ্চিত্রজগতের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবিতে *দীপালী* সমৃদ্ধ থাকত।

বঙ্গশ্রী : মাসিক। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৩৯। প্রথম সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। প্রকৃতপক্ষে ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *উপাসনা* পত্রিকাই মাঘ ১৩৩৯ থেকে *বঙ্গশ্রী* নাম গ্রহণ করে। *বঙ্গশ্রী* প্রথম সংখ্যা থেকেই ছিল বিষয় বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, নলিনাক্ষ সান্যাল-দের মতো পণ্ডিতপ্রবরদের প্রবন্ধ ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে *ন্যাশনাল জিওগ্রাফি* পত্রিকার নির্বাচিত অংশ 'বিচিত্র জগৎ'; বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের তত্ত্বাবধানে 'অন্তঃপুর' নামে মহিলা বিভাগ ইত্যাদি ছিল পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ। এ ছাড়া ব্যবসাবাণিজ্য, ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী লেখালেখি, গ্রন্থ ও পত্রিকা পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ও পত্রিকায় অন্তর্ভুক্ত হত। ১৩৪০ সালে একটি প্রবন্ধের জন্য এর পরিচালকদের সরকার থেকে সতর্কও করা হয়।

দেশ : সাপ্তাহিক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪০। এটি আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর একটি প্রকাশনা। প্রথম সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পত্রিকার নীতি সম্পর্কে প্রথম সম্পাদকীয় ঘোষণায় বলা হয়েছিল—"কোন বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ, কোন পাশ্চাত্য ইজমের তর্জমা নহে, জগতের সমগ্র ভাবধারার সহিত ইহাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া ইহাদের কূপমণ্ডূকতা দূর করা।...রাষ্ট্র ও সমাজ অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সকল তত্ত্ব, আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টা স্বদেশে ও বিদেশে চলিতেছে—তাহা আপামর সাধারণ জানুক, ভাবুক। কোন পথে তাহাদের কল্যাণ তাহারাই ঠিক করিয়া লইবে।—এই হল 'দেশের' উদ্দেশ্য।" বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিক্ষেত্রের প্রায় সমস্ত প্রথিতযশা

মানুষ ছাড়াও অজস্র অখ্যাত লেখক *দেশ* পত্রিকার মধ্য দিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন। বর্তমানে পত্রিকাটি পাক্ষিক হিসেবে প্রকাশিত হয়।

অরণি : রাজনীতি ও সংস্কৃতিমূলক সাপ্তাহিক। প্রথম প্রকাশ ৫ ভাদ্র ১৩৪৮, শুক্রবার। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সম্পাদক লিখেছিলেন—"অরণি বাজার চলন কোন ধারাকে অনুসরণ করিবে না। ছবির রঙচঙ ও প্রসাধন নৈপুণ্যে পাঠক পাঠিকাদেব মন ভুলাইবার পথ আমি পরিহার করিয়াই চলিব। ফাটকা বাজার ও সিনেমা, ঘোড়দৌড় ও খেলার মাঠের ক্ষণিক উত্তেজনা ও আত্মবিস্মৃতির অনুকরণ করা অরণি-র উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্পকলা, সামাজিক উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে বাঙালীর অভ্যুদয়, উন্নতির পথের অতি স্বল্প পরিমাণ বাধাও যদি অরণি অপসারণ করিতে পারে তাহা হইলেই অরণির ব্রত সার্থক হইবে।"

ফ্যাসিস্ট বিরোধিতা এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ প্রচারে অরণি-র ছিল এক বিশিষ্ট ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরপরই আত্মপ্রকাশ ঘটায় এর প্রথম সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। *অরণি*-র রাজনৈতিক পর্যালোচনা এক সময় পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। সুকান্ত ভট্টাচার্য, সোমেন চন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কমিউনিস্ট কবি-সাহিত্যিকরা এই পত্রিকায় লিখেছেন। পরবর্তীকালে 'খেলার মাঠে', 'ছায়াচিত্র সমালোচনা' ইত্যাদি বিভাগও এই পত্রিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

জনযুদ্ধ : রাজনৈতিক পাক্ষিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৮ চৈত্র ১৩৪৮। সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জী। দুটি সংখ্যার পর *জনযুদ্ধ* সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। পত্রিকাটি বাংলায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হিসেবেই সমধিক পরিচিত। নামেই প্রকাশ তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মূল্যায়নের সঙ্গে সাযুজ্য রাখাই ছিল এই পত্রিকা-নীতি। লেখক তালিকায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীই ছিলেন। পত্রিকা পরিচালনার কাজে কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলায় জনমত গঠনে *জনযুদ্ধ* ছিল অগ্রণী ভূমিকায়।

তথ্যসূত্র :

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক-পত্র*
১ম খণ্ড ১২২৫ (ইং. ১৮১৮)—১২৭৪ (ইং ১৮৬৮);
২য় খণ্ড ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮)—১৩০৬ (ইং ১৯০০),
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৪২ ও ১৩৫৮।

গীতা চট্টোপাধ্যায় *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী*
১ম খণ্ড ১৯০০-১৯১৪ : ২য় খণ্ড ১৯১৫-১৯৩০,
৩য় খণ্ড ১৯৩১-১৯৪৭, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ,
১৯৯০, ১৯৯৪ ও ২০০১।

নির্দেশিকা